

Banglapdf.net Presents

মাসুদ রানা

অন্তর্ধান

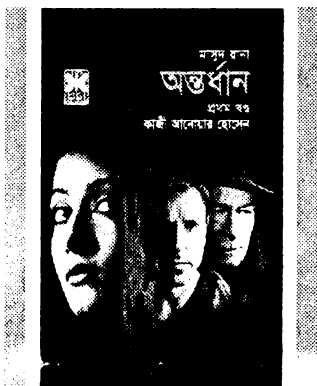
প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



roni060007

মাসুদ রানা ৩৯৩
অন্তর্ধান
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7393-2

মাসুদ রানা

অন্তর্ধান

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

রাজি হলো রানা ।

কাজটা এক হিসেবে কঠিন কিছু নয়—একজন
মানুষকে নাম-পরিচয় পাল্টে লুকিয়ে ফেলতে হবে ।

কিন্তু মক্কেল নিজেই যদি বেঙ্গমানী করে বসে,
তখন চোখের নিমেষে পাল্টে যায় পরিস্থিতি ।

মাসুদ রানার চোখের সামনে ঝরে গেল
চার-চারটে তরতাজা প্রাণ—ওর এজেন্সির
নিবেদিতপ্রাণ চার অপারেটর । প্রিয় শিষ্যদের
শোকে এখন বুকে আগুন জ্বলছে রানার ।

সোহানাকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ও
ধুরন্ধর ওই বিজ্ঞানীকে ।

কিন্তু সমস্যা হলো, আরও অনেকেই চায় তাকে ।

কেউ জীবিত, কেউ বা মৃত অবস্থায় ।

আর এর ভিতরে নাক গলিয়ে স্রেফ মরণ
ডেকে আনছে রানা-সোহানা । চলুন পাঠক,
দেখি, ওদের কোনোভাবে বাঁচানো যায় কি না ।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে

ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরস্বাচীন: ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

e-mail: sebakprok@citechco.net

Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

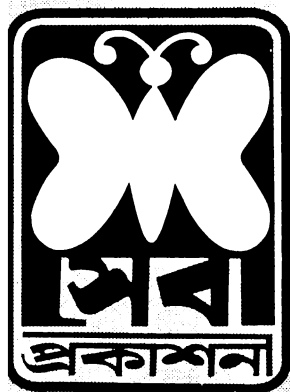
Masud Rana-393

ANTORDHAN

Part-I

A Thriller Novel

Bv. Oazi Anwar Husam



বাহান টাকা

এক

সংবাদপত্রের পাতা থেকে:

দাঙ্গা-পুলিশ কর্তৃক গণবিক্ষোভ দমন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সেইন্ট লুই, মিসৌরি। এপ্রিল ১৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের প্রতিবাদে টানা তিনদিন ধরে চলতে থাকা গণবিক্ষোভ চতুর্থ দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে তাঁদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে আজ সকালে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্রিয় হস্তক্ষেপে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সারা শহর জুড়ে আন্দোলনরত প্রায় দশ হাজার বিক্ষোভকারীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেড়শোজন দাঙ্গা-পুলিশ নামানো হয় ভোর ছটায়। লাঠিচার্জ, রাবার বুলেট এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উন্মত্ত জনতাকে পরাস্ত করে তারা, পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এই অল্পসংখ্যক পুলিশ কীভাবে এমন চমৎকার সাফল্য দেখাল, তা বিস্ময়কর বটে! গত কয়েকদিনে শহরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল আন্দোলনকারীরা—শুধুমাত্র আগুন এবং লুটপাটের

ঘটনাতেই পনেরো মিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে সিটি কাউন্সিল থেকে গতকাল প্রতিবেদন দেয়া হয়েছিল। এই বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশের বড় ধরনের লড়াই হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তবে তার উল্টোটা লক্ষ করা গেছে বাস্তবে। পুলিশি হামলা শুরু হতে না হতে পড়িমরি করে বিক্ষোভকারীদের পিঠটান দিতে দেখা গেছে; লড়াই তো দূরের কথা, আত্মরক্ষার তেমন কোনও চেষ্টাই লক্ষ করা যায়নি তাদের মধ্যে।

এ-বিষয়ে পুলিশ চিফ রবার্ট ক্রাইসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, ‘এটা সত্যিকার কোনও আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের নামে স্রেফ অরাজকতা ছড়ানোই ছিল ওদের মূল উদ্দেশ্য, আমাদের প্রিয় সেইন্ট লুই শহরকে কলঙ্কিত করবার জন্যই নাটক করছিল ওরা। আদর্শ বলতে কিছু ছিল না ওদের, তাই পুলিশকে রুখে দাঁড়াতে দেখে পালিয়ে বেঁচেছে। এ-ধরনের সন্ত্রাসীদের যে-কোনও মূল্যে প্রতিহত করবার জন্য সেইন্ট লুই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সদা-তৎপর রয়েছে...’

‘সন্ত্রাসী!’ সকৌতুকে বলে উঠল মাঝবয়েসী উচ্চপদস্থ লোকটা। ‘ভালই বলেছে! ওদের নাকি আদর্শও ছিল না... এ-ধারণা ওর মাথায় গজাল কী করে?’

‘কী বলতে হবে—তা ওকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে,’ গম্ভীর গলায় বললেন পাশে বসা জেনারেল।

‘তবে পুলিশ চিফের ধারণাও নেই, আসলে কী ঘটেছে,’ বলল তৃতীয় জন, পেশায় সে একজন মিলিটারি অ্যানালিস্ট।

আরও তিনজন রয়েছে প্রায়াক্কার রুমটাতে—দুজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং থাকি প্যান্টসুট পরা সুন্দরী এক যুবতী। দুই সারিতে বসানো চারসেট সোফায় বসে আছে সবাই, দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দেয়ালে ঝোলানো একটা চল্লিশ ইঞ্চি এলসিডি টিভি-স্ক্রিনে... সেইন্ট লুইয়ের ঘটনার রেকর্ড করা নিউজ-কাভারেজ চলছে ওটাতে।

এনবিসি'র হাইলাইটস্ শেষ হলো, এবার শুরু হলো সিএনএন-এর প্রতিবেদন। প্রাথমিক সিকোয়েন্সগুলোয় প্রথম দিনের বিক্ষোভ দেখানো হলো। দলে দলে মানুষ নানা রকম ফেস্টুন আর প্ল্যাকার্ড হাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জড়ো হচ্ছে মেট্রোপলিটন কনভেনশন সেন্টার-এর সামনে... ওখানেই বসেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন। ধীরে ধীরে বাড়ল জনসমাগম, ভিড়টা ছড়িয়ে পড়ল বাচ স্টেডিয়াম আর ফেডারেল কোর্টহাউজ পর্যন্ত, রাত নাগাদ পুরো শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে গেল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ—বিক্ষোভকারীরা দোকানপাট-যানবাহন ভাঙচুর করছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সবকিছুতে।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনের হাইলাইটসে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে দেখা গেল, সেইন্ট লুইকে মনে হলো যুদ্ধাক্রান্ত একটা নগরী। মেয়রের ভাষণের অংশ দেখানো হলো, তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছেন।

চতুর্থ দিনে পুলিশকে পাল্টা আঘাত হানতে দেখা গেল। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই দেড়শো দাঙ্গা-পুলিশ চালাল মূল আক্রমণটা, তাদেরকে সহায়তা করল স্টেট ট্রুপার ও ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা। টিভির পর্দায় ছোটখাট একটা যুদ্ধের দৃশ্য

অন্তর্ধান-১

ফুটে উঠল—প্রোটেকটিভ ক্লোদিং আর গ্যাস-মাস্ক পরা দাঙ্গা পুলিশ একের পর এক টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ছে, সেই সঙ্গে চালাচ্ছে লাঠিচার্জ; ডাউনটাউনের বিভিন্ন রাস্তা থেকে আন্দোলনকারীদের খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেমোরিয়াল পার্কে বিক্ষোভকারীরা অসংখ্য তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাস গড়েছিল, ওখানে গিয়ে সংগঠিত হবার চেষ্টা করল তারা, কিন্তু সে-সুযোগ দেয়া হলো না। আক্রমণ চালানো হলো পার্কেও—সবকিছু ভেঙেচুরে তাড়িয়ে দেয়া হলো বিক্ষোভকারীদের।

ধারাতাম্যকারীর উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেখানো হলো পুরো ঘটনাটা। হেলিকপ্টার থেকে ধারণ করা হয়েছে দৃশ্যটা, তাই ক্লোজআপ শট থাকল না; তবে তাতে ঘটনাক্রম বুঝতে অসুবিধে হলো না। দাঙ্গা-পুলিশ পার্কে পৌঁছুতেই খেপে উঠল জনতা, ক্রমাগত পাথর আর কাঁচের বোতল ছুঁড়তে শুরু করল পুলিশের দিকে। অল্পবয়েসী একটা ছেলেকে দেখা গেল হাতে-বানানো একটা ককটেল নিয়ে এগিয়ে আসতে—বোতলের ভিতরটা তরলে ভর্তি, উপর দিয়ে বেরিয়ে আছে সলতে। সেটায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারল ছেলেটা, অগ্রসর হতে থাকা পুলিশ-বাহিনীর সামনে পড়ল ওটা, বিক্ষোভিত হলো বিকট শব্দে। মনে হলো এতে খেপে গেছে পুলিশেরা, বৃষ্টির মত টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়তে শুরু করল তারা। পুরো পার্ক ছেয়ে গেল ঘন ধোঁয়ায়, মানুষজন ঢাকা পড়ে গেল তাতে।

হেলিকপ্টারের ক্যামেরাতে এখন আর দেখা যাচ্ছে না কিছু, তাই গ্রাউণ্ড লেভেলে থাকা টেলিভিশন ক্রু-দের ক্যামেরা থেকে দেখানো হলো পরের ঘটনাগুলো। ধোঁয়ার মেঘ থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল আন্দোলনকারীদের—অনবরত

কাশছে, চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে আতঙ্কের ভাব... একটু আগের উন্মত্ত মানুষগুলোর সঙ্গে এদের যেন কোনও মিলই নেই। পার্কের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মিসিসিপি নদীর দিকে হুড়মুড় করে ছুটেতে শুরু করল সবাই, কিনারে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল পানিতে। একটু পরেই অন্তত কয়েকশ' মানুষকে ভাসতে দেখা গেল নদীর বুকে, কিলবিল করতে থাকা মানবদেহের কারণে পানিই দেখা যাচ্ছে না ঠিকমত।

নদীর পারে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র পুলিশেরা, আন্দোলনকারীদের দিকে অস্ত্র তাক করা দেখেই বোঝা গেল, লড়াই শেষ হয়েছে।

‘যে-ছেলেটা মলোটভ ককটেল ছুঁড়ল, তাকে খেয়াল করেছেন?’ বলল জেনারেল। ‘ও আসলে আমাদের লোক। ইচ্ছে করেই ছুঁড়েছে ওটা, পুলিশকে চরম অ্যাকশন নেয়ার একটা অজুহাত তৈরি করে দিতে।’

‘ভালই কাজ দেখিয়েছে,’ মাথা দোলাল উচ্চপদস্থ লোকটা। ‘দেখে মনে হচ্ছিল, সত্যি সত্যি পুলিশের গায়ে আগুন দিতে চাইছে।’

‘আন্দোলনকারীদের নেতারা অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে—ওই’ ছেলে তাদের দলের নয়। পুলিশ বা অন্য কারও ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না তাদের, আন্দোলনকে বাণীচাল করতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল বলে দাবি করছে ওরা।’

‘হুঁ, ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে ওরা, তাই না?’

‘কিছু কিছু মানুষ সবকিছুতেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায়,’ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল মিলিটারি অ্যানালিস্ট।

‘পার্থক্য একটাই—এবার সত্যিই একটা ষড়যন্ত্র ছিল এখানে,’ হাসল মাঝবয়েসী লোকটা। ‘তবে ওরা যা ভাবছে, সে-कारणे নয়।’

‘সবার চোখের সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা,’ জেনারেলও হাসল। ‘কোটি কোটি মানুষ টিভির পর্দায় দেখেছে সব... পরিষ্কারভাবে। তারপরও বুঝতে পারেনি।’

‘হ্যাঁ,’ সম্ভ্রষ্ট ভঙ্গিতে বলল উচ্চপদস্থ লোকটা। ‘একেই বলে পারফেক্ট অপারেশন!’

দুই

দ্বিতীয় একটা সংবাদ ছাপা হলো কয়েকদিন পর। সেটা এরকম:

ট্রেইনিং মিশনে আর্মি-রেঞ্জারদের মৃত্যু

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ক্যাম্প রাডার, ফ্লোরিডা। এপ্রিল ২৪। ইউ.এস. আর্মির সিক্সথ রেঞ্জার-ট্রেইনিং ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জর্জ হাসকি তাঁর পনেরোজন রেঞ্জারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। দু’রাত আগে একটি ট্রেইনিং মিশন চলাকালে তারা ফ্লোরিডার জলাভূমিতে ডুবে যায়। নিহতদের সবার পরিবারের

সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন করার জন্য গণমাধ্যমে মৃত্যুসংবাদ প্রচারে বিলম্ব হয়েছে বলে জানানো হয়।

‘আমরা এখনও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি,’ বলেন ব্রিগেডিয়ার হাসকি। ‘জলাভূমিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ করি আমরা, কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। এটা সত্য যে, বছরের এই সময়টাতে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে; তা ছাড়া গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জলাভূমির পানিও বেড়ে গিয়েছিল। তবে এসব কোনও বড় ব্যাপার হতে পারে না, কারণ ওরা “রেঞ্জার” ছিল। এরচেয়েও কয়েক গুণ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলার মত ট্রেনিং ছিল ওদের। আমরা রহস্যটা ভেদ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি...’

দু’রাত আগে।

এই জলাভূমি আমার বন্ধু—বিড়বিড় করল সার্জেন্ট মাইক হ্যামার। বুক সমান পানিতে রয়েছে সে, তলার ছ’ইঞ্চি পুরু কাদা ভেঙে কষ্টে-সৃষ্টে এগোচ্ছে, এম-১৬ সাবমেশিনগানটা তুলে ধরে রেখেছে মাথার উপর... যাতে ভিজে না যায়। খুবই অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি—কিন্তু এ-ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার ট্রেনিং রয়েছে তার। সেটাই কাজে লাগাচ্ছে সে, বিড়বিড় করে আউড়াচ্ছে বহুদিন আগে সার্ভাইভাল ইন্সট্রাক্টরের শিখিয়ে দেয়া মন্ত্রটা—কোনও পরিবেশকেই শত্রু ভেবো না, বন্ধু ভেবো; এতে মন শক্ত থাকে... কষ্টের কথা ভুলে যায় শরীর।

সেই ট্রেনিংয়ের পর বহু বছর কেটে গেছে। এর মাঝে অন্তর্ধান-১

গ্রেনাদা, পানামা, ইরাক, আফগানিস্তানসহ বহু জায়গায় প্রকাশ্য ও গোপন যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে তাকে, মোকাবেলা করতে হয়েছে কঠিন ও প্রতিকূল অসংখ্য পরিবেশ-পরিস্থিতি। এখন হ্যামার নিজেই প্রশিক্ষক, সারাজীবনের অভিজ্ঞতা বিলিয়ে দিচ্ছে এখনকার নতুন প্রজন্মের কাছে। পিছন ফিরে একবার তাকাল সে, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, শুধু আশা করল, প্রশিক্ষণার্থীরাও একই মন্ত্র আউড়ে জলাভূমির সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করে নিচ্ছে।

না করে উপায়ও নেই। এই জলাভূমি শুধু পানি আর কাদার রাজত্ব নয়; মশা, সাপ আর কুমিরেরও আবাসস্থল। এসবের ভয়ে কাবু থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়, শরীর আড়ষ্ট হয়ে যেতে চায় আতঙ্কে। তাই সবকিছুকেই বন্ধু ভেবে মনকে শান্ত করতে হয়, ভাবতে হয়—প্রকৃতির প্রতিটি বিপদ সৈনিকদের অনুকূলে থাকবে, কোনও ঝামেলা দেখা দেবে না।

পায়ের নীচে একটা ডুবে থাকা কাঠের গুঁড়ি পড়ল, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল হ্যামার, কোনোমতে নিজেকে সামলাল। অস্ফুট স্বরে গাল দিয়ে উঠল সে, হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল। তিন ঘণ্টা পেরিয়েছে এক্সারসাইজের, আরও দু'ঘণ্টা বাকি। রুঁদেভু-র দিকে অর্ধেকটার বেশি পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা—কথাটা বাকিদের জানিয়ে সাহস জোগাতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। পুরো এক্সারসাইজটা ভয়েস-সাইলেন্সের মধ্যে করা হচ্ছে, সব ধরনের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। এমনকী আধঘণ্টা পর পর রেডিও কমিউনিকেশনও ইলেকট্রনিক পালসের মোর্স কোড দিয়ে করতে হচ্ছে। কোয়ার্টার মাইল দূরে দ্বিতীয় একটা দল আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগই নেই। সমস্যা শুধু এটুকু নয়, আরও আছে। রাত

ঘনঘোর, নিকষ আঁধারে দশ ফুটও দৃষ্টি চলে না, অথচ নাইট-ভিশন গগলস্ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়নি। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার চান, তাঁর রেঞ্জাররা আধুনিক যন্ত্রপাতির চাইতে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের উপর বেশি নির্ভর করুক।

আকাশে চাঁদ নেই, এক্সারসাইজের জন্য আজকের রাতটা বেছে নেয়ার পিছনে প্রধান কারণ সেটাই। গতকাল ঝড় হয়েছিল, সেটার প্রভাবও কাটেনি পুরোপুরি, মাথার উপরটা ঢেকে আছে ঘন মেঘে, রাতের আকাশের স্বাভাবিক আভাও তাই অদৃশ্য। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মরা গাছের কাণ্ড, অন্ধকারে আবছাভাবে চোখে পড়ে ধূসর আকৃতি—শুধু সেটুকুর উপর নির্ভর করে আশপাশের পরিস্থিতি আঁচ করতে হচ্ছে সার্জেন্টকে। এমন পরিবেশে সবার মুখে কালো রঙের ক্যামোফ্লাজ অপ্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু তারপরও প্রস্তুতিতে সামান্যতম ছাড় দেয়নি সে, কারণ রাতের মিশনে ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট একটি বাধ্যতামূলক অনুষঙ্গ।

সারা শরীরে লেপ্টে গেছে হ্যামারের ভেজা ইউনিফর্ম, প্রতি পদক্ষেপে পা'দুটোকে টেনে ধরতে চাইছে পিছনদিকে। দাঁতে দাঁত পিষে অস্বস্তিটাকে চাপা দিল সে, এমন সময় সামনে সাদাটে একটা আভা দেখতে পেল। লিউমিনাস ডায়ালের আলো ওটা, সামনে থাকা স্কাউট কম্পাস দেখছে। হেডিং ঠিক করে নিল তরুণ সৈনিক, সামান্য ডানে ঘুরে আবার এগোতে শুরু করল, তাকে অনুসরণ করল বাকিরা। ধমক দেয়ার ইচ্ছেটা খুব কষ্ট করে চাপা দিল সার্জেন্ট—ডায়ালের আলোটা কারও চোখে পড়া উচিত হয়নি; সে যখন দেখতে পেয়েছে, তখন একজন স্পটারও দেখতে পেত। পুরো টিমের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেত এর ফলে। মনে মনে স্কাউটের জন্য শাস্তি ঠিক অন্তর্ধান-১

করে ফেলল হ্যামার—ফুল ব্যাটল্-গিয়ারে দশ মাইল দৌড়াবে গাধাটা।

কানের কাছে একটা মশা ভন ভন করে উঠতেই বাস্তবে ফিরে এল হ্যামার। শরীরের সমস্ত উন্মুক্ত স্থানে মশা-তাড়ানোর ওষুধ মেখেছে সে, তারপরও কাজ হচ্ছে না; কিছুক্ষণ পর পরই রক্তচোষা পতঙ্গগুলো এসে হামলা চালাচ্ছে মুখে। দু'হাতের থাম্পড়ে ওগুলোকে মেরে ফেলা গেলে মনে শান্তি পেত, কিন্তু নৈঃশব্দ্য বজায় রাখার খাতিরে করা যাচ্ছে না কাজটা। জোর করে মশার দিক থেকে মন ফেরাল সার্জেন্ট—আজ রাতে মশাকেও তার বন্ধু ভাবতে হবে!

পানির মৃদু আলোড়ন কান পেতে শুনল হ্যামার, তার পুরো টিম ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সামনের মরা গাছগুলোর দিকে। জলাভূমি এখন গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। এম-১৬-টা আরেকটু উঁচু করে ধরল সে, কাজটা সহজ হলো না, একটানা মাথার উপর তুলে রাখায় দু'হাতের পেশিই ব্যথায় টনটন করছে। পানির নীচ দিয়ে কী যেন একটা শরীরের বাম পাশে ঘষা খেলো, নাকে পচা লতাপাতার গন্ধ পেল সার্জেন্ট... একটু কেঁপে উঠল সে।

হচ্ছেটা কী? ভাবল হ্যামার। কারণ ছাড়া হঠাৎ কেঁপে উঠল কেন সে? দীর্ঘ সৈনিকজীবনে স্নায়ুর উপর অবিশ্বাস্য চাপ সহিতে হয়েছে তাকে... বারংবার। সেটারই কুফল নয়তো? নার্ভ ভেঙে পড়তে চাইছে?

ধূসর রঙের একটা কুয়াশা ভেসে এল পানির উপর দিয়ে। নতুন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পেল হ্যামার, নাক জ্বলছে। পানিটাকে হঠাৎ খুব বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হলো, শরীরের কাঁপুনিও বেড়ে গেছে, বুকটা চেপে ধরছে কী যেন। সবকিছু

অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল সে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তাকে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে... ।

এখুনি!

হ্যামারের ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই। হঠাৎ করেই আলোকিত হয়ে উঠল সামনেটা। রকেটের মত পিছনে আগুনের রেশ রেখে আকাশে উঠে গেছে অনেকগুলো ফ্লেয়ার, তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চারপাশ। টিমের সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল পরস্পরের দিকে, চমকে গেছে। ফ্লেয়ারগুলো আসলে এক্সারসাইজেরই একটা অংশ, তবে এমনটা যে ঘটবে, তা হ্যামার ছাড়া আর কাউকে বলা হয়নি আগে। হঠাৎ করে চমকে গেলে এদের কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখার জন্য করা হয়েছে আয়োজনটা।

শান্ত থাকো—মনে মনে দলকে নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করল সার্জেন্ট, যেন টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে তার সবার সঙ্গে। কোনও কিছুতেই অবাক হয়ো না।

কিন্তু দলটার জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। বিনা নোটিশে হঠাৎ করে উদয় হলো দুটো জেট-ফাইটার, চক্রর দিতে শুরু করল জলাভূমির উপর, ইঞ্জিনের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। ফায়ার করবে এরা, তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই। হ্যামারের উরুতে একটা ওঅটরপ্রফ ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার বাঁধা আছে—ওটার সাহায্যে রেঞ্জারদের পিনপয়েন্ট লোকেশন জানতে পারছে পাইলটেরা, যাতে ভুলক্রমে ওদের উপর আঘাত হেনে না বসে।

তবে এতসব ব্যাপার জানা নেই প্রশিক্ষণার্থী রেঞ্জারদের, অবিশ্বাসের চোখে ফাইটারদুটোকে ফায়ার ওপেন করতে দেখল ওরা। দলটার গা ঘেষে চলে গেল দুই সারি ট্রেসার বুলেট, অন্তর্ধান-১

সেগুলোর পিছু পিছু দু'জোড়া রকেট ছোঁড়া হলো... দলটার দুইশ' গজ দূরে আঘাত হানল ওগুলো। বিস্ফোরণে বিশাল এক গোলার মত উথলে উঠল জলাভূমির পানি, মরা গাছপালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গেল চারপাশে।

‘জিসাস!’ চৈচিয়ে উঠল কেউ।

চিৎকার করে লোকটাকে চুপ করাতে ইচ্ছে হলো হ্যামারের—করছে কী বোকাটা! সাইলেন্ট অপারেশনের সংজ্ঞা কি নতুন করে শেখাতে হবে নাকি একে?

‘হচ্ছে কী এসব?’ উঁচু গলায় বলে উঠল আরেকজন। ‘ওরা জানে না, আমরা এখানে আছি?’

চুপ করো, হাঁদারাম! মনে মনে আবার গাল পাড়ল হ্যামার। পুরো এক্সারসাইজের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছ তুমি! অবশ্য মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না তার।

ফ্লোরের ধোঁয়া আর কর্ডাইটের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস, কেমন যেন করে উঠল সার্জেন্টের পাকস্থলি—বমি আসছে।

‘হা, যিশু! রকেটগুলো তো আরেকটু হলে আমাদের গায়ে লাগত!’ তৃতীয় একজন মুখ খুলেছে এবার।

পানি ভেঙে দলের সদস্যদের দিকে এগোতে শুরু করল হ্যামার, এদের চুপ করাতেই হবে। নইলে পুরো এক্সারসাইজই ব্যর্থ হতে চলেছে।

পানির তাপমাত্রা যেন আরও কয়েক ডিগ্রি কমে গেছে, কয়েক পা এগোতেই দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল সার্জেন্টের। শরীর অবাধ্য হয়ে উঠছে, এগোতেই দিচ্ছে না আর। আবার কী যেন পানির নীচ দিয়ে ঘষা খেলো পায়ে, ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল তার বুক, হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে

গেছে।

কেন যেন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে হ্যামারের দেহ, পেশিগুলো কোনও কথাই শুনছে না। হাইপার-ভেন্টিলেশন শুরু হয়ে গেছে—খুব দ্রুত শ্বাস ফেলছে সে। চোখ বন্ধ করে ভয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল হ্যামার—উল্টো করে পাঁচ থেকে এক পর্যন্ত গুনছে, গোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখছে শ্বাসটা। এই পদ্ধতি কখনও বিফল হয়নি... আজ হলো।

শরীরের কাঁপুনি আরও বেড়ে গেছে—দিশেহারা বোধ করল হ্যামার। ঘটছেটা কী? এভাবে ভয় পাচ্ছে কেন সে? ভয় পাবার মত কিছু তো ঘটেনি! এই জলাভূমি তার বন্ধু... এই অন্ধকার তার বন্ধু... মশা-মাছি পর্যন্ত তার বন্ধু... ভয়ের আছটা কী? চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো হ্যামারের।

দলের একজন আতঙ্কিত ভঙ্গিতে চোঁচিয়ে উঠল, 'হা যিশু! কী যেন কামড়েছে আমাকে!' কী আশ্চর্য, একেই দলের সবচেয়ে সাহসী লোক বলে জানে সবাই।

এরা সবাই উচ্চ মানের ট্রেনিং পাওয়া রেঞ্জার, অথচ আচরণ করছে ভীতু খরগোশের মত। কারণটা মাথায় ঢুকছে না হ্যামারের।

আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। 'সাপ! সাপ!!'

পানির নীচে জিনিসটা আবারও ঘষা খেল হ্যামারের শরীরে। ওটা একটা মরা গাছের গুঁড়ি, কিন্তু তা বোঝার মত অবস্থায় নেই সার্জেন্ট। সবকিছু ভুলে সে নিজেও চোঁচিয়ে উঠল, 'কুমির!'

'না!!!'

হঠাৎ করে ফায়ার করতে শুরু করল দলের এক

রেঞ্জার—ফুল অটোমেটিক মোডে রয়েছে তার এমপি-১৬, অঝোর ধারায় বেরিয়ে আসছে গুলি। মাজল্ ফ্যাশের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বিস্মিতভাবে এদিক-সেদিক আঘাত করছে বুলেটগুলো, কয়েকজন সেই আঘাতে উল্টে পড়ে গেল। বাকি রেঞ্জারদের সম্মিলিত চিৎকারে কেঁপে উঠল প্রকৃতি, সবাই এবার এলোপাতাড়ি গুলি করতে লেগেছে।

একটা বুলেট এসে বিধল হ্যামারের হাতে। ধাক্কাটা সামলাতে পারল না সে, তাল হারিয়ে পড়ে গেল পিছনে, তলিয়ে গেল। চিৎকারের ভঙ্গিতে হা করতেই মুখে ঢুকে পড়ল একরাশ কাদাগোলা পানি। কেশে উঠল সার্জেন্ট, তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে সোজা হলো, পানি ভেঙে তুলে ফেলল মাথাটা।

দু'হাতের মুঠোয় অস্ত্রটা সজোরে আঁকড়ে ধরে হাঁক ছাড়ল হ্যামার। 'সিজ ফায়ার! সিজ ফায়ার!!'

কিছু প্রচণ্ড আতঙ্কে ভেঙে গেছে গলাটা, আদেশটা বেরুল চিঁচি করে। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল সার্জেন্ট, আবার মুখ খুলল নতুন করে আদেশ দিতে। তবে কথা বলা আর হলো না তার। খোলা মুখটা দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা প্রাণঘাতী বুলেট, হ্যামারের ঘাড়ের পিছনটা ফুটো করে বেরিয়ে গেল।

বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্থির রইল লাশটা, তারপর চিত হয়ে পড়ে গেল পানিতে। জলাভূমিকে বন্ধু ভাবছিল হ্যামার... সেই বন্ধুর বুকেই ঠাই হলো তার।

তিন

‘আমার নাম আন্দালিব সিদ্দিকী। ডক্টর... আন্দালিব সিদ্দিকী।’

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, নিউ ইয়র্ক শাখা। সকাল দশটা। টেলিফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে রেখেছে শাখাপ্রধান জাকির, মনোযোগ দিয়ে শুনছে অপরপক্ষের কথা। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ভারী, বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না—পঞ্চাশ হতে পারে, আবার পঁচিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কথা বলছেন শুদ্ধ বাংলায়, বলার ভঙ্গিতে সম্ভ্রান্ত একটা ভাব রয়েছে।

‘জী, বলুন কী সাহায্য করতে পারি?’ জিজ্ঞেস করল জাকির।

‘কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি?’

‘আমি জাকির হোসেন, এই ব্রাঞ্চের ইনচার্জ।’

‘কী! আমি তো মাসুদ রানাকে চাইলাম, আপনাকে দিল কেন?’

‘মি. রানা আমাদের ডিরেক্টর, তাঁকে তো ব্রাঞ্চ অফিসে পাবেন না।’

‘কিন্তু আমি যে শুনলাম, তিনি নিউ ইয়র্কেই আছেন? সেজন্যেই তো ফোন করলাম এখানে।’

‘মি. রানা ব্যক্তিগত কাজে নিউ ইয়র্কে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে
অন্তর্ধান-১

আমাদের যোগাযোগ নেই।’

• ‘কিন্তু তাঁকে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন!’ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক। ‘আপনারা কোনও কণ্ট্রাক্ট ইনফরমেশন দিতে পারেন আমাকে?’

‘অনুমতি ছাড়া সেটা দেয়া যাবে না। আপনার সমস্যাটা খুলে বলুন আমাকে; যদি মি. রানার ইনভলভ্ হবার মত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তা হলে অবশ্যই জানাব তাঁকে। প্রয়োজন মনে করলে তিনি নিজেই তখন যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। ‘সমস্যাটা আমি শুধু মি. রানাকেই বলব।’

‘সেক্ষেত্রে আমি দুঃখিত,’ বলল জাকির। ‘কোনোকিছু না জেনে আমি ওঁকে বিরক্ত করতে পারব না। রাশি, হ্যাভ আ গুড ডে।’

‘থামুন, থামুন!’ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ভদ্রলোক। ‘কাটবেন না লাইনটা। প্লিজ, আমি খুব বিপদে আছি... মি. রানাকে খুবই প্রয়োজন আমার।’

‘তা হলে আমাকে খুলে বলছেন না কেন?’

‘খুঁটিনাটি বলতে পারব না, শুধু এটুকু জানুন—আপনাদের এজেন্সির সাহায্য চাই আমি। ফি নিয়ে ভাববেন না যা চান তার চেয়ে বেশিই দেব। শর্ত শুধু একটাই—আমার কেসটা মি. রানাকে ব্যক্তিগতভাবে হ্যাণ্ডেল করতে হবে।’

‘সরি, সার। আমাদের ডিরেক্টর নিজে কোনও কেস হ্যাণ্ডেল করেন না সাধারণত। ও-কাজের জন্যে এজেন্সির অপারেটররা আছে।’

‘আমার কেসটা উনি নিজেই নিতে চাইবেন, আমি শিয়োর!

আপনি শুধু ওঁর কাছে আমার নামটা বলে দেখুন।’

‘কাজটা কী, সেটাই তো বলছেন না।’

‘প্রোটেকশন দরকার আমার, মি. জাকির। তবে বডিগার্ডের দেয়া প্রোটেকশন নয়। আমার পিছনে ভয়ানক এক দল লোক লেগেছে, তারা এক ব্যাটালিয়ন বডিগার্ডকেও হাওয়া করে দিতে পারে...’

‘তা হলে কেমন প্রোটেকশন চান আপনি?’

‘আমি চাই,’ রহস্যময় গলায় বললেন ভদ্রলোক, ‘পৃথিবীর বুক থেকে আমাকে মুছে দেবেন মি. রানা!’

লোয়ার ম্যানহ্যাটন।

গ্রিনিচ ভিলেজের মারসার স্ট্রিটে ব্রাউনস্টোনে তৈরি পুরনো একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। লোকেশনটা চমৎকার, উপরদিকের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে হাডসন নদীর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায়। আজ অবশ্য ব্যালকনিতে দাঁড়াবার উপায় নেই, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সেই দুপুর থেকে, থামাথামি নেই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল একটা বি.এম.ডব্লিউ। গাড়িটাকে রাস্তার পাশে পার্ক করে রেখে নেমে এল সুঠামদেহী, দীর্ঘকায়, ঋজু এক যুবক—দেখতে ভারি সুদর্শন। ওভারকোটের কলারটা তুলে দিল সে, তারপর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মাথার উপর একটা খবরের কাগজ ধরে একছুটে এসে ঢুকল বিল্ডিংয়ের ভিতর।

ওকে ঢুকতে দেখে নীচতলার রিসেপশনিস্ট কাম সিকিউরিটি গার্ড হারপার উঠে দাঁড়াল, ‘গুড ইভনিং, মি. রানা!’

মৃদু হাসল মাসুদ রানা। নিউ ইয়র্কে এলেই সাধারণত রানা এজেন্সির মালিকানাধীন এই অ্যাপার্টমেন্টে ওঠে ও, নিয়ামিত

আসা-যাওয়ায় লোকটার সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়েছে। বলল, ‘খবর কী, হারপার? তোমার ছেলে পুলিশে ইন্টারভিউ দিয়েছিল না? রেয়াল্টি কী?’

‘ঈশ্বরের দয়ায় চাকরিটা হয়ে গেছে, সার।’

‘বলো কী! এ-তো খুব ভাল খবর!’ অবাক হবার ভান করল রানা, আসলে খবরটা আগেই পেয়েছে ও। চাকরি হবার পিছনে ওর কিছুটা অবদানও আছে, যদিও হারপার সেটা জানে না। ‘কোনও মেসেজ আছে আমার জন্যে?’

‘জী না, সার। তবে আপনার বান্ধবী এসেছেন দুপুরে, উপরেই আছেন।’

‘ঠিক আছে।’

লিফটে ঢুকে আনমনে একটা বাংলা গানের সুর ভাঁজল রানা—পুলক অনুভব করছে। জরুরি একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমেরিকায় এসেছিল ও পনেরো দিন আগে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং কঠিন কয়েকটা ঝুঁকি নিয়ে গতকাল শেষ করেছে কাজটা, চিহ্নিত করতে পেরেছে বিশেষ একটা চক্রের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের। এদেশে বসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টিতে টাকা ঢালছিল তারা। কঠিন দায়িত্বটা ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারায় মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে ওর। পনেরো দিনের ছুটি পাওনা হয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট শেষে, প্রিয় একজন মানুষকে নিয়ে সেটা কাটাতে পারবে ভেবে ভাল লাগছে আরও।

প্রিয় সেই মানুষটি সোহানা... সোহানা চৌধুরী। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আরেক সুযোগ্য, দুঃসাহসী এজেন্ট। আমেরিকায় অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছিল সোহানা, কাকতালীয়ভাবে প্রায় একই সময়ে শেষ হয়েছে ওর কাজ, ফলে ছুটি পাওনা হয়েছে ওর-ও। পেশাগত ব্যস্ততার

কারণে বহুদিন হলো ঠিকমত যোগাযোগ নেই রানা-সোহানার মধ্যে, এবার একই সময়ে ছুটি পাওনা হওয়ায় সময়টা একসঙ্গে কাটাবে বলে ঠিক করেছে ওরা, পুরনো সম্পর্কটাকে ঝালাই করে নেবে। পরিকল্পনা হলো, বাহামার সাগরসৈকতে যাবে ওরা, সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করবে, উপভোগ করবে সময়টা। শুধু ছুটি, খেলা আর প্রেম—আর কিছুই না। ইতিমধ্যে সেজন্যে ঢাকায় ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে দুজনই।

টপ ফ্লোরে উঠে বেল বাজাতে যা দেরি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল সোহানা। পুরোদস্তুর বাঙালি গৃহবধূর সাজে সেজেছে ও—মাথায় খোঁপা, হাতে চুড়ি, কপালে টিপ, পরনে সুতি শাড়ি... পঁচিয়ে কোমরে গৌজা। তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না রানা।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম সোহানার, হাতদুটো ভিজে, রান্না করছিল... ছুটে এসেছে বেল শুনে। কোমরে গৌজা শাড়ির আঁচলটা খুলে হাত মুছতে মুছতে বলল, ‘এত দেরি করলে যে? আমি কখন থেকে বসে আছি, জানো?’

অপ্রস্তুতভাবে হাসল রানা। ‘সরি, তবে আমার কিছু করার ছিল না। আবহাওয়া খারাপ, তাই স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড ফেরি আজ দেরি করেছে ছাড়তে। রাস্তায়ও প্রচুর জ্যাম ছিল।’

‘এসো,’ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সোহানা। ‘খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। শাওয়ারটা সেরে নাও, ততক্ষণে রান্না হয়ে যাবে আমার।’

‘রান্না!’ ঢুকতে ঢুকতে বলল রানা। ‘তুমি আবার রান্না করতে গেছ কেন? আমি তো ভাবছিলাম, তোমাকে নিয়ে ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে ডিনার করব।’

‘খামোকা বাইরে খাবে কেন? আমার রান্না খারাপ?’

হাসল রানা। ‘বাব্বাহ! একেবারে দেখছি বউয়ের আদর।’

‘আমাকে বউ মনে হচ্ছে?’ ভুরু কঁোচকাল সোহানা

ওকে আপাদমস্তক দেখার ভান করল রানা। ‘পুরোপুরি! মানিয়েছেও দারুণ। এমন গিনি পাওয়ার জন্য পুরুষেরা দু’হাত তুলে প্রার্থনা করে।’

‘...আর সে-প্রার্থনা কবুল হলেও পালিয়ে যেতাম কেউ কেউ,’ গম্ভীর গলায় বলল সোহানা। কথাটা ঠাইটির সঙ্গে বলা হলেও কোথায় যেন একটা দুঃখের সুর মিশে আছে।

কী বলবে ভেবে পেল না রানা—সত্যি, বলার কিছু নেইও ওর। অদ্ভুত এক সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে আছে ওরা দুজন—একে অন্যকে প্রচণ্ড ভালবাসে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও বিয়ে নামক চিরবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কখনোই সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। প্রধান বাধাটা হচ্ছে পেশা। এমন একটা বিপজ্জনক পেশায় রয়েছে ওরা যে, কখন কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। দেশের স্বার্থে সারাক্ষণ মরণপণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয় এসপিয়োনাজ এজেন্টদের, যদ-সংসার করার সময় কোথায়? তা ছাড়া পেশাগত কারণে এমন সব মেয়েদের সান্নিধ্যে রানাকে আসতে হয়, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলেই নয়; নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তেমন কোনও মূল্য নেই সেখানে। বিবাহিত একজন পুরুষের পক্ষে সেটা কীভাবে সম্ভব, স্ত্রী মুখ বুজে থাকুক বা না-ই থাকুক? সোহানার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকতে পারবে না জেনেও ওকে বিয়ে করাটা এক ধরনের হুঁচকারিতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না—রানা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সেটা

এ তো গেল পেশাগত বাধার দিক। অবশ্য এ-পেশায় যে

থাকতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, ছেড়ে দিলেই হয়। কিন্তু তারপরও রানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়াল হয়ে থাকে দুজনের মধ্যে। মানুষ হিসেবে আজও নিজেকে ভালভাবে বুঝতে পারে না ও। একে একে অনেক মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছে, কিন্তু কেউ ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বাঁধতে চায়নি। আসলে সবাই কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়, ওকে আসলে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। একটা ঘরছাড়া পাগল রয়েছে রানার ভিতরে—কোথাও থামতে চায় না, স্থির হতে চায় না, সবসময় শুধু পালাই-পালাই। আজ এখানে, কাল ওখানে... যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানোই ওর স্বভাব। ব্যাপারটা আর সবার মত সোহানারও বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাই কোনোদিন চাপ দেয়নি ও রানাকে বিয়ের জন্য, মেনে নিয়েছে অদৃষ্টকে।

সেই থেকে চলছে এভাবে—সম্পর্কটা ভালবাসার, যতটুকু সময় সম্ভব, পরস্পরের সান্নিধ্যে কাটাবার চেষ্টা করে ওরা। ওটুকু নিয়েই সুখী থাকার চেষ্টা করে দুজনে, স্থায়ী কিছুর কথা চিন্তা করে না—অদৃশ্য একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে ওরা ওভাবে। তারপরও নারীর চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা... স্বামী-সন্তান-সংসারের কথা উঁকি দেয় সোহানার অন্তরে কখনও-সখনও, নিজের অজান্তেই তখন বুক চিরে বেরিয়ে আসে হতাশ।

আজও তা-ই ঘটেছে, বুঝতে পারে রানা। ইতস্তত করে ও বলল, ‘সোহানা, আমি আসলে...’

থেমে যায় রানা, বুঝতে পারছে না কী বলবে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল সোহানা। বলল, ‘তাড়াতাড়ি শাওয়ার সেরে এসো। আমি যাই, তরকারি পুড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।’ পালিয়ে বাঁচল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঁডরুমের দিকে এগোল রানা ।

খাওয়ার টেবিলে অবশ্য অস্বস্তিকর অনুভূতিটুকুর বিন্দুমাত্র রেশ রইল না । মনের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট যা-ই থাক, সব ভুলে গেছে সোহানা, স্বভাবজাত চপলতা দিয়ে রানাকেও ভুলিয়ে দিল । পরস্পরের সান্নিধ্যে সুন্দর কিছুটা সময় কাটাবে বলে ঠিক করেছে ওরা; যা-হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে মন ভারী করতে চায় না । জোর করে রানাকে ভরপেট খাওয়াও, তারপর দুজনে গিয়ে বসল ব্যালকনিতে... হাতে কফির কাপ । বৃষ্টি এখনও থামেনি পুরোপুরি, ঝিরিঝিরি করে পড়ছে, হালকা ছাঁট এসে লাগছে গায়ে । তা নিয়ে ক্রম্বেপ করল না ওরা, মেতে গেল গল্পে ।

একসময় বিছানায় গেল ওরা, ঘুমিয়ে পড়ল সোহানা । কিন্তু রানার চোখে ঘুম নেই । খাটের হেড রেস্টে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসল ও, নীরবে তাকিয়ে রইল সোহানার দিকে । বৃষ্টি থেমেছে অবশেষে, জানালা দিয়ে আসা অন্তিমিত চাঁদের মৃদু আলোয় ওকে অপূর্ব লাগছে রানার । ধবধবে সাদা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা সোহানার, বালিশের উপর ছড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল, তার মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা যেন ঝলমল করছে ।

কতক্ষণ এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল জানে না রানা, টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো হঠাৎ করে । সোজা হয়ে তাকিয়ে দেখল, আড়াইটা বাজে । এত রাতে কে ফোন করছে?

আবার রিং হতেই নড়ে উঠল রানা । সোহানার উপর দিয়ে ঝুঁকে ওপাশের বেডসাইড টেবিল থেকে টেলিফোনের হ্যাণ্ডসেটটা তুলে নিল ও, কানে ঠেকিয়ে বলল, ‘হ্যালো?’

‘মাসুদ ভাই, আমি জাকির,’ ওপাশ থেকে রানা এজেন্সির

নিউ ইয়র্ক শাখাপ্রধানের দ্রুত কণ্ঠ ভেসে এল। ‘কিছু মনে করবেন না, খুব জরুরি একটা ব্যাপার... নইলে এত রাতে বিরক্ত করতাম না আপনাকে।’

‘কী হয়েছে?’

‘ফোনে বলা যাবে না, সামনাসামনি কথা হওয়া দরকার। আপনার অ্যাপার্টমেন্টে আসব?’

‘এখন?’ রানা একটু বিস্মিত।

‘জী, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ঢাকা থেকে মেসেজ আছে আপনার আর সোহানা আপার জন্য। আমি আপনার বিল্ডিংয়ের সামনেই আছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছুছি ওখানে।’

‘ঠিক আছে, আমি ওয়াচম্যানকে বলে দিচ্ছি—তোমাকে যেন ঢুকতে দেয়।’

ফোনটা নামিয়ে রেখে জানালার সামনে এগিয়ে গেল রানা, সাবধানে পর্দা ফাঁক করে তাকাল নীচে। জাকিরের সাদা লেব্রাস গাড়িটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল, ওটা থেকে একাই নামল শাখাপ্রধান, রাস্তা পেরিয়ে বিল্ডিংয়ের এন্ট্র্যান্সের দিকে চলে এল। সম্ভ্রষ্ট বোধ করল রানা—এটা কোনও ফাঁদ নয়, জাকিরকে অস্ত্রের মুখে নিয়ে আসছে না কেউ। বিছানার কাছে ফিরে এসে ইন্টারকমের রিসিভার তুলল ও, ওয়াচম্যানকে নির্দেশ দিল অতিথিকে উপরে পাঠিয়ে দিতে।

সোহানার ঘুম ভেঙে গেছে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

‘কিছু একটা ঘটেছে,’ মৃদু গলায় বলল রানা। ‘জাকির আসছে আমাদেরকে ব্রিফ করতে।’

‘এত রাতে!’

‘নিশ্চয়ই সিরিয়াস কোনও ব্যাপার। ঢাকা থেকে মেসেজ অন্তর্ধান-১

পেয়েছে বলল।’

এরপর আর শুয়ে থাকা চলে না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সোহানা। ব্যস্তহাতে কাপড় পরতে শুরু করল। রানাও একটা জিন্স গলал পায়ে, উপরে পরল একটা সুতি টি-শার্ট। বেল বাজল, ড্রয়িং রুমে গিয়ে দরজা খুলে দিল ও।

উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল জাকিরকে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখদুটো লাল হয়ে আছে—নিশ্চয়ই ঘুমোতে পারেনি। রানাকে দেখে বিব্রত কণ্ঠে বলল, ‘সরি, মাসুদ ভাই...’

‘রাতদুপুরে ডিস্টার্ব করার জন্য আগেই একবার ক্ষমা চেয়ে ফেলেছ,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘আর প্রয়োজন নেই। ভিতরে এসো।’

ড্রয়িংরুমের একটা সোফায় বসানো হলো জাকিরকে। খুব উত্তেজিত হয়ে আছে ও, সোহানা এক কাপ কফি এনে দিল ওকে। রানা জিজ্ঞেস করল, ‘এবার বলো, কী ব্যাপার?’

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ওর দিকে তাকাল জাকির। ‘ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর নাম শুনেছেন? গতকাল সকালে ফোন করেছিলেন ভদ্রলোক আমার কাছে, আপনাকে চাইছিলেন।’

ঝট করে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর সোহানা, বিসিআই-এর প্রথম সারির এজেন্ট ওরা—আন্দালিব সিদ্দিকীকে না চেনার কোনও কারণ নেই। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের টপ সিক্রেট ওয়াচলিস্টের প্রথম দশজনের একজন এই ভদ্রলোক। ওয়াচলিস্টটা আসলে অসাধারণ প্রতিভাবান ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশিদের একটি তালিকা, যারা বিভিন্ন কারণে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এঁদের দিকে নজর রাখা এবং সম্ভব হলে দেশে

ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অনেক গুরুদায়িত্বের একটি। এভাবে তালিকাভুক্ত অনেক বিখ্যাত মানুষকেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অতীতে, তাঁদের প্রতিভাকে দেশের মাটিতে... দেশের কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অনেক সময় আদাল থেকে প্রবাসজীবনে ওয়াচলিস্টের মানুষদের নিরাপত্তার দিকটাও নিশ্চিত করে বিসিআই।

তবে উপরে উল্লেখ করা দুটো ক্ষেত্রের কোনোটাতেই পড়েন না ড. সিদ্দিকী। বাংলাদেশে ফেরানো হয়নি তাঁকে, নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা যায়নি। সত্যিকার একজন রহস্যমানব বলতে যা বোঝায়, তিনি তা-ই। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন, দেখা-ই পাওয়া যায় না—নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিংবা দেশে ফিরিয়ে আনতে হলে তাঁর কাছে তো পৌঁছতে হবে প্রথমে! ওয়াচলিস্টে গত দশ বছর ধরে নাম রয়েছে ভদ্রলোকের, এর মধ্যে হাতে গোনা মাত্র চারবার জনসমক্ষে হাজির হয়েছেন তিনি, সে-সময়ও তাঁর ধারে-কাছে ঝেঁষতে পারেনি বিসিআই এজেন্টরা... বৈরী আমেরিকানদের করণী।

অত্যন্ত প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী এই আব্দুল্লিহ সিদ্দিকী। একাধারে একজন বায়োকেমিস্ট, ফার্মাসিস্ট ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার। শৈশবের গোড়াতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি, বড় হয়েছেন শিকাগোতে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যুগান্তকারী একটা আর্টিফিশিয়াল প্ল্যান্ট-হরমোন আবিষ্কার করেন তিনি—ওটা বেশ কিছু শস্যের ফলনবৃদ্ধির সহায়ক। নোবেলের জন্য নামও পাঠানো হয়েছিল এ-কারণে, শুধুমাত্র বয়সের দিক থেকে অল্পধীন-১

ডাকসাঁইটে বিজ্ঞানীদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন বলে বাদ পড়ে যান। এসব খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ড. সিদ্দিকীর বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি।

এই প্রতিভাবান মানুষটি বিসিআই-এর নজরে আসেন অনেক দেরিতে। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে ফেলেছেন তিনি, ডক্টরেটও করেছেন... এবং পড়ে গেছেন আমেরিকানদের খপ্পরে। ভদ্রলোককে মার্কিন সরকার গোপন গবেষণায় নিয়োগ করেছে জানতে পেরেই আসলে নড়েচড়ে ওঠে বিসিআই—ওয়াশলিস্টে ঢোকানো হয় তাঁর নাম। কিন্তু এর বেশি আর কোনও অগ্রগতি হয়নি ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে। গত দশ বছর ধরে তাঁকে যথের ধনের মত আগলে রেখেছে মার্কিন সরকার, লুকিয়ে রেখেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। বহু কষ্টে একবার ড. সিদ্দিকীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছিল বিসিআই, তাঁকে বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হননি। ঘটনাটার রিপোর্ট পড়েছিল রানা, তাতে লেখা হয়েছিল—ড. সিদ্দিকীর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য কোনও দরদ নেই। যুক্তরাষ্ট্রে বড় হয়েছেন তিনি, যুক্তরাষ্ট্রকেই নিজের দেশ বলে জানতে শিখেছেন, ফলে আমেরিকানদের স্বার্থেই নিজের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে চান তিনি। বাংলাদেশ বা অন্য কোথাও যাবার কোনও ইচ্ছেই নেই তাঁর ভিতর।

ড. সিদ্দিকীর এই মনোভাবের পর আসলে আর কিছু করার ছিল না বিসিআই-এর। ভদ্রলোক অবিবাহিত, তাঁর বাবা-মা-ও মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, আত্মীয় বলতেও তেমন কেউ নেই; জন্মভূমির প্রতি দায়িত্ববোধ জাগানোর মত ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল না। অবশ্য তারপরও ওয়াশলিস্ট থেকে ড. সিদ্দিকীর নাম সরাননি বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত)

রাহাত খান, শুভবুদ্ধি উদয়ের অপেক্ষায় থেকেছেন।

চকিতে এসব মনে পড়ে গেল রানার। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল উত্তেজনায়—তা হলে কি সুযোগটা এসেছে? সেজন্যেই রাতদুপুরে হেডকোয়ার্টারের মেসেজ নিয়ে ছুটে এসেছে জাকির?

‘খুলে বলো, শুনি।’ শাখাশ্রদ্ধানকে বলল রানা।

‘তেমন কিছু ছিল না ফোনটা,’ জাকির বলল। ‘দশটার দিকে কল করেন ভদ্রলোক, নিজের নামটা বলেন, তারপর আপনাকে চান। আপনি নেই শুনে চাপাচাপি করতে থাকেন আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন চেয়ে। তখন আমিও চাপ দিই তাঁর প্রয়োজনটা জানার জন্য। প্রথমে বলতে চাননি, পরে বললেন—ভয়ানক বিপদে পড়েছেন, আমাদের এজেন্সিকে ভাড়া করতে চান প্রোটেকশনের জন্য। তবে কেসটা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই হ্যাণ্ডেল করতে হবে। আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি।’

‘হুম, তারমানে ইনডাইরেক্টলি বিসিআই-এর সাহায্য চাইছেন তিনি আমেরিকা ছাড়ার জন্য,’ বলল রানা। ‘মনে হচ্ছে, মত পাল্টেছেন শেষ পর্যন্ত!’

‘ব্যাপারটা’ এত সোজা নয়, মাসুদ ভাই,’ কাষ্ঠ হাসি হাসল জাকির। ‘পুরোটা গুনুন আগে। ড. সিদ্দিকীর আমেরিকা ছাড়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। ভদ্রলোকের চাহিদাটা একদম অন্যরকম। তিনি চান, পরিচয় পাল্টে আপনি তাঁকে এই দেশের ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে ফেলুন... সোজা কথায়, রিলোকেশন।’

থমকে গেল রানা-সোহানা। অজ্ঞাতবাসে যেতে চান ড. সিদ্দিকী? এই দেশেই? চাইলে অবশ্য তাঁকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করা যায়—আইডেন্টিটি চেঞ্জ ও রিলোকেশনের পুরো অন্তর্ধান-১

সেটআপ রয়েছে রানা এজেন্সির, রয়েছে এ-কাজে স্পেশালিস্ট একটা টিম। দু'বছর হলো এফবিআই-এর উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রামের সহায়ক বেসরকারি সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ওদেরকে—কার্যক্রমটার মূল উদ্দেশ্যই হলো গুরুত্বপূর্ণ মামলার সাক্ষীদের নাম-পরিচয় পাণ্টে অজ্ঞাতবাসে পাঠানো, যাতে তাদের কোনও বিপদ না হয়। এ-ধরনের বেশ কয়েকটা কেস ইতিমধ্যে হ্যাণ্ডেল করেছে ওরা সাফল্যের সঙ্গে। ড. সিদ্দিকীকে লুকানো কোনও কঠিন কাজ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক আমেরিকাতে রিলোকেটেড হতে চাইছেন কেন? সত্যিই যদি তিনি জীবনসংশয়ী কোনও বিপদে পড়ে থাকেন, তা হলে বাংলাদেশে চলে যাওয়াটাই কি অনেক বেশি নিরাপদ নয়?

সোহানা জানতে চাইল, 'কী ধরনের বিপদে পড়েছেন ড. সিদ্দিকী—সেটা বলছেন?'

মাথা নাড়ল জাকির। 'না। আসলে কিছুই বলতে চাইছিলেন না। যা-বলার, তা শুধু মাসুদ ভাইকে বলবেন। নিজের প্রয়োজনটা জানিয়েছেন শুধু আমাকে।'

'হুম,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'তারপর?'

'ড. সিদ্দিকী সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আমার,' বলল জাকির। স্বাভাবিক, শুধুমাত্র সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ওয়াশিংটন-সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা সম্ভব নয়, বলা বাহুল্য—জাকিরের ও-ধরনের ক্লিয়ারেন্স নেই। 'তাই প্রথমে ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছি—ফেডারেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এ-ধরনের কেস হ্যাণ্ডেল করতে পারে না রানা এজেন্সি। কিন্তু ড. সিদ্দিকী নাছোড়বান্দা, আপনাকে ওর নাম বললেই নাকি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

কাল সকালে আবার ফোন করবেন বলেছেন, কেসটার বিষয়ে আপনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন—সেটা জানার জন্য। আমার মনে একটু কৌতূহল জাগল ভদ্রলোকের পীড়াপীড়ি শুনে, আপনাকে বিরক্ত করবার আগে তাই বিকেলে যোগাযোগ করেছিলাম বিসিআই হেডকোয়ার্টারে... ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে কোনও তথ্য পাই কি না দেখার জন্যে...’

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না রানা। বোঝাই যাচ্ছে, বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের নাম শোনামাত্র মৌচাকে টিল পড়ার মত অবস্থা হয়েছে হেডকোয়ার্টারে। কী ঘটেছে জানার পর জাকিরকে রাতদুপুরে পাঠানো হয়েছে ওর আর সোহানার কাছে... কেসটা হাতে নেবার জন্যে। রানা জিজ্ঞেস করল, ‘আমাদের জন্যে কী মেসেজ দিয়েছে ঢাকা?’

‘আমার ব্রিফিংয়ের পর চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাদের।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা—ছুটিটা শিকেয় উঠল। ‘ঠিক আছে, তুমি অপেক্ষা করো। আমরা এখুনি কথা বলছি।’

সোহানাকে নিয়ে স্টাডিতে চলে এল রানা, ওখানে একটা ক্র্যাম্বলড লাইন আছে। ওটা দিয়ে ঢাকায় ফোন করল রানা—সরাসরি চিফের নাম্বারে।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরই রিসিভারে ভেসে এল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ‘ইয়েস?’

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়াক্ষকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন টিব টিব করতে থাকল।

কোনোরকমে নার্সাসনেসটা কাটিয়ে বলল, ‘রানা, সার।’

‘ইয়েস, এমআরনাইন, আমি তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জাকিরের কাছে গুনেছ সবকিছু?’

‘জী, সার।’

‘কী বুঝলে?’

‘কোথাও একটা গোলমাল আছে, সার। আমেরিকানদের হয়ে এত বছর ধরে কাজ করছেন ড. সিদ্দিকী, যে-কোনও বিপদে তো ওরাই তাঁকে প্রোটেকশন দেবে। আমাদের সাহায্য চাইছেন কেন ভদ্রলোক? বাংলাদেশেও তো আসতে চাইছেন না। কী যেন মিলছে না, সার।’

‘হ্যাঁ, রহস্য যে একটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই,’ একমত হলেন রাহাত খান। ‘তবে সে-কারণে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমরা। ড. আন্দালিব সিদ্দিকী আমাদের দেশের জন্য একটা অ্যাসেস্ট, এতদিন পর যখন ওঁর নাগাল পাওয়া গেছে, সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করো তুমি, এমআরনাইন। দেখো, ওঁকে দেশে নিয়ে আসা যায় কি না।’

‘কিন্তু সার...’ ভয়ে ভয়ে বলল রানা। ‘ড. সিদ্দিকী তো বাংলাদেশে আসতে চাইছেন না, আমেরিকাতেই গা-ঢাকা দিতে চাইছেন।’

‘জানি। কিন্তু কেন চাইছে—তা বের করো প্রথমে। তারপর চেষ্টা করবে ওঁকে বাংলাদেশে আসবার জন্য কনভিন্স করতে।’

‘ঠিক আছে, সার।’

‘কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সোহানাকে আমি তোমার ব্যাকআপ হিসেবে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে তোমার?’

আড়চোখে সোহানাকে দেখল রানা। টোক গিলে বলল,
'দী, সার।'

'ওকে জানিয়ে—ওর ছুটির দরখাস্তটা আপাতত স্থগিত
করে রাখছি আমি... সেই সঙ্গে তোমারটাও।'

'বলে দেব, সার।'

'চোখ-কান খোলা রেখো। ড. আন্দালিব সিদ্দিকী ছোটখাট
কোনও সমস্যায় পড়েছেন বলে মনে হয় না। ওঁকে সাহায্য
করতে গেলে বড় ধরনের বিপদ মোকাবেলা করতে হবে
তোমাকে।'

'আমি সাবধান থাকব, সার।'

'কী ঘটে না ঘটে, জানিয়ে আমাকে। বেস্ট অভ লাক,
রানা।' বলে লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

চার

ইঞ্জিন বন্ধ করে 'গাড়ি থেকে নেমে এল মাসুদ রানা। রানা
এজেন্সির কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে মডিফাই করা
একটা ফোর্ড টরাস ওটা, প্রথম দর্শনে ধূসর-রঙা গাড়িটার সঙ্গে
আর দশটা সাধারণ সেডানের কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না।
অবশ্য এই শেষ বিকেলে পরিত্যক্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাটায়
ওটাই একমাত্র গাড়ি।

নিউয়ার্ক, নিউ জার্সি। পরদিন। মেজর জেনারেল রাহাত
খানের সঙ্গে কথা বলার পর কেটে গেছে প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা।
এর মধ্যে সকাল ঠিক দশটায় আবার ফোন করেছিলেন ড.
আন্দালিব সিদ্দিকী—রানা ওঁকে সাহায্য করতে রাজি আছে শুনে
এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন তিনি, সঙ্গে দিয়েছেন একটা
সেলফোন নম্বর... বিকেলে মাত্র আধঘণ্টার জন্য চালু থাকবে
ওটা। জায়গামত পৌঁছে ফোন করতে হবে রানাকে, তারপর
দেয়া হবে পরবর্তী নির্দেশনা।

গাড়ি থেকে নেমেই চারপাশে তাকাল রানা। ষাট ফুট উঁচু
একটা ওয়্যারহাউস দেখা যাচ্ছে নাক বরাবর, নীচতলার
বাইরের দেয়াল শৌখিন আঁকিয়েদের করা রং-বেরঙের
গ্রাফিতোয় ভরা। বিল্ডিংটার বাকি অংশ অবশ্য দেখার মত
নয়—বয়সের ভারে জর্জরিত হয়ে গেছে পুরোটা। দেয়াল
কালচে বর্ণ ধারণ করেছে, জানালার কাঁচ একটাও অবশিষ্ট
নেই। ওয়্যারহাউসের প্রকাণ্ড দরজাটা ভাঙা, ফাঁক দিয়ে নানা
রকম আবর্জনা চোখে পড়ল। ওখানে বেশ কিছু বড়সড় কাঠের
ক্রেট আর কাগজের কার্টনও দেখা গেল—ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে
গৃহহীন উদ্ভাস্তরা বসবাস করে ওগুলোর ভিতর... এখনও আছে
বোধহয়, কানে আবছাভাবে মানুষের নড়াচড়ার শব্দ আসছে।
পুরো এলাকাটাই গৃহহীন আর ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল—আসার
পথে দেখেছে রানা।

মাথার উপর কালো মেঘের আনাগোনা, এলাকাটাকে
আড়াল করে রেখেছে সূর্যের কাছ থেকে। ওয়্যারহাউসের পিছন
দিয়ে নদী বইছে, ওখানে একটা টাগবোটের গুরুগম্ভীর হর্ন
বেজে উঠল... আর সেটার পর পরই আকাশে বিজলি চমকাল।
তারপরই কড়...কড়...কড়াৎ!

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা—কেমন যেন একটা অশুভ অনুভূতি কাজ করছে ওর ভিতর। আশ্বস্ত হবার জন্য জ্যাকেটের উপর দিয়ে শোল্ডার-হোলস্টারে বাম হাতের কনুই বোলাল ও—যেন ওখানে রাখা নাইন মিলিমিটার হ্যাণ্ডগানটার অস্তিত্ব নিশ্চিত করে নিতে চায়। ইদানীং একটা সিগ-সাওয়ার ২২৫ ব্যবহার করছে ও, ম্যাগাজিনে আটটা আর চেম্বারে একটা মিলিয়ে মোট ন’টা বুলেট ধরে। অ্যামিউনিশনের ক্যাপাসিটি সিক্সটিন-শট সিজ্‌ড সেভেন্টি ফাইভের চেয়ে অনেক কম, তবে জিনিসটা হালকা... অ্যাকিউরেসিও অন্যান্য অনেক হ্যাণ্ডগানের চেয়ে অনেক ভাল। কনসিল্ড ওয়েপন হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যেতেই জ্যাকেটের কলার তুলে দিল রানা, বৃষ্টি আসবে খুব শীঘ্রি। ওয়্যারহাউসের ভাঙা দরজার আড়াল থেকে কয়েকটা নোংরা মুখ উঁকি দিল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। সেদিকে ড্রফ্‌প না করে পকেট থেকে নিজের সেলফোনটা বের করল রানা, ডায়াল করল ড. সিদ্ধিকীর দেয়া নাম্বারটাতে।

রিং হতে হতে ওয়্যারহাউসের দরজায় কৌতূহলী মুখের সংখ্যা আরও বাড়ল। ওদিকে পিঠ ফিরিয়ে হেঁটে একটু দূরে চলে এল ও।

তিনবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল ‘ইয়েস?’ কণ্ঠটা ভারিক্কি, তবে কাঁপছে একটু।

‘ওয়্যারহাউসটা দেখি বন্ধ হয়ে গেছে!’ আগে থেকে ঠিক করা কোড উচ্চারণ করল রানা।

‘দশ বছর আগে,’ ওপাশ থেকে জবাব এল।

‘তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই দশদিনে আবার চালু করা

যাবে?’ কোডের শেষ অংশটা বলল রানা।

‘নিশ্চয়ই,’ একটু স্বস্তি ফুটল যেন ভারী কণ্ঠটাতে।
‘ওয়েলকাম টু নিউয়ার্ক, মি. রানা। পথ চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?’

‘খুব একটা নয়।’

‘ওড। তবে আপনার এজেন্সির যতটা সুনাম শুনেছি, তাতে আরও সুন্দর, আধুনিক কোনও গাড়ি আনবেন ভেবেছিলাম।’

‘সেক্ষেত্রে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো না? আমরা ওসব এড়িয়ে চলি। ঠাট দেখাতে গেলে কাজের কাজ হয় না কিছুই, বরং ঝামেলা বাড়ে।’

‘আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমার পছন্দ হয়েছে,’ বলল কণ্ঠটা।
‘আপনি একা এসেছেন তো?’

ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। একটু বিরক্ত হয়ে রানা বলল, ‘কেন, সন্দেহ আছে? গাড়ির কথা যখন বললেন, তার মানে তো আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।’

‘গাড়ির সবক’টা দরজা খুলুন, প্লিজ। আমি শিয়োর হতে চাই।’

খুলল রানা।

‘এবার ট্রান্সটা।’ নির্দেশ এল।

তা-ও খুলল রানা। মাথায় হিসেব কষছে—কোথায় পজিশন নিলে লোকটার পক্ষে গাড়ির ভিতরটা দেখা সম্ভব হতে পারে।

দু’মিনিট পেরিয়ে গেল, কথা বলছে না মানুষটা, ফোনে শুধু বসবস শব্দ হচ্ছে। ‘হ্যালো?’ ডাকল রানা।

অপরপক্ষ নিরুত্তর।

‘হ্যালো, ডক্টর? আপনি শুনতে পাচ্ছেন?’

তাও জবাব নেই।

আবার বজ্রপাত হলো কাছে কোথাও । বৃষ্টির তোড় বাড়ছে ।
ওয়্যারহাউস থেকে কয়েকজন ভবঘুরে বেরিয়ে এসেছে—ময়লা
পোশাক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাঁটছে এলোমেলো ভঙ্গিতে ।
নিশ্চয়ই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, ওকে সহজ শিকার ভেবে এগিয়ে আসছে
ছিনতাই করতে ।

‘হলোটা কী আপনার, ডক্টর?’ একটু রাগী স্বরে বলল রানা ।
‘আমি সাহায্য করতে এসেছি, বৃষ্টিতে ভিজতে নয় ।’

এখনও কথা বলছেন না বিজ্ঞানী । নাহ্, এভাবে দাঁড়িয়ে
থাকা চলে না । ভদ্রলোককে বোঝানো দরকার—ঠেকাটা তাঁর,
ওর নয় । ট্রান্স্ফের ডালা আর দরজাগুলো বন্ধ করল ও । ড্রাইভিং
সিটে উঠে বসতে যাবে, এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল ফোনটা ।
ভারিক্কি কণ্ঠটা বলল, ‘বিল্ডিঙের বাম পাশে চলে আসুন । একটা
দরজা পাবেন, ভিতরে সিঁড়ি আছে । চলে আসুন ।’

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়িতে ঢুকল রানা ।

‘যাচ্ছেন কোথায়?’ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী । ‘ভিতরে
আসুন!’

‘আগে গ্যাডিটা পার্ক করি,’ বলল রানা, আড়চোখে অ্যাডিক্ট
লোকগুলোকে দেখছে । ‘নইলে ফিরে এসে গাড়ির একটা
নাট-বল্টুও পাবো না ।’

ওয়্যারহাউসের বামদিকে একটা পার্কিং লট আছে, স্টার্ট
দিয়ে গ্যাডিটাকে ওখানে নিয়ে গেল রানা, রাস্তার দিকে মুখ করে
পার্ক করল, যাতে ইমার্জেন্সি দেখা দিলে দ্রুত বেরুনো যায় ।
তারপর বেরিয়ে এসে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তালা দিল
দরজায় ।

বিল্ডিঙের গায়ে লোহার দরজাটা দেখতে পেল ও
এবার—এই একটা দরজাই সম্ভবত অক্ষত আছে ভাঙাচোরা
মস্তদান-১

ভবনটার। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একছুটে দরজার সামনে পৌঁছুল ও; হাতলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা। ওপাশে কোনও বিপদ আছে কি না, জানা নেই। তবে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ও, তাই ফোনটা পকেটে রেখে পিস্তলটা হাতে নিল প্রথমে, তারপর সাবধানে ঢুকল ভিতরে।

দরজার ওপাশটায় আধো-অন্ধকার। আবছাভাবে ছোট্ট একটা ল্যাণ্ডিং দেখা গেল, সামনে স্টেয়ারকেস রয়েছে; ইম্পাতের তৈরি একটার পর একটা ধাপ উঠে গেছে উপরে। রেলিঙে মাকড়সার জালের রাজত্ব। ডানে একটা এলিভেটর ডোরও রয়েছে, ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মোটরের আওয়াজ। পুরো জায়গাটাতেই কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

পিছনে ঘটাং করে শব্দ হলো—দরজাটা আটকে গেছে। মাথা ঘোরাতেই পাল্লার ওপাশটায় লাগানো একটা ইলেকট্রনিক লকিং মেকানিজম চোখে পড়ল। দূর থেকে রিমোটের সাহায্যে তালা আটকানো যায়। নিজেকে বন্দি মনে হলো রানার... তালাবদ্ধ একটা জায়গায় আটকা পড়তে কার-ই বা ভাল লাগে?

পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডায়াল করল আবার ও। ‘কোথায় আপনি?’

জবাব এল না, তার বদলে মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল এলিভেটরের দরজাটা, ভিতরে জ্বলতে থাকা বাতি থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়ল ল্যাণ্ডিংয়ে।

এ-ধরনের পরিস্থিতিতে এলিভেটর পছন্দ করে না রানা—ছোট্ট লোহার বাক্সটা মরণফাঁদ হয়ে উঠতে পারে মুহূর্তে। তাই ও বলল, ‘ধন্যবাদ, তবে একটু পায়ের ব্যায়াম দরকার আমার। সিঁড়ি ধরে আসছি।’

বলল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো না ও। তাড়াহুড়ো

করতে চাইছে না, বুঝে-শুনে-এগোবে। আবছা আলোর সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে নেয়ার জন্য একটু সময় নিল, চোখদুটোয় ছায়া-ছায়া পরিবেশ সয়ে আসতেই সিঁড়ির ফাঁকে বসানো সার্ভেইলাস ক্যামেরাটা দেখতে পেল ও।

‘আপনি দেখছি ফাস্ট ক্লাস সিকিউরিটি সিস্টেম বসিয়েছেন এখানে,’ বলল রানা।

‘দুঃখের বিষয়, ব্যবস্থাটা শুধু সাময়িক নিরাপত্তা দিতে পারে। আমার পিছনে যারা লেগেছে, তাদের জন্যে এটা কিছুই নয়।’ ফোন নয়, দেয়ালে বসানো লুকানো স্পিকার থেকে ভেসে এল কথাটা। ‘সেজন্যেই আপনাকে আমার প্রয়োজন, মি. রানা। আসুন উপরে, আমি অপেক্ষা করছি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা, ফোনটা আবার রেখে দিয়েছে পকেটে। দোতলায় একটা লোহার দরজা পড়ল, ওটার দিকে এগোতেই স্পিকারে শোনা গেল, ‘ওটা নয়। একদম উপরে চলে আসুন। এখানে আরেকটা দরজা পাবেন।’

ঘুরে আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল রানা। স্পিকারে বলা হলো, ‘কিছু মনে করবেন না, তবে আপনি যেভাবে পিস্তল বাগিয়ে উঠে আসছেন, তাতে একটু অস্বস্তি বোধ করছি আমি।’

‘কিন্তু আমি স্বস্তি বোধ করছি,’ গলা চড়িয়ে বলল রানা। ‘এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আপনার চেয়ে আমার স্বস্তিটাই বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয় কি?’

হালকা একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। ‘আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই, মি. রানা। আমি আপনার জন্য বিপজ্জনক নই।’

‘কথা দিচ্ছি—নিশ্চিত হওয়ামাত্র পিস্তলটা সরিয়ে রাখব।’

চুপ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। একটু পরই টপ ফ্লোরে উঠে এল রানা। সামনে একটা দরজা রয়েছে, হাট করে খোলা।

ওপাশে একটা আলোকিত করিডর দেখা যাচ্ছে। করিডরের অপরপ্রান্তে আরেকটা দরজা রয়েছে, সেটা বন্ধ। দরজার উপরে রয়েছে আরও একটা ক্যামেরা। হেঁটে গিয়ে দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর নব ঘুরিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। বার কয়েক চোখ মিটমিট করে আলোটা সহিয়ে নিয়ে পা রাখল কামরায়। নানা আকারের অনেকগুলো টিভি মনিটর রয়েছে ভিতরে—সার্ভেইলান্স ক্যামেরার ফিড দেখানোর জন্য। আর রয়েছে একটা মাঝারি আকারের ইলেকট্রনিক কনসোল। তবে রানার নজর কাড়ল কনসোলের সামনে চেয়ারে বসা মানুষটা—দরজার দিকে মুখ করে রয়েছেন তিনি, প্রসারিত হাতে ধরে রেখেছেন একটা কোন্ট্রোল .৪৫ সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, ভীষণভাবে কাঁপছে ব্যারেলটা। টেনশন, নাকি ভয়ে—বলা কঠিন।

ড. আন্দালিব সিদ্দিকী!

পাঁচ

ভীষণ দৃষ্টিতে বিজ্ঞানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা। ডোশিয়েতে তাঁর যে-ক'টা ছবি আছে, তার সবই কয়েক

বছরের পুরনো। এর মাঝে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ভদ্রলোকের। মোটা হয়েছেন বেশ, দেহটাকে প্রায় থলথলেই বলা যায়। বয়স মাত্র উনচল্লিশ হলেও মাথার উস্কোখুস্কো চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে—নিশ্চয়ই টেনশন আর কাজের চাপে। চোখদুটো গর্তে বসে গেছে, মণির সাদা অংশ লাল হয়ে রয়েছে—নির্ঘুম রাত কাটানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত। শেভও করেন না বোধহয় কয়েকদিন থেকে, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরে রয়েছে গাল। অবশ্য এই পরিবর্তিত এবং বিধ্বস্ত অবস্থাতেও পুরনো ছবিগুলোর সঙ্গে চেহারার মিল পাওয়া যায়। সন্দেহের অবকাশ নেই, ইনি সত্যিই ড. আন্দালিব সিদ্দিকী। কেন যেন প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে আছেন ভদ্রলোক, কোন্ট-ধরা হাতের কাঁপুনি সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

‘রিল্যাক্স!’ নিজের পিস্তলটা নামিয়ে বলল রানা। ‘গুলি করে বসবেন না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।’

‘আমাকে শিয়োর হতে হবে,’ বললেন ড. সিদ্দিকী, ‘আপনি সত্যিই মাসুদ রানা তো?’

‘আর কে হতে পারি? আর কয়জনকে আপনার ফোন নম্বর, কোড বা ঠিকানা দিয়েছেন?’

‘ওসব টরচার করেও জেনে নেয়া যায়।’ ডান হাতে কোন্টটা স্থির রেখে বাম হাত দিয়ে কনসোলার একটা বোতাম চাপলেন সিদ্দিকী। ধড়াম করে রানার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল রুমের দরজাটা—আবার সেই ইলেকট্রনিক লক!

বিজ্ঞানীকে আশ্বস্ত করার জন্য পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলল রানা। বলল, ‘খামোকা ভয় পাচ্ছেন, ডক্টর। যে-ধরনের সিকিউরিটির ব্যবস্থা রেখেছেন এখানে, তাতে কেউই একা আপনার ওপর হামলা করতে আসবে না। যুক্তি দিয়ে বিচার

করলেই বুঝতে পারবেন, আমি আপনার জন্য কোনও থ্রেট নই।’

‘অপ্রত্যাশিত কৌশলই সবচেয়ে কার্যকর হয়,’ অনড় ভঙ্গিতে বললেন সিদ্দিকী। ‘একা একজনকে দেখে অসতর্ক হয়ে পড়ব, আর সেই সুযোগে আমাকে ঘায়েল করবেন—এমনটা হতে পারে না?’ কাটা কাটা স্বরে কথা বলছেন তিনি। ‘তা ছাড়া বন্ধু হিসেবে এলেও যুক্তিটা আপনার বিপক্ষে যাচ্ছে। একজন মানুষ যদি থ্রেট হিসেবে বিরাট কিছু না হয়ে থাকে, তা হলে সেই একজন মাত্র মানুষই বা কীভাবে আমাকে প্রয়োজনীয় প্রোটেকশন দেবে?’

‘আপনি তো প্রোটেকশন চাননি, চেয়েছেন নাম-পরিচয় পাল্টে হারিয়ে যেতে।’

‘সেটা আপনার একার পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব?’

‘না,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘এর জন্য অনেক ধরনের প্রস্তুতি লাগে, আমি সকল কাজের কাজী নই। ওসবের জন্য আমার এজেন্সির আলাদা একটা স্পেশালিস্ট টিম আছে, আপনার কেসটাও... যদি আমরা নিই... ওরাই সামলাবে।’

‘আমি তো আর কাউকে চাইনি, শুধু মাসুদ রানাকে চেয়েছি!’ প্রতিবাদ করলেন সিদ্দিকী।

‘চিন্তার কিছু নেই, আমি পুরো সময়টা আপনার সঙ্গে থাকব,’ আশ্বাস দিল রানা। ‘ভয় পাবেন না, আমি সত্যিই মাসুদ রানা।’

‘সেটাই তো নিশ্চিত হতে চাইছি।’

ধৈর্য হারাতে বসেছে রানা। থমথমে গলায় বলল, ‘ডক্টর, আপনি আমার সাহায্য চান? তা হলে পিস্তলটা নামান। নইলে ওটা আমি কেড়ে নেব।’

‘কেড়ে নেবেন!’

‘হ্যাঁ, কেড়ে নেব। তাতে আপনি আহতও হতে পারেন। সেটাই কি চান?’

মাথা নাড়লেন ড. সিদ্দিকী। ‘আমি শুধু বাঁচতে চাই।’

‘তা হলে সরান পিস্তলটা।’

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন বিজ্ঞানী, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে ফেললেন অস্ত্র-ধরা হাতটা। দুর্বল গলায় বললেন, ‘আপনি যদি মাসুদ রানা না হয়ে থাকেন, তা হলে এখুনি খুন করে ফেলুন আমাকে। আমি আর টেনশন সহ্য করতে পারছি না।’

পাশ থেকে একটা খালি চেয়ার টেনে বসল রানা। বলল, ‘আগেই বলেছি—আমিই রানা। আপনার ভয়ের কিছু নেই। ক্ষতি করবার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতাম।’

‘যদি তা-ই হয়ে থাকেন, তা হলে এক্ষুণি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করুন,’ আকুতির মত শোনাতে ড. সিদ্দিকীর কথাটা। ‘আমি মস্ত বিপদে আছি, এই হাইডআউট আমার জন্য নিরাপদ নয়।’

‘অস্থির হবেন না,’ রানা বলল। ‘আগে পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে আমাকে। কারা আপনাকে খুন করতে চায়? কেন?’

‘ওসব জানার প্রয়োজন আছে কি?’

‘অবশ্যই। বিপদের ধরন অনুসারে প্রোটেকশন মেথড ঠিক করতে হয়।’

‘মেথড তো বলেই দিয়েছি—পরিচয় পাচ্চেন হবে আমাকে... গা-ঢাকা দিতে হবে।’

‘তারপরও... বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন, যাতে বুঝতে
অন্তর্ধান-১

পারি—কী ধরনের পরিচয় দেয়া হলে আপনি সবচেয়ে নিরাপদ থাকবেন।’

‘তা আমিই বলে দিতে পারি।’

এবার সত্যিই বিরক্ত হলো রানা। ‘দেখুন, আমার সাহায্য চাইলে লুকোচুরি করতে পারবেন না। এতে রাজি না থাকলে খামোকাই সময় নষ্ট করছি আমরা।’

হার মানলেন যেন বিজ্ঞানী। ‘ঠিক আছে, আপনার কথামতই হবে সব।’

‘তা হলে সমস্যাটা গোড়া থেকে খুলে বলুন।’

‘বলব... তার আগে...’ ঘন ঘন শ্বাস নিতে শুরু করেছেন ড. সিদ্দিকী, কথা আটকে যাচ্ছে।

‘কী হয়েছে আপনার?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

‘...অ্যাজমা...আমার ইনহেলার...’

‘কোথায় ওটা?’

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন ড. সিদ্দিকী।

তাড়াতাড়ি উঠে গেল রানা। রুমের একপাশে একটা ছোট ক্যাম্প-খাট আছে, পাশেই সাইড-টেবিল, তার উপর পাওয়া গেল ইনহেলারটা। ওটা এনে দিল ও। ইনহেলারটা মুখে লাগিয়ে স্প্রিং করতে শুরু করলেন বিজ্ঞানী। তাঁকে স্বাভাবিক হতে সময় দিল রানা, এই ফাঁকে নজর বোলাল রুমটার উপর।

খাট ছাড়াও বেশ কিছু জিনিস রয়েছে ঘরটাতে—একটা মিনি-ফ্রিজ, সিল্ক, ছোট স্টোভ, ভাঙাচোরা বইয়ের শেলফ, তার উপরে চোন্দো-ইঞ্চি একটা টিভি আর ডিভিডি প্রেয়ার। এক কোণে বাথরুমের দরজাও দেখা গেল। খাটের পাশে মেঝেতে স্তূপ হয়ে আছে নানা রকমের কেনা-খাবার। ম্যাকারনি-চিজ, টিনজাত র্যাভিওলি-লাসানিয়া, চকলেট, ক্যাণ্ডি বার, পটেটো-

চিপস্, কেসভর্তি কোকাকোলা—সবই রিচ ফুড। ভদ্রলোকের থলথলে দেহের রহস্য বোঝা যাচ্ছে এখন—খাবারদাবারের ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন ড. সিদ্দিকী।

‘ক’দিন থেকে আছেন আপনি এখানে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘দু’সপ্তাহ,’ ইনহেলার নামিয়ে জবাব দিলেন ড. সিদ্দিকী, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিকে নেমে এসেছে।

শেলফে সাজিয়ে রাখা বইগুলো নজর কাড়ল রানার, এগিয়ে গিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে শুরু করল ও। গল্প-উপন্যাস নেই একটাও, সবই তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধের বই—নানাবিধ সব বিষয়ের উপরে। জিয়োলজির বই যেমন আছে, আছে ফটোগ্রাফির বইও। প্রচ্ছদে নগ্ন নারীর ছবি দেখে একটাকে মনে হলো পর্নোগ্রাফি, আবার এর সঙ্গে একেবারে বেমানান হয়ে পাশাপাশি পড়ে রয়েছে একটা কাব্যগ্রন্থ—কালেক্টেড পোয়েমস্ অভ রবিনসন জেফারস্।

বইটা হাতে তুলে রানা প্রশ্ন ছুঁড়ল, ‘কবিতা পছন্দ করেন?’

‘খুব। হৃদয়ে শান্তি এনে দেয়।’

পাতা উল্টে একটা কবিতার প্রথম কয়েকটা লাইন জোরে জোরে পড়ল রানা। ‘আই বিল্ট হার আ টাওয়ার, হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং—সামটাইম শি উইল ডাই!’

‘লাইনটা কী’ অদ্ভুত খেয়াল করেছেন?’ বললেন ড. সিদ্দিকী। ‘শাহজাহানের তাজমহলের মত প্রেমিকাকে টাওয়ার বানিয়ে দিয়েছে, আবার তার মৃত্যুও কামনা করছে! পাঠকের মনোযোগ খপ্প করে ধরে ফেলে। এজন্যেই রবিনসন জেফারস্ আমার এত প্রিয়।’

প্রত্যুত্তর দিল না রানা, বই রেখে এবার মনোযোগ দিল অন্তর্ধান-১

ডিভিডি-র দিকে—মাত্র দুটো ডিস্ক দেখা যাচ্ছে প্লেয়ারের পাশে। আসলে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে মানুষটার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে আইডিয়া নিচ্ছে ও—যদিও তেমন সুবিধে করতে পারছে না। বইগুলোর বিষয় যেমন বিচিত্র, ছবিদুটোর-ও। একটা ক্লিন্ট ইস্টউডের থ্রিলার, অন্যটা স্যাণ্ডা ডি আর ট্রয় ডোনাহিউ অভিনীত পুরনো দিনের বুক-ভাসানো রোমান্টিক ট্র্যাজেডি।

‘আপনার সিনেমার পছন্দ তো দেখি ভারি অদ্ভুত!’ কৌতূহলী সুরে বলল রানা। ‘সম্পূর্ণ বিপরীত ধাঁচের দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি... দু’রকমই ভাল্লাগে আপনার?’

সুস্থ হয়ে উঠেছেন ড. সিদ্দিকী। ঠোটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ‘উঁহু, ব্যাপারটা তা নয়। ও’দুটোতে কমন একটা জিনিস আছে—ওটাই আমার পছন্দ। ছোটবেলা থেকেই জিনিসটা আমার একটা স্বপ্ন বলতে পারেন।’

‘কীসের কথা বলছেন?’

‘বলে দিলে আর মজাটা রইল কোথায়?’ রহস্য করলেন বিজ্ঞানী। ‘সময়-সুযোগ পেলে নিজেই খুঁজে নেবেন না হয়!’

চাপাচাপি করল না আর রানা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ড. সিদ্দিকীর মুখোমুখি চেয়ারটায় ফিরে এল ও। বসতে বসতে বলল, ‘আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে আমি ইমপ্রেসড, ডক্টর। সিকিউরিটি, খাবারের স্টক, সময় কাটানোর ব্যবস্থা... কিছুতেই খুঁত নেই। এমনকী গৃহহীন, ভবঘুরেদের মাঝখানে কাভার নেয়ার আইডিয়াটাও চমৎকার—এখানে আপনাকে খোঁজার কথা কেউ চিন্তাও করবে না। বিপদের মাঝখানে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এতকিছুর ব্যবস্থা করা সত্যি কঠিন।’

‘খামোকা প্রশংসা করবেন না,’ বললেন ড. সিদ্দিকী।
‘এসব আসলে কয়েক বছর আগেই রেডি করে রেখেছিলাম
গ্রামি, ইমার্জেন্সি সামলাবার জন্যে। তখন মাথার উপর খাঁড়া
শুলছিল না, তাই ধীরে-সুস্থে প্ল্যান করেই হাইডআউটটা তৈরি
করতে পেরেছি।’

ভুরু কঁচকাল রানা। ‘বিপদে যে পড়বেন, সেটা তখন
থেকেই জানতেন?’

‘না। আমি স্রেফ সতর্ক একজন মানুষ, মি. রানা।’

‘তাই বলে এতকিছু করে কেউ?’

‘করে, যদি...’ বলতে বলতে থেমে গেলেন সিদ্দিকী।

‘যদি কী?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব দিলেন না বিজ্ঞানী, সার্ভেইলান্স ক্যামেরার একটা
মনিটরে দৃষ্টি আটকে গেছে তাঁর, রানাও ওদিকে তাকাল।
ক্যামেরাটা বিল্ডিংয়ের বাইরে বসানো, জিনে পার্কিং লট আর ওর
গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ডজনখানেক লোক এগোচ্ছে গাড়িটার
দিকে, তমুল বৃষ্টির কারণে শুধু অবয়ব ছাড়া আর কিছু বোঝা
যাচ্ছে না ওদের।

সেই ড্রাগ-অ্যাডিস্ট লোকগুলো, ধারণা করল রানা। নিশ্চয়ই
গাড়ি থেকে কিছু চুরি করার তালে আছে। ড. সিদ্দিকী বিস্মিত
দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মনিটরের দিকে। বিড় বিড় করে
বললেন, ‘করছেটা কী ওরা?’

মুচকি হাসল রানা। ‘মতলব যা-ই হোক, সুবিধে করতে
পারবে না।’

ঝট করে ওর দিকে তাকালেন সিদ্দিকী। ‘মানে?’

‘এখুনি দেখতে পাবেন।’ পকেট থেকে ফোর্ডের রিমোটটা
বের করল রানা, ওটা একটু অস্বাভাবিক—বাড়তি ছ’টা বোতাম

আছে। লোকগুলোকে গাড়ির কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে দিল ও, তারপরই চাপ দিল একটা বোতামে।

মনে হলো লিক করেছে—আচমকা রাশ রাশ সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল ফোর্ডের তলা দিয়ে... চারপাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো, তারপরই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ধোঁয়া ভেদ করে—চোখ কচলাতে কচলাতে পড়িমরি করে পিঠটান দিচ্ছে।

‘ইয়া খোদা!’ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ড. সিদ্দিকী। ‘কী করেছেন আপনি?’

‘সিরিয়াস কিছু নয়,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘টিয়ার গ্যাস—অবাস্তিত ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে কার্যকর একটা উপায়। আগামী কয়েক ঘণ্টা নেশা-টেশার কথা ভুলে যাবে ওরা।’

‘আপনার গাড়িতে টিয়ার গ্যাস থাকে?’ ড. সিদ্দিকীর বিস্ময় যেন বাধ মানছে না।

‘শুধু টিয়ার গ্যাস না, আরও অনেক কিছুই থাকে,’ হাসল রানা। ‘ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড, বিল্ট-ইন মেশিনগান... এমনকী হেডলাইটের পিছনে স্টিংগার মিসাইলও বসানো যায়। বিশেষভাবে মডিফাই করা হয়েছে ওটা—বুলেটপ্রুফ, চেসিসটা আর্মার-প্লেটেড। বুঝতেই পারছেন, আপনাকে অক্ষত রাখার জন্যে সেরা জিনিস নিয়েই এসেছি আমি।’

‘আমি ইম্প্রেসড, মি. রানা!’ প্রশংসার সুরে বললেন সিদ্দিকী। ‘আমরা এখনও তা হলে বসে আছি কেন? চলুন, রওনা হয়ে যাই।’ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেন তিনি।

‘এক মিনিট, ডক্টর!’ শান্ত কণ্ঠে ওঁকে বাধা দিল রানা। ‘এখনও আপনি পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেননি। কীসের বিরুদ্ধে

কাজ করতে হবে, সেটা না জেনে এক পা-ও নড়ছি না আমি।’

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন বিজ্ঞানী। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে তিক্ত গলায় বললেন, ‘আপনি দেখছি ভারি নাছোড়বান্দা লোক!’

‘যা-খুশি ভাবতে পারেন,’ বলল রানা। ‘তবে আপনাকে আমার দিকটাও চিন্তা করতে হবে। কাউকে নকল নাম-পরিচয় দেয়া একটা বেআইনী কাজ। এফবিআই যদি টের পায়, আমার গোটা এজেন্সি বিপদে পড়ে যাবে। এই ঝুঁকি কেন নেব আমি? সমস্যাটা খুলে বলুন, বিকল্প কোনও পথে ওটার সমাধান করা যায় কি না, ভেবে দেখি।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন ড. সিদ্দিকী। ‘আপনি কি আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবার কথা ভাবছেন?’

জবাব দিল না রানা।

‘লুকোছাপার কিছু নেই, মি. রানা,’ থমথমে গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘বিসিআই আর রানা এজেন্সি যে একই জিনিস—তা আমি জানি। জানি বলেই আপনাদের সাহায্য চেয়েছি, কারণ আমি ভেবেছি—বাঙালি একজন বিজ্ঞানীকে আপনারাই সবচেয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য করবেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি বাংলাদেশে যেতে চাই।’

‘আপনি কেন ভাবছেন, আপনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমরা পাগল হয়ে গেছি? আপনি গুরুত্বপূর্ণ লোক, তবে নিজেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছেন বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার।’ হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, ‘কোথায় থাকবেন, কী করবেন সেসব আপনার নিজস্ব ব্যাপার। তার পরেও জানতে ইচ্ছে করে, মা-বাবার দেয়া নাম-পরিচয় মুছে ফেলার মত বিপদে যদি সত্যিই পড়ে থাকেন আপনি, তা হলে অন্তর্ধান-১

বাংলাদেশে চলে যাওয়াটাই কি অনেক নিরাপদ নয়? ওখানে আপনার সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে...'

‘ওটা আমার দেশ নয়, মি. রানা। আমেরিকায় বড় হয়েছি আমি, আমার জন্য এটাই নিজের দেশ। যত বিপদই আসুক, এ-দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।’

‘তা হলে তো শুধু শুধু এসেছি আমি। বাংলাদেশকে যখন আপনি মাতৃভূমিই ভাবেন না, তখন আমরাই বা কোন্ দুঃখে আইন ভেঙে সাহায্য করব বিদেশি এক লোককে?’

‘আমাকে ভুল বুঝছেন আপনি,’ বললেন সিদ্দিকী। ‘বাংলাদেশের প্রতি আমার দরদ নেই—তা তো বলিনি। ওটা যে আমার সত্যিকার মাতৃভূমি, সেটাও অস্বীকার করি না। কিন্তু দেশটা আমার জন্য বিদেশ-বিভূঁইয়ের মত, ওখানকার সমাজ-সংস্কৃতি আমার একেবারেই অচেনা, গিয়ে স্বস্তি পাবো না। তাই যেতে চাই না ওখানে।’

‘কথাটা তো একই দাঁড়াল, তাই না? বাংলাদেশকে কিছুই দেবার নেই আপনার।’

‘আছে, মি. রানা,’ জোর দিয়ে বললেন বিজ্ঞানী। ‘এখানে বসেই আমি আমার মেধা-বুদ্ধি বাংলাদেশের উপকারে ব্যয় করতে পারব। আপনি শুধু আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিন।’

যা বলছেন, তা স্রেফ কথার কথা, নাকি ভদ্রলোক সত্যিই আন্তরিক—বোঝার চেষ্টা করল রানা। একটা ব্যাপার ঠিক, কথার মারপ্যাঁচে আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি বার বার। কিছুতেই বলছেন না, কী সমস্যায় পড়েছেন। মার্কিন সরকারের হয়ে গোপন গবেষণা করেন সিদ্দিকী, সমস্যাটা ব্যাখ্যা করতে গেলে টপ সিক্রেট কিছু ফাঁস হয়ে যাবে... সেজন্যেই কি এত

রাখটাক? লোকটাকে আরেকটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েই থমকে গেল স্ক্রিনে চোখ পড়ায়।

পার্কিং লটে আবার ফিরে এসেছে ছায়ামূর্তিগুলো—এবার অবশ্য সংখ্যায় কম, মাত্র চারজন। ভুরু কুঁচকে গেল রানার—নেশার জন্য যত পাগলই হোক, টিয়ার গ্যাসে নাস্তানাবুদ হবার পর সহজে কারও ফিরে আসার কথা নয়। এই লোকগুলো আসছে কেন? এদের চলাফেরার ভঙ্গিও সন্দেহ জাগিয়ে তুলল ওর মনে। না, ড্রাগ-অ্যাডিক্টের মত এলোমেলো পদক্ষেপে হাঁটছে না কেউ। পা টিপে টিপে, সতর্কভাবে এগোচ্ছে মানুষ চারজন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও অবাক হলো ও—গাড়ির চারদিকে চলে গেছে লোকগুলো... সুন্দরভাবে পজিশন নিয়েছে, এগোচ্ছে সমান তালে। নাকমুখে রুমাল বেঁধেছে ওরা—নিশ্চয়ই টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য।

প্রমাদ গুনল রানা—ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এবার। এরা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট নয়। অ্যাডিক্টদের মধ্যে এমন শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। লোকগুলোর মুভমেন্ট ঠিক প্রফেশনালদের মত। ভাড়াটে সৈনিক হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কী চায় এরা?

জবাবটা পাওয়া গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। রিমোটটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল রানা প্রতিপক্ষের জন্য—গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুলেই আরেকটা আঘাত হানবে। টিয়ার গ্যাস না, এবার ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ফাটিয়ে ব্যাটারদের অন্ধ আর বধির করে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। ফোর্ডের দশ গজ দূরে পৌঁছেই থেমে দাঁড়াল রহস্যময় লোক-চারটে, পরস্পরের সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করল, তারপর একত্রে চারদিক থেকে কী যেন ছুঁড়ে দিল গাড়ির নীচে। ছুঁড়েই উল্টো ঘুরে দৌড় দিল।

ড. সিদ্দিকীও দেখছেন দৃশ্যটা, চোঁচিয়ে উঠে বললেন, 'শিট! কী ছুঁড়ল ওরা?'

পাথর হয়ে গেছে যেন রানা। কোনোমতে শুধু বলল, 'বোমা!'

পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। চেসিসের তলা থেকে চোখ-ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে একটা আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠল—রানা আর ড. সিদ্দিকীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল গাড়িটা।

ছয়

সার্ভেইলান্স, ক্যামেরার সঙ্গে মাইক্রোফোন আছে, স্পিকারে ভেসে এল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ—বিল্ডিঙের পুরো কাঠামোই যেন কেঁপে উঠল সেই শব্দে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অঝোর বর্ষণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটিতে নেমে এল ফোর্ডের জ্বলন্ত খণ্ড-বিখণ্ড অংশ। ছোট টুকরোগুলোর আগুন অবশ্য বৃষ্টির পানিতে নিভে গেল; তবে মূল ধ্বংসাবশেষটা জ্বলছে এখনও।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভাষা হারিয়েছে রানা আর ড. সিদ্দিকী, স্বাভাবিক হবার সময় পেল না। দ্বিতীয় একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে আবার চমকে গেল ওরা। নীচতলায় হয়েছে ওটা—হাইডআউটের এন্ট্র্যান্সে! বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে

দেয়া হয়েছে ল্যাণ্ডিঙে ঢোকার দরজাটা। স্টেয়ারকেসের নীচের দিকটা ধোঁয়ায় ভরে যেতে দেখা গেল মনিটরে।

খানিক পরেই ভাঙা চৌকাঠ পেরিয়ে পিস্তল হাতে তিনজন লোক ঢুকল ল্যাণ্ডিঙে। মনিটরে দেখা গেল—একজন এলিভটরের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে, অন্য দু'জন অস্ত্র বাগিয়ে উঠতে শুরু করেছে সিঁড়ি ধরে। পোশাক-আশাক ময়লা ওদের, মুখে দাড়ি-গোঁফ... তবে রানা পরিষ্কার বুঝতে পারল—এরা ভবঘুরে নয়, ছদ্মবেশ নিয়েছে। ওয়্যারহাউসের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্যই এ-সাজ। গাড়ি থেকে নেমে এদেরকেই দেখেছিল ও—নিশ্চয়ই ওয়্যারহাউসের সামনের দিকে বসে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

হোলস্টার থেকে সিগ-সাওয়ারটা বের করে হাতে নিল রানা। জিজ্ঞেস করল, ‘এখান থেকে বেরুনোর আর কোনও রাস্তা আছে, ডক্টর?’

জবাব দিলেন না সিদ্দিকী, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন তিনি, মনে হলো রানার উপস্থিতি সম্পর্কেই সচেতন নন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছেন স্কিনের দিকে।

‘ডক্টর?’ ডাকল রানা।

নিরন্তর রইলেন বিজ্ঞানী।

এক পা এগিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল রানা। ‘কী হয়েছে আপনার? কথা বলছেন না কেন?’

ঘোলা চোখে ওর দিকে তাকালেন সিদ্দিকী। ‘ওরা এসে গেছে, মি. রানা।’

‘কারা?’

‘যাদের ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।’

‘কাদের কথা বলছেন?’

জবাব না দিয়ে কনসোলের উপর ঝুঁকলেন বিজ্ঞানী। দ্রুত কয়েকটা বোতাম টিপলেন, তারপর আস্তে আস্তে বাম হাতে ঘোরাতে শুরু করলেন একটা ডায়াল।

‘কী করছেন আপনি?’ জানতে চাইল রানা।

এবারও জবাব পাওয়া গেল না, সিদ্দিকী নিজের কাজে ব্যস্ত, ওকে গ্রাহ্য করছেন না। আরও দুজন রক্ষক চেহারার লোককে উদয় হতে দেখল রানা স্কিনে, বিস্ফোরণের ধূম্রজাল ভেদ করে নীচতলায় এসে ঢুকেছে—এদের হাতেও উদ্যত অস্ত্র... এমপি-৫ সাবমেশিনগান!

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় খেলল রানার। নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল, ‘সিঁড়িতে কি আপনি কোনোরকম বুবি-ট্র্যাপ বসিয়েছেন?’

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না ড. সিদ্দিকী, সোজা হয়ে তাকালেন স্কিনের দিকে। না, বোমা ফাটল না সিঁড়িতে, গর্জে উঠল না কোনও লুকানো আগ্নেয়াস্ত্র, সব আগের মতই আছে। তারপরও কেন যেন হামলাকারীদের ঘাবড়ে যেতে দেখল রানা—এমনভাবে এগোচ্ছে, যেন বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছে না।

বামদিকের একটা মনিটরে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। দোতলার ল্যান্ডিং পৌঁছে গেছে প্রথম দুই অস্ত্রধারী, স্কিনে ওদের চেহারা দেখা যাচ্ছে খুব কাছ থেকে। লোকদুটোর মুখ ভেজা—প্রথমে মনে হলো বৃষ্টির কারণে, কিন্তু ভাল করে তাকাতেই বুঝল, ব্যাপারটা তা নয়। দরদর করে ঘামছে ওরা, চেহারায় ভীতির স্পষ্ট ছাপ।

হঠাৎই পাগল হয়ে গেল যেন একজন—রেলিঙের উপর

দিয়ে ঝুঁকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল উপরদিকে, তারপর স্টেয়ারকেসের ফাঁক দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত গুলি শুরু করল তেতলার দিকে। দ্বিতীয়জনের নার্ভও হার মানল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, আতঙ্কিত ভঙ্গিতে গুলি করতে শুরু করল সে ডাইনে-বাঁয়ে।

আরও এক দফা শব্দ শুনে প্রথম মনিটরটার দিকে তাকাল রানা। ল্যাণ্ডিংয়ের লোকগুলোও পাগলামি শুরু করেছে—একজন গুলি করেছে ফাঁকা এলিভেটর লক্ষ্য করে, অন্য দুজন ঘুরে দাঁড়িয়েছে রিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া দরজাটার দিকে, বৃষ্টিভেজা শূন্য-পার্কিং লটের দিকে ফায়ার করেছে ওরা।

হতভম্ব হয়ে গেল রানা। হচ্ছেটা কী? পাঁচ-পাঁচজন প্রফেশনাল লোক হঠাৎ এমন উন্মাদের মত আচরণ শুরু করল কেন? বিস্মিত কণ্ঠে সিদ্ধিকীকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী করেছেন আপনি?’

‘আমি! কই, কিছু না তো!’ অবাক হবার ভান করলেন ড. সিদ্ধিকী, কিন্তু ভদ্রলোক যে সত্যি বলছেন না, তা একটা ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারবে।

তবে এ-নিয়ে কথা বাড়াবার সময় নেই হাতে। জ্বিনে প্রথম দুই অস্ত্রধারীকে দেখতে পাচ্ছে রানা—অসংলগ্ন আচরণ করলেও ঠিকই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে! এমপি-৫ হাতে যে-কোনও মানুষই ভয়ঙ্কর, পাগলরা তো আরও বেশি! তা ছাড়া নীচেও এদের সশস্ত্র সঙ্গী-সাথী আছে, লড়াই করে সুবিধে করা যাবে না। আপাতত পিছু হটাই সবচেয়ে ভাল কোর্স অভ অ্যাকশন।

‘পালাতে হবে আমাদের,’ ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল ও। ‘আর কোনও রাস্তা...’

‘আছে,’ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ড. সিদ্দিকী। ‘আসুন আমার সঙ্গে।’

রানাকে রুমের একপাশে নিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী, একটুও ইতস্তত না করে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন দেয়ালে সাঁটানো ওয়ালপেপার—লুকানো একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল তাতে।

‘ওপাশে কী?’ জানতে চাইল রানা।

‘মেইনটেন্যান্সের একটা ক্যাটওয়াক। ওটা ধরে বিল্ডিংয়ের অন্যপাশে যাওয়া যাবে। ওখানে এই রুমটার মত আরেকটা রুম আছে, সিঁড়ি ধরে নীচে চলে যেতে পারব আমরা।’

দমে গেল রানা। হামলারত পাঁচজন ছাড়াও ওয়্যারহাউসের মূল অংশে আরও অনেক লোক ছিল—গাড়ি থেকে নামার সময় দেখেছে ও। ওদের মধ্যে ক’জন শত্রুপক্ষের, আর ক’জন সত্যিকার উদ্বাস্তু ছিল—বলা কঠিন। ক্যাটওয়াক ধরে এগোলে আড়াল-বিহীনভাবে লোকগুলোর মাথার উপর দিয়ে যেতে হবে। নীচে নামলেও গিয়ে পড়বে ওদেরই সামনে। উঁচু দরের ট্রেইনিং পাওয়া সব লোক এসেছে হামলা চালাতে, যদি দু’জনের বেশি শত্রু থাকে উদ্বাস্তুদের মাঝে, রানার একার পক্ষে সামলানো সহজ হবে না। ড. সিদ্দিকীর যা অবস্থা, তাতে ওরা আক্রমণ করে বসলে কোনও ধরনের সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবু রানা জিজ্ঞেস করল, ‘যে-পিস্তলটা দেখেছি আপনার কাছে, চালাতে পারবেন ওটা?’

‘নিশানা খুব খারাপ আমার, হাত কাঁপে,’ বললেন ড. সিদ্দিকী।

‘ভয় দেখাতে এলোপাতাড়ি গুলি তো ছুঁড়তে পারবেন?’

‘তা পারব।’

‘তা হলে নিয়ে আসুন।’

দৌড়ে কনসোলের দিকে ছুটে গেলেন সিদ্দিকী। এই ফাঁকে হাতলে মোচড় দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রানা। ওপাশে ছোট্ট একটা ইন্টারনাল ব্যালকনি দেখা গেল—ওখানে দাঁড়িয়ে ওয়্যারহাউসের ভিতরের পুরো স্টোরেজ এরিয়াটা চোখে পড়ে। অপরপ্রান্তে, প্রায় একশ’ ফুট দূরে হুবহু আরেকটা ব্যালকনি আর দরজা রয়েছে। ক্যাটওয়াকটা দুই ব্যালকনির মাঝে... একেবারে রেলিং ঘেঁষে। পুরনো, মরচে-ধরা একটা সরু সেতুর মত কাঠামো ওটা, ছাদ থেকে ঝুলছে কালচে হয়ে যাওয়া চিকন শেকলের মাধ্যমে। জিনিসটার অবস্থা দেখে মনে সন্দেহ জাগল রানার—ওদের দুজনের ভার সহিতে পারবে এটা? ভেঙে পড়লে কী ঘটতে পারে বোঝার জন্য সাবধানে নীচে উঁকি দিল ও। দোতলায় আরও দুটো ব্যালকনি আছে, নইলে সোজা প্রায় ষাট ফুট নীচে ওয়্যারহাউসের মেঝে।

অল্প যে-সময়টুকুর জন্য মাথা বের করেছিল, তাতেই নীচতলায় মানুষের নড়াচড়ার আভাস পেল। ঝট করে দরজার আড়ালে আবার চলে এল ও, ভাবল—ব্যাটারা ওকে দেখতে পায়নি তো?

ঘাড় ফিরিয়ে ড. সিদ্দিকীর দিকে তাকাল রানা, পিস্তল হাতে নিয়ে কনসোলের সামনে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি। চাপা স্বরে বলল ও, ‘ডক্টর! দাঁড়িয়ে কেন? জলদি আসুন!’

কথাটা বিজ্ঞানীর কানে গেছে বলে মনে হলো না, মন্ত্রমুগ্ধের মত অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠলেন, ‘ওহ্ গড! করছে কী এরা!’

একছুটে কনসোলের সামনে চলে এল রানা, ড. সিদ্দিকীকে ধরে টান দিতে যাবে, এমন সময় চোখ পড়ল পার্কিং লটের দিকে মুখ করা ক্যামেরার স্ক্রিনটাতে। আঁতকে উঠল রানা দৃশ্যটা দেখে।

প্রবল বৃষ্টিতে অগ্রাহ্য করে মোটাসোটা এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে লটের মাঝখানে, ফোর্ডের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে একটু দূরে। কাঁধে ধরা চার ফুট লম্বা একটা টিউবের মত বস্তু তাক করেছে সে তিনতলার দিকে, আইপিসে চোখ রেখে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঠিক করেছে নিশানা। অস্ত্রটা চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না রানার, ওটা একটা অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার!

‘শিট!’ গাল দিয়ে উঠল ও, ড. সিদ্দিকীর কবজি ধরে টানল ব্যালকনির দরজার দিকে। ‘আমাদের পালাতে হবে, ডক্টর! এঙ্কুনি!’

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দুজনে, ছিটকে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। ‘আমার পিছনে থাকবেন,’ বলে সরু ক্যাটওয়াকে উঠে পড়ল রানা। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল, সিদ্দিকী ঠিকমতই অনুসরণ করছেন ওকে।

অর্ধেকের মত দৈর্ঘ্য পেরিয়েছে ওরা, এমন সময় রকেট এসে আঘাত করল তিনতলার ঘরটাতে, দেয়াল ভেদ করে ঢুকে গেল ভিতরে। চোখের পলকে ঘটল বিস্ফোরণ—কামরার মধ্যে রাখা সমস্ত জিনিসপত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দুনিয়া-কাঁপানো গুমগুম আওয়াজ শুনতে পেল রানা—কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে উঠল ওর। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল শকওয়েভ, পুরো ক্যাটওয়াকটাই দুলে উঠল তাতে।

তাল হারিয়ে টলমল পায়ে দুই কদম এগোল রানা, রেলিং ধরে স্থির হবার চেষ্টা করল... তবে সফল হলো না। ড. সিদ্দিকী পিছনে ছিলেন, তাই শকওয়েভের আসল ধাক্কাটা তাঁর পিঠে লেগেছে। প্রায় উড়ে এসে রানার গায়ের উপর পড়লেন তিনি। অতর্কিত এই সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীর ভারী দেহের

ওজন সামলানো গেল না, দুজনেই একসঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ক্যাটওয়াকের সরু মেঝেতে। লোহার সঙ্গে শক্তভাবে ঠুকে গেল রানার মুখ-কপাল, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় পেণ্ডুলামের মত দুলছে শেকলে ঝোলানো পুরো ক্যাটওয়াক। ডানদিকে অনেকদূর চলে যেতেই আঁতকে উঠল রানা, গড়িয়ে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে ওদের। কোনোমতে ফ্লোরের গ্রেটিং খামচে ধরে নিজেকে বাঁচাল ও, কিন্তু ড. সিদ্দিকী সেটা পারলেন না। পিছলে যাচ্ছেন তিনি, রানার শরীরের উপর থেকে তাঁর ওজন সরে যাচ্ছে। পড়েই যেতেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে খপ করে এক হাতে ওঁর কলার চেপে ধরল রানা—যুঝছে ভারী দেহটাকে আটকে রাখতে।

শরীরের অর্ধেক ক্যাটওয়াকের বাইরে চলে গেছে বিজ্ঞানীর, রানা বুঝল—এক হাতে তাঁকে টেনে তোলা অসম্ভব। তাই ও চেষ্টা করে বলল, ‘উঠে আসুন, ডক্টর! আমি আপনাকে ধরে রাখছি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে কসরত শুরু করে দিলেন সিদ্দিকী, কিন্তু কাজটা সহজ হলো না। একবার এদিক, একবার ওদিক—এভাবে দুলেই চলেছে ক্যাটওয়াকটা, বার বার ব্যালাস নষ্ট করে দিচ্ছে ওদের। মড় মড় জাতীয় আওয়াজ শুনে প্রমাদ গুনল রানা, কাঠামোটা প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। পুরনো, মরচে-পড়া লোহা ওদের দুজনের ওজন, সেই সঙ্গে প্রবল দুলুনি সহিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

‘কুইক!’ তাড়া দিল ও। ‘তাড়াতাড়ি করুন।’

আর একবার আশ্রয় চেষ্টা চালালেন সিদ্দিকী, অবশেষে পুরো শরীর তুলে আনতে পারলেন ক্যাটওয়াকে। উপড় হয়ে অন্তর্ধান-১

আঁকড়ে ধরে রাখলেন দুই কিনার, মুখের রক্ত সরে গেছে।

সামনের ব্যালকনিটা দেখাল রানা। ‘ওখানে যেতে হবে আমাদের।’

মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী। ‘সম্ভব না। আমি তো ব্যালাঙ্গ-ই রাখতে পারছি না। আপনাকে একাই যেতে হবে।’

‘বাজে কথা বলবেন না,’ চোখ রাঙাল রানা। ‘আমাকে ফলো করুন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোবেন। যদি মনে হয় পড়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেটিঙের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেবেন আঙুল। ঠিক আছে?’

‘আ...আমি পারব না,’ ভয়াৰ্ত কণ্ঠে বললেন সিদ্দিকী।

‘পারতে হবে!’ কঠিন গলায় বলল রানা। ‘নইলে দুজনেই মরব। আপনি সেটাই চান?’

‘ন...না!’

‘তা হলে এগোন। এবার আপনি সামনে থাকবেন। আমি পিছন থেকে সাহায্য করব আপনাকে।’

দোদুল্যমান ক্যাটওয়াকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সাবধানে টপকে গেল বিজ্ঞানীর দেহটাকে, তারপর পিছনে গিয়ে হামা দেয়ার ভঙ্গিতে পজিশন নিল।

‘নাউ, মুভ!’

কাঁপতে কাঁপতে উঁচু হলেন ড. সিদ্দিকী, আন্তে আন্তে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। সাহস দেয়ার সুরে রানা বলল, ‘রিল্যাক্স, ভয়ের কিছু নেই। শুধু নীচে তাকাবেন না। সামনে দরজাটা দেখছেন? ওটার দিকে তাকিয়ে এগোতে থাকুন।’

ক্রমাগত দুলুনিতে শরীরের ভিতরকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে বিজ্ঞানীর। বললেন, ‘আমার বমি পাচ্ছে।’

‘ওপাশে গিয়ে করবেন। এখন এগোন!’

রানার চাপাচাপিতে কাজ হলো, হামা দেয়ার ভঙ্গিতে ইঞ্চি ঠাঞ্চি করে এগোতে শুরু করলেন সিদ্দিকী—গতি খুব ধীর। চিন্তিত ভঙ্গিতে পিছনে তাকাল রানা—ধুলো ও ধোঁয়া কেটে গেলেই ডক্টরের কামরাটায় ঢুকবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা দুই পিস্তলধারী, ব্যালকনির দরজাটা দেখে ফেলবে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তারও আগে হার মানবে ক্যাটওয়াকের অবলম্বনগুলো। অনবরত ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে সবক'টা শেকল আর সংযোগস্থল। ওয়ারহাউসের উপরের টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটার অবিরাম আওয়াজে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সমস্ত নড়াচড়ার শব্দ, নইলে এতক্ষণে নীচের সম্ভাব্য খুনিরা দেখে ফেলত ওদের। অস্ত্রধারী লোকদুটো এসে পড়লে সুবিধেটুকু উধাও হয়ে যাবে।

‘কুইক, ডক্টর!’ তাড়া দিল রানা। ‘তাড়াতাড়ি এগোন।’

ভাগ্য যে ওদের খুব একটা সদয় নয়, সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ওয়ারহাউসের গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে ভেসে এল উত্তেজিত একটা চিৎকার।

‘ওই যে উপরে... ওইন্তো ওরা!’

প্রায় একই সময় পিছনে দরজা ভাঙার শব্দ হলো—ড. সিদ্দিকীর রুমে এসে ঢুকেছে পিস্তলধারীরা। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে নীচে তাকাল রানা, তিনজন লোক মেশিনগান তাক করছে ওদের দিকে। ব্যালকনির দরজাতেও উদয় হলো প্রথম দুইজনের মুখ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, হোলস্টার থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে সিগ-সায়ারটা। কী করবে, ঠিক করে ফেলেছে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে—সচেতনভাবে নয়, ইন্সটিঙ্কট-ই বলে দিয়েছে কী করতে হবে। শরীরের উর্ধ্বাংশটা

সামান্য ঘুরিয়ে ব্যালকনির দিকে ফিরল, অস্ত্র-ধরা হাতটা প্রসারিত করে দিয়েছে... গুলি ছুঁড়ল নিমেষে।

প্রথম পিস্তলধারীর কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো, দ্বিতীয়জন কাঁধে নিল আঘাত—আধপাক ঘুরে ভূপাতিত হলো সে।

‘শক্ত করে ধরুন!’ চেষ্টা করে সঙ্গীকে নির্দেশ দিল রানা, তার পর পরই শরীর দোলাতে শুরু করল ডানে-বাঁয়ে—দোদুল্যমান ক্যাটওয়াকের দুলুনি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। দু’হাতে রেলিং ধরে রেখেছে, যাতে নিজে পড়ে না যায়।

‘ইয়াল্লা! করছেন কী?’ চেষ্টা করে উঠলেন ড. সিদ্দিকী—বুক মিশিয়ে শুয়ে আঁকড়ে ধরলেন ক্যাটওয়াকের দুই কিনারা।

জবাবটা অবশ্য পরমুহূর্তেই শোনার গেলেন তিনি। ক্যাটওয়াক লক্ষ্য করে ছুটে এল নীচের মেশিনগানধারীদের ছোঁড়া একঝাঁক বুলেট—তবে সেই মুহূর্তে দুলুনির ফলে সরে গেছে কাঠামোটা আগের অবস্থান থেকে, মাত্র ছ’ইঞ্চি দূর দিয়ে বাতাস কেটে চলে গেল বুলেটগুলো, ছাদে গিয়ে লাগল। আবার গুলি করল নীচের লোকেরা, এবারও একই ফলাফল, ব্যর্থ হলো গুলিগুলো। দুলুনি বাড়াবার কারণটা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী।

রানা অবশ্য শুধু দোলনা চড়ছে না, মনে মনে শক্ত একটা হিসেবও করছে—দোদুল্যমান প্ল্যাটফর্ম থেকে স্থির তিনটে টার্গেটকে ঘায়েল করবার হিসেব! স্লাইপিং এবং শীর্ষশৃঙ্গি উঁচু মানের ট্রেনিং রয়েছে ওর, দুনিয়ার সেরা গুটারদের একজন বলে অনেকেই মানে ওকে, এ-ধরনের শট নেয়া কেবল ওর পক্ষেই সম্ভব।

বাঁ হাতে ক্যাটওয়াকের রেলিং শক্ত করে ধরে পিস্তল ধরা

ডান হাত নীচের দিকে তাক করল রানা। রিলোড করবার সুযোগ পাবে না, তাই সিগ-সাওয়ারের অবশিষ্ট সাতটা বুলেট দিয়েই লক্ষ্যভেদ করতে হবে ওকে। দোল খেয়ে ক্যাটওয়াকটা সুবিধাজনক পজিশনে এসে পৌঁছুতেই দম বন্ধ করে ফেলল ও, তারপর টিপতে শুরু করল ট্রিগার—মাটিতে একটা কাল্পনিক সরল রেখা ধরে ছুঁড়েছে গুলি।

ফলাফলটা দেখার মত হলো। প্রথম দুটো গুলি মেঝেতে বিঁধলেও তৃতীয়টা সোজা একজন মেশিনগানধারীর চাঁদিতে ঢুকল। চতুর্থটাও ব্যর্থ হলো না, পাশেরজনের মুখের একটা পাশ উড়িয়ে দিল ওটা। শেষ তিনটে গুলি আবার মাথা কুটল মেঝেতে। ততক্ষণে কাজের কাজ হয়ে গেছে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে দুটো প্রাণহীন দেহ, আর দুই সঙ্গীকে পটল তুলতে দেখে তৃতীয়জন বাঁপ দিয়েছে মাটিতে—হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাচ্ছে নিরাপদ কাভারের খোঁজে।

কিন্তু এই সাফল্যের মূল্য চরমভাবে গুনতে হলো রানাকে। শেকল ছেঁড়ার বিচ্ছিরি শব্দ শুনে চমকে উঠল ও, মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল—দোলাদুলিতে হার মেনেছে ক্যাটওয়াকের অবলম্বন... সামনের দিকের পর পর তিনটে শেকল ভেঙে গেছে! চোখের পলকে পুরো জিনিসটাই সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। পিছনে আবার শব্দ হলো... বাকি শেকলগুলোও ভেঙে যাচ্ছে।

‘হাত ছেড়ে দিন!’ চেষ্টা করল রানা। ‘হাত ছেড়ে দিন, ডক্টর!’
‘হোয়াট!’

জবাব দেয়ার জন্য সময় নষ্ট করল না রানা, সজোরে লাথি হাঁকল বিজ্ঞানীর পশ্চাতদেশে। ব্যথায় চোঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্দিকী, নিজের অজান্তেই ছেড়ে দিলেন ক্যাটওয়াকের

কিনারা—দেহটা পিছলে চলে যাচ্ছে সামনে, বাচ্চাদের স্নিপারের মত ।

ক্যাটওয়াকে শেকল-ছেঁড়া প্রান্তটা নিচু হয়ে দোতলার ব্যালকনির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল, পিছলানো শেষে রেলিঙের উপর দিয়ে সোজা ওখানে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী । রানাও এটাই চাইছিল । ভদ্রলোককে নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে দেখে এবার ক্যাটওয়াকের রেলিং ছেড়ে দিল ও, ছুটল নিচু দিকটায় ।

দূরত্বটুকু পেরোতে পারল না, তার আগেই বাকি শেকলগুলো বিকট শব্দ করে ছিঁড়ে পড়ল । রানা অনুভব করল, গোটা জিনিসটার সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে ও । শেষ চেষ্টা হিসেবে ক্যাটওয়াকের সারফেসে পা ঠেকিয়ে লাফ দিল, লং-জাম্পের ভঙ্গিতে ব্যালকনিতে পৌঁছুতে চাইছে । নীচ থেকে সরে গেল যেন লোহার কাঠামোটা... আসলে বিপুল গতিতে পড়ে যাচ্ছে ।

রানা তখন শূন্যে... আচমকা বুঝতে পারল, লাফটা জুতসই হয়নি; ব্যালকনিতে পৌঁছুতে পারবে না ও । পড়েই যাচ্ছিল, চোখের সামনে এমন সময় দেখতে পেল রেলিং । প্রাণপণে হাত ছুঁড়ল রানা, তালুতে ধাতব স্পর্শ পেয়েই থপ্ করে আঁকড়ে ধরল ।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল রানার দেহ, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল ও—হাতদুটো যেন খুলে আসবে শোল্ডার জয়েন্ট থেকে । দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা হজম করল ও, অসহায়ভাবে ঝুলছে এখন দোতলার ব্যালকনির রেলিং ধরে । বুঝতে পারছে, একার পক্ষে নিজেকে টেনে তোলা সম্ভব নয় । ঘর্মান্ত মুঠি পিছলে যাচ্ছিল আরেকটু হলে, হঠাৎ ওকে ধরে ফেললেন ড. সিদ্দিকী—নিজেকে সামলে নিয়েছেন ভদ্রলোক, এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে ।

বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উঠে এল রানা ব্যালকনিতে। সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি ঠিক থাকেন?’

‘প্রশ্নটা তো আমারই করার কথা,’ বিরক্ত গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘আপনি করছেন কেন?’

হেসে ফেলল রানা ওঁর বলার ভঙ্গি শুনে। ‘আমাকে নিয়ে ভাববেন না, এ-সব আমার নিত্যদিনের কাজের মধ্যেই পড়ে।’

‘তা তো বুঝতেই পারছি। যা খেলা দেখালেন?’

‘এটুকুতে কিছুই হবে না। মাত্র চারজনকে ঘায়েল করেছি, ওদের আরও লোক রয়ে গেছে নীচে।’

‘কী করবেন, ঠিক করেছেন?’

‘আগে নীচে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!’

এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ঘোরাল রানা। খুলল না ওটা। ঠালা মারা হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিনের অব্যবহারে জং ধরে আটকে গেছে—বলা মুশকিল। তা নিয়ে অবশ্য মাথাও ঘামাল না ও, পিস্তল রিলোড করে এক গুলিতে উড়িয়ে দিল নবটা। তারপর লাথি দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

‘আপনার কোন্টটা আছে?’ ঢোকান আগে বলল রানা। ‘থাকলে হাতে নিন।’

‘সরি,’ বিব্রত কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী। ‘বিস্ফোরণের ধাক্কায় যখন পড়ে গেলাম, তখন হাত থেকে ছুটে নীচে পড়ে গেছে।’

হতাশায় মাথা দোলাল রানা, আরেকটা ফায়ার-আর্মস থাকলে সুবিধে হতো। তবে এখন আর হা-পিত্যেশ করে লাভ নেই। সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘যা-ইবার হয়েছে। চলুন এখন। আমার ঠিক পিছনে থাকবেন।’

দরজার ওপাশের ঘরটা আবর্জনায় ভর্তি, বোটকা একটা অন্তর্ধান-১

কিনারা—দেহটা পিছলে চলে যাচ্ছে সামনে, বাচ্চাদের স্লিপারের মত ।

ক্যাটওয়াকে শেকল-ছেঁড়া প্রান্তটা নিচু হয়ে দোতলার ব্যালকনির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল, পিছলানো শেষে রেলিঙের উপর দিয়ে সোজা ওখানে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী । রানাও এটাই চাইছিল । ভদ্রলোককে নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে দেখে এবার ক্যাটওয়াকের রেলিং ছেড়ে দিল ও, ছুটল নিচু দিকটায় ।

দূরত্বটুকু পেরোতে পারল না, তার আগেই বাকি শেকলগুলো বিকট শব্দ করে ছিঁড়ে পড়ল । রানা অনুভব করল, গোটা জিনিসটার সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে ও । শেষ চেষ্টা হিসেবে ক্যাটওয়াকের সারফেসে পা ঠেকিয়ে লাফ দিল, লং-জাম্পের ভঙ্গিতে ব্যালকনিতে পৌঁছুতে চাইছে । নীচ থেকে সরে গেল যেন লোহার কাঠামোটা... আসলে বিপুল গতিতে পড়ে যাচ্ছে ।

রানা তখন শূন্যে... আচমকা বুঝতে পারল, লাফটা জুতসই হয়নি; ব্যালকনিতে পৌঁছুতে পারবে না ও । পড়েই যাচ্ছিল, চোখের সামনে এমন সময় দেখতে পেল রেলিং । প্রাণপণে হাত ছুঁড়ল রানা, তালুতে ধাতব স্পর্শ পেয়েই থপ করে আঁকড়ে ধরল ।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল রানার দেহ, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল ও—হাতদুটো যেন খুলে আসবে শোল্ডার জয়েন্ট থেকে । দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা হজম করল ও, অসহায়ভাবে ঝুলছে এখন দোতলার ব্যালকনির রেলিং ধরে । বুঝতে পারছে, একার পক্ষে নিজেকে টেনে তোলা সম্ভব নয় । ঘর্মান্ত মুঠি পিছলে যাচ্ছিল আরেকটু হলে, হঠাৎ ওকে ধরে ফেললেন ড. সিদ্দিকী—নিজেকে সামলে নিয়েছেন ভদ্রলোক, এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে ।

বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উঠে এল রানা ব্যালকনিতে। সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি ঠিক থাকেন?’

‘প্রশ্নটা তো আমারই করার কথা,’ বিরক্ত গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘আপনি করছেন কেন?’

হেসে ফেলল রানা ওঁর বলার ভঙ্গি শুনে। ‘আমাকে নিয়ে থাকবেন না, এ-সব আমার নিত্যদিনের কাজের মধ্যেই পড়ে।’

‘তা তো বুঝতেই পারছি। যা খেলা দেখালেন!’

‘এটুকুতে কিছুই হবে না। মাত্র চারজনকে ঘায়েল করেছি, ওদের আরও লোক রয়ে গেছে নীচে।’

‘কী করবেন, ঠিক করেছেন?’

‘আগে নীচে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!’

এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ঘোরাল রানা। খুলল না ওটা। ঠালা মারা হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিনের অব্যবহারে জং ধরে আটকে গেছে—বলা মুশকিল। তা নিয়ে অবশ্য মাথাও ঘামাল না ও, পিস্তল রিলোড করে এক গুলিতে উড়িয়ে দিল নবটা। তারপর লাথি দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

‘আপনার কোন্টটা আছে?’ ঢোকান আগে বলল রানা। ‘থাকলে হাতে নিন।’

‘সরি,’ বিব্রত কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী। ‘বিস্ফোরণের ধাক্কায় যখন পড়ে গেলাম, তখন হাত থেকে ছুটে নীচে পড়ে গেছে।’

হতাশায় মাথা দোলাল রানা, আরেকটা ফায়ার-আর্মস থাকলে সুবিধে হতো। তবে এখন আর হা-পিত্যেশ করে লাভ নেই। সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘যা-ইবার হয়েছে। চলুন এখন। আমার ঠিক পিছনে থাকবেন।’

দরজার ওপাশের ঘরটা আবর্জনায় ভর্তি, বোটকা একটা অন্তর্ধান-১

গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। এখানে আলোও নেই, চাপা অন্ধকার বিরাজ করছে। যতটুকু সম্ভব দম আটকে রাখল ওরা দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচতে, এগোল ধীরে ধীরে, সাবধানে পা ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়লা-জঞ্জাল মাড়িয়ে স্টেয়ারকেসে বেরিয়ে এল। এখানটায় আঁধার আরও গাঢ়। ড. সিদ্দিকীকে ওর হাত ধরে থাকতে বলল রানা, সতর্ক পায়ে নামতে শুরু করল নীচে। ওখানে শত্রুরা যে ওত পেতে বসে থাকবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু আর কোথাও যাবার উপায়ও নেই ওদের। আচমকা হামলা চালিয়ে ব্যাটারদের ক্ষয়ক্ষতি করা যায় কি না, সেটাই চেষ্টা করে দেখতে হবে। তা হলে হয়তো পালাবার একটা রাস্তা বেরিয়েও যেতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাউণ্ড ফ্লোরে পা রাখল দুজনে। ল্যান্ডিংয়ের অপর পাশের দরজাটা দেখে দমে গেল রানা। হাইডআউটের দিকটায় সরাসরি বাইরে যাবার দরজা ছিল, কিন্তু এখানকারটা গেছে উল্টোদিকে... ওয়্যারহাউসের ভিতরে। ঠোঁট কামড়ে করণীয় নিয়ে ভাবল ও—কিন্তু ওখান দিয়েই বেরুনো ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প দেখতে পেল না। বসে থাকলে বরং কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

‘এখানেই থাকুন,’ ড. সিদ্দিকীকে বলল ও। ‘আমি না ডাকলে নড়বেন না।’

‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

দরজাটা দেখাল রানা। ‘দেখি, ওপাশটা ক্রিয়ার করতে পারি কি না।’

বিজ্ঞানীকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও, নব মুচড়ে এক ঝটকায় দরজা খুলল, তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ফ্লোরে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, একটা ডিগবাজি খেয়ে সিঁধে হলো এক হাঁটুতে ভর দিয়ে। সিগ-সাওয়ারটা ক্লাসিক পজিশনে প্রসারিত করে ধরেছে সামনে। মুখোমুখি পনেরো-বিশজন মানুষকে দেখতে পেল, জটলা পাকিয়ে রয়েছে—সবার পরনে উদ্ভাস্তদের মত পোশাক। চেহারাও ময়লা মাখা। গুলি ছুঁড়েই ফেলছিল রানা, নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে থমকে গেল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে প্রতিপক্ষকে চিনে নিল ও—এরা শত্রুদলের নয়, সত্যিকার উদ্ভাস্ত। কিন্তু এভাবে সিঁড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? জবাবটা পেতে এক মুহূর্তও লাগল না। মানুষগুলোর চোখেমুখে ভয় ফুটে থাকতে দেখল রানা, দাঁড়িয়েছেও সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে। এর মানে একটাই হতে পারে—এদেরকে কাভার হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, আসল শত্রু রয়েছে আড়ালে।

পরমুহূর্তেই জটলার মধ্যে একজনকে নড়ে উঠতে দেখা গেল, ওকে থমকে যেতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লোকটা। ভোজবাজির মত তার হাতে একটা মেশিনগান উদয় হতে দেখল রানা, তাক করছে ওরই দিকে!

ফায়ারিং পজিশনে একটুও পরিবর্তন আনল না রানা, শুধু শরীরের উর্ধ্বাংশ ঘোরাল একটু—একই সঙ্গে অস্ত্র-ধরা হাতটাও। নিমেষে গুলি করল ও। আতঙ্কিত এক উদ্ভাস্তর কান ঘেঁষে গেল বুলেটটা, অস্ত্রধারী লোকটার কপালে নিখুঁতভাবে একটা তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল... সে তখনও নিশানাই স্থির করতে পারেনি।

উল্টে পড়ে গেল লোকটা। উদ্ভাস্তদের মধ্যে চোঁচামেচির রোল শুরু হলো। রানা চিৎকার করল, ‘শাট আপ! কেউ নড়বে না!’

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো ধমকটাতে, মুহূর্তেই নীরবতা নেমে এল দঙ্গলটার ভিতরে। সতর্কভাবে পিস্তলটা ওদের সবার ওপর ঘুরিয়ে আনল রানা। জিজ্ঞেস করল, ‘আর কে আছে?’

‘কেউ না,’ ভয়ে ভয়ে জবাব দিল সামনে দাঁড়ানো মাঝবয়েসী একজন পুরুষ। ‘তিনজন ছিল ওরা।’ গুলি-খাওয়া লোকটাকে দেখাল। ‘দুজন আগেই মরেছে।’

হুম, এ তা হলে তৃতীয় মেশিনগানধারী, ভাবল রানা। সঙ্গীদের গুলি খেতে দেখে এই লোকটাই হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়েছিল। তারপর এই গরীব-অসহায় লোকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে এসেছে সিঁড়ির দরজায়, ওকে বিভ্রান্ত করে দেবার জন্য। ভুল বুঝে রানা নিরীহ লোকগুলোর উপর হামলা চালাত, আর ওই ফাঁকে অনায়াসে শিকার করত খুনিটা ওকে। বিসিআই-এর কঠোর ট্রেইনিং-কে মনে মনে ধন্যবাদ দিল রানা, রিস্কো নইলে এত তীক্ষ্ণ হতো না ওর, শত্রু ভেবে নিরীহ কয়েকজনকে খুন করে ফেলত।

‘প্লিজ, আমাদের ছেড়ে দিন,’ অনুনয় করল মাঝবয়েসী উদ্ভাস্ত। ‘আমরা কিছু করিনি। এই বদমাশেরা ঘণ্টাখানেক আগে এসে হঠাৎ আটক করেছে আমাদের। কেন, তা জানি না।’

‘কতজন এসেছে?’ জানতে চাইল রানা। ‘তিনজন এখানে, বাকিরা কোথায়?’

‘তেরোজনকে দেখেছি আমরা, নীচে তিনজনকে রেখে বাকি সবাই গেছে উপরে।’

ডানদিকে একটা একজিট ডোর চোখে পড়ল রানার। ওটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল, ‘ওপাশটা ওয়্যারহাউসের কোন্ দিক?’

‘পিছনদিক। নদীটা ওপাশেই।’

খুব একটা আশার আলো দেখল না রানা। ওটা যে-দিকই হোক, বেরুলেই বাকি খুনিদের নাগালে পড়ে যাবে ওরা। ব্যাটারা ওপরতলায় আছে, ওখান থেকে অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত কাভার দিতে পারবে। এখানেও অপেক্ষা করা চলে না। নীচের টিমটাকে খতম করেছে বটে, তবে খুব শীঘ্রি মূল দলটা ফিরে আসবে, বিশেষ করে যখন দেখবে ড. সিদ্দিকী ক্যাটওয়াক ধরে পালিয়ে গেছেন। পাঁচজন মারা পড়লেও আরও আটজন রয়ে গেছে, ওর একার পক্ষে এতজন ট্রেনিং প্রফেশনালকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

কীভাবে ওদের ফাঁকি দেয়া যায়? ঝড়ের বেগে মগজ খাটাল রানা, হঠাৎ পেয়ে গেল বুদ্ধি।

‘নোড়ো না কেউ,’ বলে বিজ্ঞানীকে ডাকল ও। ‘ড. সিদ্দিকী! বেরিয়ে আসুন!’

চৌকাঠের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি দেখে নিলেন সিদ্দিকী, তারপর এক ছুটে চলে এলেন রানার কাছে।

‘তোমাদের একটু সাহায্য চাই আমি,’ উদ্বাস্তদের দিকে ফিরে বলল রানা। ‘বিনিময়ে চমৎকার কিছু উপহার পাবে। যদি কথামত কাজ করো, তা হলে আগামীকালই একটা ট্রাক পাঠাব আমি—খাবার, আর গরম কাপড় থাকবে তাতে। কী, করবে সাহায্য?’

বোকার মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল উদ্বাস্তরা। মাঝবয়েসী লোকটা জিজ্ঞেস করল, ‘কী করতে হবে?’

‘প্রথমে আমাদেরকে তোমাদের দুটো ময়লা ওভারকোট ধার দেবে,’ বলল রানা, একজিট ডোরটা ইস্তিত করল। ‘তারপর ওই দরজা ধরে বেরিয়ে পড়বে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছুটতে শুরু করবে যে যেরদিকে পারো। ঠিক আছে?’

ওর মতলবটা বুঝতে পারলেন ড. সিদ্ধিকী—উদ্বাস্তদের সঙ্গে মিশে কেটে পড়তে চাইছে! এতগুলো মানুষ ছোট্ট ছোট্ট শুরু করলে তার মধ্য থেকে ওঁদের দুজনকে চিনতে পারা সত্যিই কঠিন হবে। প্রশংসার সুরে বললেন, ‘স্মার্ট প্ল্যান, মি. রানা!’

‘দোয়া করুন, যাতে কাজে লাগে কৌশলটা,’ বলল রানা, তাকাল উদ্বাস্তদের দিকে। ‘কী, দেবে না ওভারকোট?’

নড়ে উঠল দুজন, শরীর থেকে খুলে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে ধরল দুটো ছেঁড়া-ফাটা পরিধেয়। ধন্যবাদ জানিয়ে সেগুলো নিল রানা আর ড. সিদ্ধিকী। গায়ে চড়িয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, এবার দৌড়াও সবাই।’

কথাটার অর্থ যেন অনুধাবন করতে পারেনি উদ্বাস্তরা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

‘দৌড়াও!’ আবার বলল রানা।

একে অপরের মুখ দেখছে এবার সবাই। বোধহয় কে আগে দৌড় শুরু করবে, সেটাই ভাবছে। অবস্থাটা লক্ষ করে পিস্তলটা মাথার উপর খাড়া করে ধরল রানা, ফাঁকা দুটো গুলি চালাল ধাঁই ধাঁই করে।

এতক্ষণে সচকিত হয়ে উঠল মানুষগুলো, উল্টো ঘুরে সবাই পড়িমরি করে ছুটল একজিট ডোরের দিকে। একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার আগে যাবে।

‘আসুন,’ বিজ্ঞানীকে বলল রানা, তারপর মিশে গেল ধাবমান উদ্বাস্তদের ভিড়ে।



সাত

একজিট ডোর খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল ভিড়টা। বাইশজন মানুষ... পাগলের মত চারদিকে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়াল রানা, ড. সিদ্দিকীকেও বাধ্য করল। পিছিয়ে পড়লে চলবে না, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে থাকতে না পারলে ওদের দু'জনকে চেনা যাবে। ওপরতলার অ্যাসল্ট টিমের সহজ শিকারে পরিণত হবে তা হলে।

ভারী বর্ষণের কারণে পুরো শরীর ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, কাপড়-চোপড় ভেদ করে দেহের আনাচে-কানাচে ঢুকে যাচ্ছে পানি—খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। তবু গতি কমাল না রানা। ময়লা-আবর্জনায় ভরা একটা খোলা ডাম্পিং এরিয়া পেরোচ্ছে ওরা, আশপাশে একটুও আড়াল নেই। যত দ্রুত সম্ভব, সরে যেতে হবে এখান থেকে—শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে। কংক্রিটের উপর জমে থাকা পানিতে ছপ্ ছপ্ করে পা ফেলে ছুটে চলল ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে একটা চেইন-লিঙ্ক ফেন্স পড়ল, মাঝে একটা ফোকর রয়েছে, ওপাশে... পঞ্চাশ গজ দূরে আরেকটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং—একটা কারখানা। একজন

ঊদ্বাস্তকে ফোকর গলে পালাতে দেখা গেল। খুশি হয়ে উঠল রানা, আড়াল পাওয়া গেছে—কারখানা পর্যন্ত যেতে পারলেই একটা কাভার পেয়ে যাবে।

বেড়ার কাছে গিয়ে ড. সিদ্দিকীকে ফোকরের দিকে ঠেলে দিল ও, মাথাটা চেপে নামিয়ে রাখল, যাতে ভদ্রলোক ফোকরের উপরের অংশের সঙ্গে ঘষা না খান। শূন্যস্থানটা একেবারে ছোট নয়, স্বাভাবিক আকৃতির একজন মানুষ অনায়াসে পার হতে পারে। কিন্তু স্থূলদেহী ড. সিদ্দিকী আটকে গেলেন। পিছন থেকে তাঁকে ঠেলে ঠেলে প্রমাদ গুনল রানা। শত্রুপক্ষ এই দৃশ্য দেখলেই চিনে ফেলবে ওদের।

আশঙ্কাটাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন গর্জে উঠল একটা অটোমেটিক রাইফেল। বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ গুনল রানা, একই সঙ্গে পিছনে ভাঙা কংক্রিট উড়ল।

‘আল্লাহর দোহাই! তাড়াতাড়ি করুন, ডক্টর!’

দ্বিতীয়বার গুলি হলো... এটাও ব্যর্থ হয়েছে। তুমুল বৃষ্টির কারণে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না শুটার, তা ছাড়া বুলেটের গতিপথেও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে দিচ্ছে পানির ধারা। তবে এভাবে বেশিক্ষণ চলবে না; যত প্রতিকূলতাই আসুক, দক্ষ একজন শুটার সেগুলোর কারেকশন দিতে বেশি সময় নেয় না।

ড. সিদ্দিকীর দিকে তাকাল রানা—গোঁজের মত ফোকরে আটকে রয়েছেন যেন তিনি, এগোচ্ছেন শমুক গতিতে। আর অপেক্ষা করা যায় না, পিছন থেকে নির্দয়ভাবে তাকে ধাক্কা দিল ও।

‘মি. রানা! আমি ব্যথা পাচ্ছি!’

কথাটা কানেই তুলল না রানা, ঠেলে চলল প্রবল শক্তিতে।

ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হলো, তবে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই ওপাশের কংক্রিটে মুখ থুবড়ে পড়লেন বিজ্ঞানী—ওভারকোটের পিছনদিকটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

তৃতীয়বার গুলি হতেই বিদ্যুৎবেগে নড়ল রানা, নিচু হয়ে প্রায় ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে পার হলো বেড়ার ফোকরটা, এসে পড়ল এপাশে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও, ড. সিদ্দিকীর হাত ধরে টানতে শুরু করল—বন্ধ কারখানার দিকে দৌড়াচ্ছে। পিছনে আরও কয়েকবার গুলি হলো, তবে এখন আর লক্ষ্যভেদের প্রশ্নই ওঠে না—দূরত্ব বেড়ে গেছে, তা ছাড়া ওরা এখন মুভিং টার্গেট।

একটু পরেই কারখানার একটা কোণ অতিক্রম করল ওরা, শত্রুপক্ষের দৃষ্টিসীমার আড়ালে পৌঁছে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনেই—হাঁপাচ্ছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ড. সিদ্দিকী তার ভিতরই খুশি খুশি গলায় বললেন, ‘বেঁচে গেছি... বেঁচে গেছি আমরা!’

‘এখনও না,’ বলল রানা, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। ‘চলার উপর থাকতে হবে আমাদের। ওরা ধাওয়া করবার আগেই যতটুকু সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। আসুন।’

‘ক্... কিন্তু একটু বিশ্রাম ছাড়া যে চলছে না আমার!’

‘কোনও বিশ্রাম নয়!’ কড়া গলায় বলল রানা। ‘ধরা পড়তে চান নাকি? চলে আসুন!’

হিড়হিড় করে বিজ্ঞানীকে টেনে নিয়ে চলল ও, অনুরোধ-উপরোধ কানেই তুলল না। দৌড়াচ্ছে ছোট ছোট কদমে, সঙ্গীকে বাধ্য করছে তাল মেলাতে। কারখানার সীমানা পেরিয়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই, সামনে ছোটবড় আরও অন্তর্ধান-১

পরিত্যক্ত বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে সেগুলোর মাঝখানকার গলিগুলো বেছে নিল রানা, দ্রুত সরে যাচ্ছে আক্রান্ত ওয়্যারহাউস থেকে দূরে।

বৃষ্টিতে কাকভেজা হতে হতে চিন্তায় ডুবে গেল ও। এলাকাটা থেকে ড. সিদ্দিকীকে নিয়ে বেরুনো সহজ হবে না—গাড়ি না থাকাতেই সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যত চেষ্টাই করুক, পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে তেমন একটা দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। হামলাকারীরা জানে সেটা, সে-কারণেই শুরুতে রানার গাড়িটা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন ওরা ছুটছে বটে, কিন্তু এগোতে পারছে না খুব বেশি—রানার টানাটানিতে শুধু সচল রয়েছেন ড. সিদ্দিকী, এগোনোর গতি খুব কম। শারীরিক পরিশ্রম কী জিনিস তা জানা নেই ভদ্রলোকের, দেহের আকার-আয়তন সে-কথাই বলে। তাঁকে খুব বেশি খাটানোর সাহস পাচ্ছে না রানা, যদি অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যান... বিরাট বিপদ হবে। এখনও যে অ্যাজমার টান উঠে যায়নি, তা-ই ঢের।

ব্যাপারটা শত্রুপক্ষও আঁচ করতে পারবে, খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না তাদের, ছোট্ট একটা এলাকা চিরুণী-তল্লাশি করেই ধরে ফেলতে পারবে ওদের। কিছুটা সময় কোথাও গা-ঢাকা দিতে পারলে কাজ হতো, সেলফোনে যোগাযোগ করে রানা এজেন্সি থেকে রি-এনফোর্সমেন্ট নিয়ে আসা যেত। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, তা হবার নয়। রি-এনফোর্সমেন্ট আসবার আগেই ওদের খুঁজে বের করে ফেলবে শত্রুরা।

গাড়ি দরকার! রানার মাথার ভিতরে এই একটা চিন্তাই চিৎকার করে উঠছে থেকে থেকে। তা হলেই পরিস্থিতি অনেকটা ওদের অনুকূলে চলে আসত। কিন্তু কোথায় পাবে

গাড়ি? পুরো এলাকাটা পরিত্যক্ত, আসবার পথে কোথাও কোনও মোটরযান চোখে পড়েনি ওর। তবে হ্যাঁ, শত্রুরা নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে এসেছে... ওগুলোর একটা হয়তো দখল করা যেতে পারত। কিন্তু গাড়িগুলো যে কোথায় লুকিয়েছে ওরা, কে জানে। খোঁজাখুঁজি করতে গেলে নিজেরাই বরং চোখে পড়ে যাবে। তা ছাড়া গাড়ির সঙ্গে নিশ্চয়ই এক-দু'জন লোক থাকবে, দুর্বল হয়ে পড়া বিজ্ঞানীকে নিয়ে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হবে না।

আইডিয়াটা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা। হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেছে—আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না। ড. সিদ্ধিকীও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছেন, পা ফেলছেন এলোমেলোভাবে, যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। ঘাড়ের উপর ভদ্রলোককে একটা হাত রাখতে দিল রানা, তাঁর ওজনের খানিকটা নিজের কাঁধে নিল, হাঁটতে সাহায্য করছে। বৃষ্টির তেজ বেড়েছে, কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ বিকেলটাকে ঢেকে দিয়েছে ছায়া আর অন্ধকারে। এই বৃষ্টি আর আলো-ছায়া পরিবেশটাই একমাত্র ভরসা—খুব কাছে না এলে ওদের ঠিকমত দেখতে পাবে না কেউ।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে ভেসে আসা হর্নের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল রানা—একটা বার্জ যাচ্ছে। তাই তো! কথাটা আগে মনে পড়েনি কেন? রওনা দেবার আগে এখানকার ম্যাপ স্টাডি করে এসেছে ও—ছোট্ট একটা জেটি থাকবার কথা নদীর পারে... মনে মনে হিসেব করল রানা... ওদের বর্তমান অবস্থান থেকে মোটামুটি একশো গজ দূরে। শিল্প-এলাকার সমস্ত মিল-কারখানা আর ওয়্যারহাউস পরিত্যক্ত হলেও জেটিটা এখনও ব্যবহার হয়। বোট পাওয়া যেতে পারে ওখানে!

নতুন উদ্যম ভর করল রানার উপর, দিক পাল্টে ড. সিদ্ধিকীকে নিয়ে জেটির উদ্দেশে রওনা হলো ও। পনেরো মিনিট পরেই পৌছে গেল গন্তব্যে।

বিজ্ঞানীকে মাটিতে বসিয়ে ভাঙা একটা বিল্ডিংয়ের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। জেটিটা আসলেই ছোট, কোনোমতে একটা ট্রলার হয়তো ভিড়ানো যায়। এ-মুহূর্তে ওটা খালি... না, বলা উচিত—খালি হলো। ওদিকে তাকিয়ে নিজেকে বেকুবের মত লাগল রানার—পরিষ্কার দেখল, একটা মাছ ধরা বোট পিয়ার ছেড়ে চলে যাচ্ছে মাঝনদীতে, আর কোনও জলযান নেই আশপাশে। এইমাত্র ছেড়েছে বোটটা, আর কয়েকটা মিনিট আগে পৌছুলে ওটাতেই চড়তে পারত ওরা—ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর কাকে বলে!

কপালকে শাপশাপান্ত করতে গিয়ে আচমকা থমকে গেল রানা, চোখ রগড়ে তাকাল ভাল করে। একটা গাড়ি! জেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে! রং-চটা, এখানে-ওখানে মরচে-পড়া, প্রাচীন মডেলের একটা সেডান—অন্তত বিশ বছরের পুরনো। তা-ও গাড়ি তো! ওটার আরোহী সম্ভবত কোনও কাজে এসেছিল ফিশিং বোটটাতে, এখন ফিরে যাচ্ছে। নাহ, ভাগ্যদেবী এখনও মুখ ফিরিয়ে নেননি তা হলে।

ড. সিদ্ধিকীকে টান দিয়ে দাঁড় করাল রানা, অনুসরণ করতে বলে এক ছুটে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে, সেডানটার পথরোধ করে দাঁড়াল। ড্রাইভার লোকটা বয়স্ক, মুখে চাপদাড়ি। বিরক্ত গলায় বলল, ‘ব্যাপার কী?’

লিফট চাইল না রানা, শুধু শুধু নিরীহ একজন মানুষকে বিপদের মাঝখানে টেনে আনার মানে হয় না। তাই বলল, ‘দিস ইয অ্যান ইমার্জেন্সি। আপনার গাড়িটা আমাদের

পয়োজন।’

‘কী বলছেন যা-তা!’ আপাদমস্তক দেখল লোকটা ছেঁড়া-
পাটা কোট পরা রানাকে।

পিস্তল বের করে ড্রাইভারের দিকে তাক করল রানা,
লোকটাকে বোঝানোর সময় নেই। ‘প্লিজ, চাবিটা ইগনিশনে
রেখে বেরিয়ে আসুন।’

আতঙ্ক ফুটল বয়স্ক মানুষটার চোখে। দ্রুত ভঙ্গিতে নামল
গাড়ি থেকে।

‘ডক্টর, উঠে পড়ুন।’ বলে রানা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল।
স্টার্ট দিয়ে তাকাল ড্রাইভারের দিকে। ‘এটা আপনার গাড়ি?’

‘কী?’

‘গাড়িটার মালিক কি আপনি? রেজিস্ট্রেশন ট্র্যাক করে
পাওয়া যাবে আপনাকে?’

‘অ্যা... হ্যাঁ।’

‘গুড, তা হলে গাড়ির দাম আর সঙ্গে কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়ে
যাবেন আগামীকালকের মধ্যে।’

‘কিন্তু আমি এখান থেকে ফিরব কী করে?’ জানতে চাইল
বয়স্ক লোকটা।

‘হাঁটা শুরু করে দিন, একটা না একটা কিছু নিশ্চয়ই পেয়ে
যাবেন।’

ড. সিদ্দিকী উঠে পড়েছেন, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করল রানা,
গিয়ার দিয়ে সবেগে আগে বাড়াল সেডানটাকে। গাড়ির
কিংকর্তব্যবিমূঢ় মালিক পড়ে রইল পিছনে।

নদীর ধার থেকে মুখ ঘুরিয়ে একটা ফাঁকা কম্পাউণ্ডের
ভিতর দিয়ে সেডানটাকে ছোটাল রানা—শটকাটে মূল রাস্তায়
পৌঁছুতে চাইছে। গাড়িটার বাহ্যিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন,

ইঞ্জিনের অবস্থা চমৎকার, যত্নে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি মালিক—শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। মনে মনে আশাবাদী হয়ে উঠল রানা, সত্যিই হয়তো আর কোনও সংঘাত ছাড়া চলে যেতে পারবে ওরা।

কিন্তু সেই কপাল নিয়ে জন্মায়নি মাসুদ রানা! কম্পাউণ্ডের শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই হঠাৎ দু'জন অস্ত্রধারীকে দেখতে পেল ও—সীমানার ভিতরের একটা খালি বিল্ডিং চেক করে বেরিয়ে এসেছে। ধাবমান গাড়িটাকে দেখেই সন্দেহ ঘনাল তাদের চোখে, গুলি করার ভঙ্গিতে তুলতে শুরু করল অস্ত্রদুটো।

‘মাথা নামান!’ সঙ্গীর উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে উঠল রানা, এক হাতে পিস্তলটা বের করে ফেলেছে হোলস্টার থেকে।

গুলি করল অস্ত্রধারীরা, সজোরে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে এল রানা। ড. সিদ্দিকী প্রায় শুয়ে পড়েছেন, তাঁর শরীরের উপর দিয়ে হাত প্রসারিত করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল ও—ম্যাগাজিন খালি করে ফেলছে প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালা দিয়ে।

আত্মরক্ষার সুযোগ পেল না দুই খুনি, যান্ত্রিক দ্রুততায় ছোঁড়া রানার বুলেটগুলো এসে শরীরের যত্রতত্র আঘাত করল তাদের। নাইন মিলিমিটারের প্রচণ্ড ধাক্কায় আছড়ে পড়ল তারা মাটিতে।

চোখের পলকে আরও কয়েকজন উদয় হলো কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে, রাস্তা আর গলি চেক করছিল এরা। সঙ্গীদের পটল তুলতে দেখে পিলারের আড়ালে থমকে দাঁড়িয়েছে, একেবারে নিরাপদ আশ্রয়... গুলি করে ওখান থেকে সেডানটাকে অনায়াসে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে। গেট দিয়ে আর বেরুনো সম্ভব নয়, বন্বন্ব করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা,

ভেজা কংক্রিটের উপরে পিছলাতে শুরু করল গাড়ির চাকা... অস্বাভাবিক দ্রুততায় লাটিমের মত ঘুরে যাচ্ছে। তবে নিয়ন্ত্রণ হারাল না ও, উল্টোদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে স্থির করল গাড়িটাকে—নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ওটা এখন বাম দিকে মুখ করে ফেলেছে।

অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, সবেগে কম্পাউণ্ডের পেরিমিটার ফেন্সের দিকে ছোটাল সেডান। পিছন থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল হামলাকারীরা—তুমুল বর্ষণকেও যেন হার মানাবে তাদের অব্যোহা ধারার বুলেট-বৃষ্টি। সেডানের রিয়ার-এণ্ডে ঠক্ ঠক্ করে বিঁধতে শুরু করল একটার পর একটা গুলি, রিয়ার উইণ্ডো আর টেইল-লাইট চুরমার হয়ে গেল, একটা বুলেট রানার মাথার উপর দিয়ে ছাদ ভেদ করে চলে গেল। কিন্তু ও নির্বিকার, গুলি শুধু ফিউয়েল-ট্যাঙ্কে না লাগলেই হলো। লাগলেও নেমে যাবার মত সময় পাওয়া যাবে। তাই দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে মন নিবিষ্ট রেখেছে ও ড্রাইভিঙে।

আরেকটা গুলি ঢুকে পড়ল গাড়ির ভিতরে, সামনের দু'সিটের মাঝখান দিয়ে গেল ওটা, বেরুল ফ্রন্ট-উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে। সিটের উপর একটু নিচু হয়ে গেল রানা, শত্রুদের কাছ থেকে টার্গেট-মাস্ ছোট করে আনতে চায়। অবশ্য এই পজিশনও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। মেশিনগানের গুলি ট্রান্স্ক আর পিছনের সিট ভেদ করে চলে আসতে পারে ওর পিঠ পর্যন্ত। তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে, মূলত সেডানের টায়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো—থামাতে চাইছে ওদের। এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, ব্যাটারী সম্ভবত জানে না—টায়ার ফাটলেও চাকার মেটাল রিমের উপর ভর করে গাড়ি চালাতে জানে ও। ওভাবে পাঁচ-সাত মাইল অনায়াসে চলে যেতে

পারবে—দূরত্বটা একেবারে কম নয়, ওর মত একজন এসপিয়োনাজ এজেন্টের পালিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। এ-কারণে দুই পলাতককে লক্ষ্য করে গুলি চালালেই বরং ভাল করত লোকগুলো।

এসে গেছে ফেস, প্রবল বেগে ওটার উপর আছড়ে পড়ল সেডান, ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে গেল কম্পাউণ্ডের পাশের সাইড-স্ট্রিটে। এক মুহূর্তের জন্য অ্যাকসেলারেটরে চাপ কমাল রানা, গাড়িটাকে সিধে করবার জন্য, তারপরই আবার সজোরে দাবাল। ফাঁকা রাস্তা ধরে উড়ে চলল সেডান।

বিপদ এখনও কাটেনি। কিছুদূর যাবার পরই পাশের একটা রাস্তা থেকে লম্বা একটা কালো রঙের কারকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা—আড়াআড়িভাবে ব্লক করে ফেলেছে সামনের সরু ইন্টারসেকশনটাকে। লাফ দিয়ে ওটা থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক, কারের পিছনে গিয়ে হাতের পিস্তল তাক করল অগ্রসরমান সেডানের দিকে। গুলি করতে গিয়ে থমকে গেল তারা—নিজেদের ভুলটা ধরতে পেরেছে। সেডানকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে উল্টো নিজেরাই ফাঁদে পড়েছে ওরা, স্পিড কমাচ্ছে না রানা, সোজা এসে আঘাত করে কারটাকে ওদের গায়ের উপর ফেলবে। চোখে আতঙ্ক ফুটল ওদের, পাগলের মত লাফঝাঁপ দিয়ে সরে যাচ্ছে এবার।

‘ড. সিদ্দিকী, ধরুন কিছু একটা!’ চেষ্টা করল রানা। ‘খুব জোরে একটা ঝাঁকি খাবেন।’

মাথা গরম করছে না ও, স্টিয়ারিং সামান্য ঘুরিয়ে সংঘর্ষের কেন্দ্র বদলাল। মাঝামাঝি ধাক্কা দিলে নিজেদের গাড়ি থেমে যাবে, ওরাও আহত হতে পারে, তাই সেডানকে তাক করল কারের রিয়ার-এণ্ডের দিকে।

সরাসরি গিয়ে শত্রুদের গাড়ির পিছনদিকে গুঁতো দিল ও । চরকির মত ঘুরে গেল কালো কার, রাস্তার একপাশে শূন্যস্থান সৃষ্টি করে দিচ্ছে । প্রচণ্ড একটা ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল রানার দেহ, ঘাড়টা যেন মটকে যাবে মট করে । হেডলাইট ভেঙে গেল সেডানের, একটা পাশ ঘষা খেল রাস্তার পাশের বিন্ডিঙের দেয়ালে... তবে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে পারল ।

পিছন থেকে আবার গুলি ছোঁড়া হলো, তবে মিছেই বুলেট নষ্ট করছে হামলাকারীরা । প্রতি মুহূর্তে ওদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে টার্গেট ।

সিটের উপর সোজা হয়ে মাথা ঝাড়া দিল রানা, ব্যথাটা সয়ে নিচ্ছে । তারপর তাকাল সঙ্গীর দিকে—ড. সিদ্দিকী প্রায় মেঝের সঙ্গে মিশে রয়েছেন ।

‘ডক্টর! আপনি ঠিক আছেন?’

জবাব দিলেন না বিজ্ঞানী । নিখর হয়ে আছেন ।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা । ‘ড. সিদ্দিকী! কী হয়েছে আপনার?’

এবার নড়লেন বিজ্ঞানী । গোঙানির মত শব্দ করে বললেন, ‘আমি অসুস্থ বোধ করছি ।’

‘অ্যাজমা?’

‘না । আমার চোখের সামনে গোটা জীবন ছবির মত ভেসে উঠছে—শুনেছি মরার আগে এমন হয় ।’

হেসে ফেলল রানা । ‘মাঝে মাঝে জীবনটাকে দেখার সুযোগ হলে দেখে নেওয়াই ভাল । পুরনো স্মৃতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে এতে । আপনার গুলি-টুলি লাগেনি তো?’

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী ।

‘গুড । তা হলে উঠে বসুন । কাজ আছে ।’

‘আপনি একাই তো কাফি,’ সোজা হতে হতে বললেন বিজ্ঞানী । ‘আমাকে আবার কী প্রয়োজন?’

‘কী করব, আল্লাহ দুটোই হাত দিয়েছেন, চারটে নয়,’ হালকা সুরে বলল রানা । ‘আমার জ্যাকেটের পকেটে সেলফোন আছে, বের করুন ওটা । একটা নাম্বার বলব, ওটাতে ডায়াল করে আমার কানে দিন । দেখি, ব্যাকআপ আনা যায় কি না ।’

‘হ্যাঁ, ব্যাকআপই প্রয়োজন আমাদের,’ স্বীকার করলেন সিদ্দিকী ।

‘কাজ ওটুকুই নয়,’ রানা বলল । ‘ফোন শেষে আপনি ঝেড়ে কাশবেন । আমাকে খুলে বলবেন, এই উন্মাদরা কারা । কেন আপনাকে খুন করার জন্য এভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে?’

আট

‘ভুল বুঝেছেন আপনি,’ শান্ত গলায় বললেন ড. আন্দালিব সিদ্দিকী । ‘ওরা আমাকে খুন করতে আসেনি ।’

‘কী!’

‘ওরা আমাকে জ্যান্ত চায়, মি. রানা ।’

চমকে গেল রানা, পুরো আক্রমণটাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে শুরু করল । হঠাৎই বুঝতে পারল, ভদ্রলোক ঠিক

এলছেন। এতক্ষণে যত গুলি করা হয়েছে, তার একটাও ওদের গায়ে লাগেনি—এটা স্রেফ সৌভাগ্য নয়, হতে পারে না। এক ডজনের বেশি ট্রেইনড প্রফেশনাল শত শত রাউণ্ড গুলি খরচ করবে, অথচ দু'জন টার্গেটের গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারবে না... এটা অসম্ভব। ইচ্ছেকৃতভাবেই হিসেবি শট নিয়েছে ওরা—ড. সিদ্দিকীকে ভয় দেখিয়ে থামাতে চেয়েছে। শরীরের একেবারে কাছ ঘেঁষে দু'একটা যা শট এসেছে, সেগুলো ছোঁড়া হয়েছিল ওকে খুন করার জন্য, ড. সিদ্দিকীকে নয়। গাড়িতেও ড্রাইভারের দিকটাতেই বেশি গুলি করা হয়েছে, যাতে বিজ্ঞানী আহত না হন।

হামলাটায় একমাত্র অসঙ্গতি হচ্ছে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেটটা। গভীরভাবে ভাবল রানা—সত্যিই কি তাই? ওই রকেট কি বিজ্ঞানীকে খুন করার জন্য ছোঁড়া হয়েছিল? একটু ভাবতেই পরিষ্কার হয়ে গেল—না, ব্যাপারটা অন্যরকম। রকেট ছুঁড়লেই যে রুমের ভিতরের মানুষ নিশ্চিতভাবে মারা পড়বে, তা নয়। বরং ওটা যদি রুমের দেয়াল ভেদ করে ছাদে হিট করার জন্য ছোঁড়া হয়, তা হলে কংক্রিট ধসানো যাবে। সেক্ষেত্রে মারা না গিয়ে আহত হয়ে ধ্বংসস্থূপে আটকা পড়তেন ড. সিদ্দিকী।

প্রস্তুতির কোনও অভাব ছিল না, নিঃসন্দেহে সফল হতো লোকগুলো... যদি না অসময়ে রানা হাজির হয়ে ওদের কাজে বাগড়া না দিত। ওর কারণেই ওদের প্ল্যানের দফা-রফা হয়ে যায়, অপারেশনটা চালিয়ে যাবার জন্য তাৎক্ষণিক কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আনে ওরা—মাসুদ রানাকে ঠেকানোর জন্য সেটুকু যথেষ্ট ছিল না।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে সেডান, হাইওয়েতে উঠে এল কিছুক্ষণের মধ্যে। ড. সিদ্দিকী এর মধ্যে অন্তর্ধান-১

বের করে নিয়েছেন সেলফোনটা। রানা বলল, ‘ডায়াল করুন...’

নাম্বারটা বলল ও।

একটার পর একটা ডিজিট চাপলেন সিদ্দিকী, তারপর ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বললেন, ‘রিং হচ্ছে।’

সেটটা হাতে নিতে নিতে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘পুলিশে যেতে চান?’

‘না, না,’ সভয়ে মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী। ‘আপনি কি থানায় ফোন করলেন নাকি?’

‘উঁহু।’

‘প্লিজ, কোনও পুলিশ নয়।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ওপাশে রিসিভ করা হয়েছে কলটা। রিনরিনে কণ্ঠ ভেসে এল, ‘রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।’
সোহানার গলা।

‘রানা বলছি। আমরা কণ্ডিশন রেড-এ পড়েছি।’

উদ্বেগ-উৎকর্ষা যা-ই অনুভব করুক, সে-সব গলায় ফুটতে দিল না সোহানা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, ‘সমস্যা যে হয়েছে, তা আমরা আগেই আঁচ করেছি... ফোর্ডের ট্রান্সমিটারটা যখন বন্ধ হয়ে গেল। কী হয়েছে ওটার?’

‘গাড়িটা এখন ইতিহাস। পরে খুলে বলব সব। আমরা এখন একটা চোরাই গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছি।’

‘লোকেশনটা বলো।’

‘দাঁড়াও, ভয়েস-এনক্রিপশন চালু করে নিই।’ সেলফোনের নীচের দিকের একটা বোতাম চাপল রানা, লাইনটা এখন স্ক্রাম্বলড হয়ে গেছে। সেটটা কানে ঠেকাল আবার ও। ‘এখনও নিউয়ার্কে আমরা, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াটা থেকে বেরিয়ে এসেছি,

হাইওয়ে ধরে উত্তরে যাচ্ছি। রুট টোয়েন্টি ওয়ানের সাইনবোর্ড দেখেছি একটু আগে।’

‘ক’জন হামলা করেছিল?’

‘ডজনখানেকের মত। তবে অসুবিধে হয়নি, বেরিয়ে আসতে পেরেছি।’

‘পিছু নেয়নি তো?’

সিয়ারিং হুইলে বাঁ হাত স্থির রেখে পিছন ফিরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে মুখ কালো হয়ে গেল ওর। দুটো গাড়ি ছুটে আসছে দূর থেকে, পাগলের মত ছোটানো হয়েছে ওগুলো—দূরত্ব কমিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

তিক্ত কণ্ঠে ও বলল, ‘তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এতক্ষণ ছিল না, কিন্তু তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়েছে ওরা!’

‘ব্যাকআপ চাও?’

‘যে-অবস্থা দেখছি, তাতে ব্যাকআপ আমাদের কাছে পৌঁছানোর আগে আমরাই ব্যাকআপের কাছে পৌঁছে যাব। একটা রুঁদেভু পয়েন্ট দাও।’

‘ধরো একটু,’ বলে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ম্যাপ দেখল সোহানা। তারপর বলল, ‘শোনো, রুট টোয়েন্টি-ওয়ান থেকে বেরিয়ে এসো। সামনে রুট-থ্রি’র ইন্টারসেকশন পাবে, ওটা ধরে রুট-সেভেনটিনে ওঠো। উত্তরে... টেটারবোরোতে পৌঁছুতে হবে তোমাকে।’

টেটারবোরো এয়ারপোর্টের কথা বলছে ও। গ্রেটার নিউ ইয়র্কের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর ওটা: কেনেডি, লা-গুয়ার্ডিয়া আর নিউয়ার্ক ইন্টারন্যাশনালের পরে। রুট-সেভেনটিন আর ফরটি-সিক্সের মাঝামাঝি, ইন্টারস্টেট-এইটির অন্তর্ধান-১

পাশে পড়বে ওটা। মিডটাউন ম্যানহ্যাটন থেকে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ ধরে মাত্র বারো মাইল দূরত্ব। শুধুমাত্র কর্পোরেট, চার্টার ও প্রাইভেট এয়ারক্রাফট হ্যাণ্ডেল করে এয়ারপোর্টটা, বড় বিমানবন্দরগুলোর উপর থেকে নন-কমার্শিয়াল এয়ার-ট্রাফিকের চাপ কমায়। এ-ধরনের এয়ারপোর্টকে রিলিভার বলে।

‘জাকিরকে আমি পাঠাচ্ছি ওখানে... হেলিকপ্টারসহ,’
সোহানা বলল। ‘বাকি স্পেসিফিকস্ দশ মিনিট পরে ফোন করে জেনে নিয়ো।’

‘ঠিক আছে,’ রানা বলল।

‘সাবধানে থেকো।’

‘না থেকে উপায় আছে? ছুটিটা কাজে লাগাতে হবে না!’
হাসল রানা, তারপর কেটে দিল লাইনটা। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা—অনুসরণকারীরা ভালই এগোচ্ছে। হাইওয়েতে আরও গাড়ি চলছে, সেগুলোকে ওভারটেক করছে ঘন ঘন, এগোনোর সুবিধার্থে রং-সাইডে যেতে দ্বিধা করছে না। ড্রাইভারেরা দক্ষ, সেই সঙ্গে অনেকটা বেপরোয়া-ও বোধহয়, একের পর এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছে। সেডানের ফিউয়েল গজের দিকে তাকিয়েই শঙ্কিত বোধ করল রানা—গাড়িতে ওঠার সময় ডায়ালের এফ-এর কাছাকাছি ছিল কাঁটাটা, অথচ এখন নেমে এসেছে অর্ধেক। এত অল্প সময়ে এ-পরিমাণ ফিউয়েল খরচ হবার কথা নয়। মানেটা পরিষ্কার—গোলাগুলিতে ফুটো হয়ে গেছে ওদের ট্যাঙ্ক। অবশিষ্ট জ্বালানি নিয়ে টেটারবোরো পৌঁছুনো প্রায় অসম্ভব। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল ওর। সেডানের গতি বাড়াতে বাড়াতে তাকাল ড. সিদ্দিকীর দিকে।

‘লোকগুলোর পরিচয় এখনও কিন্তু বলেননি আপনি, ডক্টর,’
একটু রাগী সুরে বলল রানা।

‘এরা সবাই কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড মিগুয়েল সাণ্টানার লোক,’
শান্ত স্বরে বললেন সিদ্দিকী।

‘কী!’ অবাক হলো রানা। ‘একজন ড্রাগলর্ড আপনার
পিছনে লাগবে কেন?’

‘বলছি। আমি যে মার্কিন সরকারের হয়ে গবেষণা করি, তা
জানেন নিশ্চয়ই? ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হয়ে
কাজ করছিলাম। এক বছরের প্রজেক্ট... ড্রাগ অ্যাডিকশনের
একটা প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে।
এলিস্ভিয়ার বায়ো-ল্যাব-এর নাম শুনেছেন? ওখানেই শুরু হয়
কাজ...’

‘এক মিনিট,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘ড্রাগ অ্যাডিকশনের
প্রতিষেধকের ব্যাপারটা বুঝলাম না।’

‘সহজ করে বলি—মাদকাসক্তির পুরো প্রক্রিয়াটাই ভীষণ
গোলমালে। শারীরিক, নাকি মানসিক, কীসের কারণে মানুষ
আসক্ত হয়ে পড়ে, সেটাই আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি আমরা।
তাছাড়া অ্যাডিক্টদের ভিতরও রকমফের আছে। প্যাসিভ-রা
ডিপ্রেসেন্ট ব্যবহার করে, অ্যাকটিভ-রা চায় স্টিমিউলেন্ট।
আবার উন্টোটাও ঘটে! আমার কাজ ছিল সমস্ত অ্যাডিক্টদের
ভিতর একটা কমন ট্রিগার খুঁজে বের করা—যাতে ওটার
মাধ্যমে অ্যাডিকশনে পড়া-না-পড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।’

‘কী ধরনের ট্রিগারের কথা বলছেন?’

‘ব্রেনের একটা নার্ভ সেন্টার—যেটা মাদকাসক্তির মূল
কারণ। ভেবে দেখুন—যদি তেমন একটা নার্ভ সেন্টার খুঁজে
বের করা যায়, আর সেটাকে আপনি ইলেকট্রিক সুইচের মত

অন-অফ করতে পারেন... দারুণ একটা ব্যাপার হবে না?’

‘এ তো মাইণ্ড-কন্ট্রলের কথা বলছেন আপনি!’

‘এত সিরিয়াসভাবে নিচ্ছেন কেন? আমি তো মানুষকে হাতের পুতুল বানাবার কথা বলছি না, শুধু একটা ওষুধ দিয়ে নার্ভটাকে অচল করে রাখতে চাইছি... যাতে কেউ কোনোদিন আর মাদকাসক্ত না হয়।’

‘বুঝলাম, কিন্তু তারপরেও... মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে কোনও ধরনের এক্সপেরিমেন্ট সমর্থন করি না আমি।’ আড়চোখে রিয়ারভিউ মিরর দেখল রানা, ধাওয়াকারীরা ওদের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমছে আরও। ওদের পুরনো সেডানের গতি অনেক কম, শত্রুদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

‘বুঝেছি, আপনি একজন আদর্শবাদী!’ গোমড়া মুখে বললেন ড. সিদ্দিকী।

‘আমার কথা বাদ দিন,’ রানা বলল। ‘আপনার কথা শেষ করুন। গবেষণাটা সফল হয়েছিল?’

‘না,’ মাথা নাড়লেন ড. সিদ্দিকী। ‘ব্যর্থ হয়েছিল তা-ও বলা যায় না। ব্যাকফায়ার করেছিল বললেই বরং ঠিক হবে।’

‘ব্যাকফায়ার মানে?’

‘একটা কেমিক্যাল আবিষ্কার করে বসি আমি—ওটা যে-কোনও মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে আসক্ত করে তুলতে পারে। একটা নতুন ড্রাগ! জিনিসটা অল্প খরচে তৈরি করা যায়, আবার তেমন কোনও ইকুইপমেন্টও প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য ড্রাগের মত ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সময় বিস্ক্রিয়া ঘটে না, বিস্ফোরণেরও ঝুঁকি নেই। এই ড্রাগ যে-কোনও মাদক-ব্যবসায়ীর জন্য ড্রিম-প্রোডাক্ট।’

আবার রিয়ারভিউ মিরর দেখল রানা—ধাওয়াকারীরা এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

‘ব্যাপারটা রিপোর্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে ডিইএ আমার পুরো প্রজেক্ট বন্ধ করে দিল,’ বলে যাচ্ছেন সিদ্দিকী। ‘গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র সিজ করে পুড়িয়ে ফেলল। কিন্তু ওদের মধ্যে কলাম্বিয়ানদের চর আছে, সে-ই আবিষ্কারের ঘটনাটা ফাঁস করে দিয়েছে ড্রাগলর্ড সান্টানার কাছে। গবেষণার কাগজপত্র না থাকায় লোকটা এখন আমাকে হাতে পেতে চায়... নতুন ড্রাগটার ফর্মুলার জন্য।’

‘তা হলে ডিইএ আপনাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে না কেন?’

‘দিয়েছিল। কিন্তু বললাম না, চর আছে ওদের মধ্যে? এক রাতে ডিইএ-র সেফহাউসে হামলা করে কলাম্বিয়ানরা—আমাকে কিডন্যাপ করার জন্য। আমার দেহরক্ষীরা সবাই মারা পড়ে, আমি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাই। ভাগ্যিস, অনেকদিন আগে ইমার্জেন্সির জন্য ওয়্যারহাউসের হাইডআউটটা তৈরি করে রেখেছিলাম... নইলে যাবার কোনও জায়গা ছিল না আমার।’

‘হুম,’ আনমনে মাথা দোলল রানা, মনোযোগ পুরোপুরি ড্রাইভিঙের দিকে। শত্রুরা বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

‘কিন্তু ওখামে অনির্দিষ্টকাল থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে—আমার খোঁজ বের করে ফেলত ওরা... ফেলেছেও, নিজের চোখেই তো দেখেছেন!’ বলে চললেন সিদ্দিকী। ‘আমেরিকান কোনও সংস্থার কাছে যাবার সাহস পাইনি—কলাম্বিয়ানরা কোথায় কোথায় টাকা খাইয়ে রেখেছে কে জানে! অনেক ভেবে-চিন্তে মনে পড়ল রানা এজেন্সি আর বিসিআই-এর কথা। আমি জানি, আপনারা আর যা-ই করুন, অন্তর্ধান-১

অন্তত ড্রাগ-ডিলারদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। তারপরও কিছুটা অনিশ্চয়তায় ছিলাম, তাই ভাবলাম—সাহায্য চাইতে হলে সরাসরি মাসুদ রানার কাছে চাইব, আর কারও কাছে নয়।’

‘ভাল করেছেন,’ বলল রানা, ডান হাতে আবার বের করে আনল সিগ-সাওয়ারটা। ‘এটা লোড করতে পারবেন?’

মাথা ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী—পারবেন।

একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিনসহ অস্ত্রটা তাঁর হাতে দিল রানা, নিজে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে। রিয়ারভিউ ছেড়ে এখন সাইডভিউ মিররে উদয় হয়েছে ধাওয়াকারী গাড়িদুটো, একেবারে গায়ের উপর উঠে আসতে চায়। কাছ থেকে দেখে রানা চিনতে পারল, দুটোই পণ্ডিয়াক... কালো রঙের। একটা চলে গেল পিছনে, অন্যটা পাশাপাশি পজিশন নেবার চেষ্টা করছে। ব্যাটারের মতলব বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার—বক্স করে সেডানকে রাস্তার পাশে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। সেডানে ড. সিদ্দিকী আছেন বলে গুলি করবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

‘কুইক, ডক্টর!’ হাত বাড়িয়ে দিয়ে চেষ্টা করল রানা। ‘পিস্তলটা দিন।’ পরমুহূর্তেই তালুতে সিগ-সাওয়ারের শীতল স্পর্শ পেল ও। গ্রিপটা আঁকড়ে ধরে বলল, ‘সিটবেল্ট বাঁধুন।’

ত্রস্ত হাতে বেলেটের ক্লিপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সিদ্দিকী। তার ঠিক দু’সেকেণ্ড পর বামদিকে সমান্তরাল পজিশনে চলে এল ধাওয়াকারীদের প্রথম পণ্ডিয়াক, পাশ থেকে ধাক্কা দিল সেডানকে। রানাও ওদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছে—পাল্টা ধাক্কা দিচ্ছে। ইম্পাতের সঙ্গে ইম্পাতের ঘর্ষণের বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল। বিপরীতমুখী গাড়িগুলোর জানালায় বিস্মিত মুখ দেখতে পেল রানা, অবাক হয়ে কাণ্ডটা দেখছে... পুলিশ-টুলিশে খবর

দেবে নিশ্চয়ই।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত স্থির রইল দুটো গাড়িই, কেউ কাউকে রাস্তা থেকে ঠেলে সরাতে পারছে না। তবে একটু পরেই হার মানতে শুরু করল সেডান, পণ্ডিয়াকটা আকারে বড়, শক্তিও বেশি। রানা বুঝতে পারল, এক্ষুণি কিছু একটা করা দরকার, নইলে ওরা রাস্তা থেকে ছিটকে যাবে। গুলি ছুঁড়তে গিয়ে থমকে গেল, শত্রুপক্ষের ড্রাইভার যদি আহত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়, তা হলে হাইওয়েতে চলাচলকারী অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে... নিরীহ মানুষ হতাহত হবে তাতে। কী করা যায়!

হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশের গাড়ির উপর থেকে চাপ কমিয়ে আনল রানা, একই সঙ্গে ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে ঠেসে ধরল অ্যাকসেলারেটর। জ্যা-মুক্ত তীরের মত আগে বাড়ল সেডান, চোখের পলকে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট—শত্রুদের গাড়ির বনেট এখন রানার জানালা বরাবর। হাত বের করে গুলি ছুঁড়ল রানা—ইঞ্জিন লক্ষ্য করে! অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ট্রিগার চাপল ও, চোখের পলকে খালি করে ফেলল পুরো ম্যাগাজিন।

হুড ভেদ করে মাখন কাটা ছুরির মত ঢুকে গেল সিগ-সায়ারের শক্তিশালী বুলেট। ফ্যান গুঁড়িয়ে দিল, রেডিয়েটরে গরম পানির বিস্ফোরণ ঘটাল—বনেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ কালো ধোঁয়া। বেশ ক্ষতি হয়েছে ইঞ্জিনের, প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই গতি হারাল পণ্ডিয়াক, পিছিয়ে পড়ল।

গুলি ছুঁড়েই ঝট করে হাতটা আবার ভিতরে নিয়ে এসেছে রানা, ভেবেছিল পাল্টা গুলি হবে, কিন্তু দেখা গেল—প্রতিপক্ষ পাক্কা প্রফেশনাল। নিজেদের ক্ষতি হবার পরও মাথা গরম অন্তর্ধান-১

করেনি, ড. সিদ্ধিকীর যাতে কোনও ক্ষতি না হয়—সে-ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন, একটা গুলিও ছুঁড়ল না।

ঘটনার আকস্মিকতা, সেই সঙ্গে আচমকা সেডানের গতি বেড়ে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় গাড়িটা। তবে খুব শীঘ্রি চমকটা সামলে নিল ওটার আরোহীরা, স্পিড বাড়িয়ে চলে এল রানাদের পিছে।

রিয়ার-এণ্ডে গুঁতো খেয়ে কেঁপে উঠল গোটা সেডানের চেসিস—পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পুরনো কারটাকে টালমাটাল করে দিতে চাইছে হামলাকারীরা। ডানে-বামে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আর ব্রেক ব্যবহার করে স্থির রইল রানা। আবার ধাক্কা দেয়া হলো পিছন থেকে, ভয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্ধিকী।

‘শান্ত থাকুন,’ রানা বলল। ‘ওভাবে কিছুই করতে পারবে না ওরা।’

দ্বিতীয় গাড়ির লোকেরা কার-ফাইটিঙে আনাড়ি—বুঝতে পারছে ও। নইলে পিছন থেকে গুঁতো মারত না। এই আক্রমণে সামনের গাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয় না, দক্ষ ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণও হারায় না সহজে। ওদের উচিত ছিল পাশে এসে আঘাত করা, তবে প্রথম গাড়িটার পরিণতি দেখে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়। লোকগুলোর এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে।

কার-ফাইটে সবচেয়ে কার্যকর অ্যাটাকিং-মুভমেন্ট মাত্র একটা—ওটাই প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা, তবে সেজন্যে সুবিধেজনক পজিশনে পৌঁছুতে হবে প্রথমে। পিছন থেকে আবার ধাক্কা খাবার আগেই স্পিড বাড়াল ও, তারপর আচমকা ডানে কেটে চেপে ধরল ব্রেক। ভেজা রাস্তায় টায়ার পিছলানোর শব্দ হলো, অকস্মাৎ থেমে যাচ্ছে সেডানটা। ব্যাপারটা আগে আঁচ করতে পারেনি ধাওয়াকারীরা, প্রতিক্রিয়ার সময় পেল

না... সেডানকে পিছনে ফেলে পাশ দিয়ে ছুটে সামনে চলে গেল। এবার আবার অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, পণ্ডিয়ারের রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায় নিয়ে এল সেডানকে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুই গাড়ির জায়গা বদলে গেছে।

মুখে হাসি ফুটল রানার, কায়দামত পাওয়া গেছে গ্যাটার! এবার কৌশলটা খাটাবে ও। বইয়ের ভাষায় প্রেসিশান ইমোবিলাইজেশন টেকনিক বা পিআইটি বলে একে। শক্তিতে গেলে তেমন কোনও শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না, স্রেফ একটা টোকা, বাকি কাজ সারে পদার্থবিদ্যার স্বাভাবিক নিয়ম।

স্পিড বাড়িয়ে এগোল রানা, ফ্রন্ট বাম্পারের বাম প্রান্ত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল পণ্ডিয়ারের রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায়। হিসেব করা আঘাত—ব্যালাস পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল গাড়িটার, লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল। একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরতেই টেকো ড্রাইভার আর অপর তিন আরোহীর হতবিস্ময় চেহারা চোখে পড়ল রানার। হাত নেড়ে টা-টা করল ও, বিদায় সম্ভাষণটা ওরা দেখল কি না কে জানে; গাড়িটা তখনও ঘুরছে... একই সঙ্গে পিছলে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রানা, পিছনে পণ্ডিয়ারকটা গিয়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার পাশের ব্যারিয়ারে—থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

‘নাইস জব!’ প্রশংসার সুরে বললেন ড. সিদ্দিকী।
‘দেখালেন বটে!’

‘এখনও খুশি হবার সময় আসেনি,’ নীরস গলায় বলল রানা। ‘ওরা ফিরে আসবে।’

‘কী!’ চমকে গেলেন সিদ্দিকী।

‘হ্যাঁ, ওই আঘাতে গাড়ি কেবল থামিয়ে দেয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য, অন্য কোনও ক্ষতি হয় না। লাভের মধ্যে অন্তর্ধান-১

আমরা একটু সময় পেয়েছি, এ-ই আর কী!’ ফিউয়েল গজের দিকে তাকাল রানা—কাঁটা এখন এক-চতুর্থাংশ রিডিং দেখাচ্ছে। ‘তেলও শেষ আমাদের, এই গাড়ি নিয়ে রুঁদেভু-তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।’

‘তা হলে?’

‘আর কিছু করতে হবে।’

সামনে একটা একজিট র‍্যাম্প দেখতে পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা। দেখা যাক, অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেয়া যায় কি না। নতুন গাড়িও ম্যানেজ করতে হবে। র‍্যাম্প ধরে সবেগে হাইওয়ে থেকে নেমে এল ওরা।

নীচের রাস্তা ধরে একশো গজ যেতেই একটা শপিং মল চোখে পড়ল, পাশে বিশাল পার্কিং লট—সেখানে গাড়ি আর গাড়ি। ঝড়ের বেগে সেডানটাকে লটে ঢোকাল ও, দৃষ্টিসীমার আড়ালে পার্ক করবার মত একটা জায়গা খুঁজছে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, একটাও ফাঁকা স্পট চোখে পড়ল না। ছুটির দিন আজ, রোববার, তারওপর বৃষ্টি পড়ছে। ঝড়বাদলের মধ্যে বেড়ানো তো সম্ভব নয়, তাই মানুষজন চলে এসেছে শপিং করতে—অগণিত ক্রেতাদের গাড়ির ভিড়ে টইটমুর হয়ে গেছে পুরো লট... একটুও জায়গা নেই। সারি সারি যানবাহনের মাঝখানে ঘুরে বেড়ানোটাই সার হলো রানাদের জন্য। সেডানটাকে যেখান-সেখানে ফেলে রাখারও উপায় নেই, শপিং মলের সিকিউরিটি পার্সোনেল বাধা দেবে।

লটের এন্ট্র্যান্সের দিকে ফিরে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ ঢুকতে দেখল দ্বিতীয় পণ্ডিয়াটাকে—আঘাত সামলে নিয়ে ফিরে এসেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শিকারকে খুঁজে নিল ওরা, নাক ঘুরিয়ে সোজা ছুটে এল সেডানের দিকে। উইণ্ডশিল্ডের

ওধারে টেকো ড্রাইভার আর তার সঙ্গীদের হিংস্র চেহারা দেখা গেল, দৃষ্টি দিয়েই যেন খুন করবে রানাকে।

ঘোরার জায়গা নেই, ব্রেক কমল রানা, গিয়ার পাণ্টে রিভার্সে দিল, তারপর চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। শরীর ঠাকিয়ে পিছনের উইণ্ডশিল্ড দিয়ে তাকাচ্ছে ও, উল্টোদিকে ড্রাইভ করছে।

হঠাৎ শত্রুদের একজন জানালা দিয়ে হাত বের করল, হাতে একটা সাইলেন্সার-লাগানো .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল। গুলির শব্দ শোনা গেল না, শুধু দু'বার গুণ্ডিয়ে উঠল সেডানের পুরনো ইঞ্জিন। সামনের দিকে তাকাতে হলো না রানার, পরিষ্কার বুঝতে পারছে কী ঘটেছে—ওর-ই ওষুধ দিয়ে শায়েস্তা করা হচ্ছে ওকে। ওদের প্রথম গাড়িটাকে ও যেভাবে অচল করেছিল, ঠিক সেইভাবেই অচল করা হচ্ছে সেডানকে—রেডিয়েটর আর ইঞ্জিনে গুলি করে। হিস হিস শব্দ উঠল—রেডিয়েটর লিক হয়ে বাষ্প বেরুতে শুরু করেছে।

‘মি. রানা!’ আতঙ্কিত গলায় চৈঁচালেন ড. সিদ্দিকী।

কিছু বলল না রানা, এখুনি অস্থির হবার প্রয়োজন নেই। নাইন মিলিমিটারের চেয়ে ফরটি-ফাইভের শক্তি কম, ইঞ্জিনটা এখনই বন্ধ হবে না। অ্যাকসেলারেটর চেপে দ্রুত পিছিয়ে যাওয়া নিয়েই ব্যস্ত রইল ও।

সারি সারি গাড়ির মাঝখানের একটা ইন্টারসেকশনে পৌছে গেছে সেডান—মোটামুটি প্রশস্ত ওখানটা। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে সজোরে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, স্কিড করে একশো আশি ডিগ্রি টার্ন করবে—মুখ ঘোরাবে গাড়ির। কৌশলটা নিখুঁতভাবে কার্যকর করা গেল না—ভেজা কথক্রিটে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পিছলাল চাকা, সেডানের পিছনটা গিয়ে বাড়ি খেল পার্ক করা

একটা জিপের সামনে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল ওরা, পিছনে জিপের অ্যালার্ম বাজছে তারস্বরে।

রানা মাথা ঘামাল না ও-নিয়ে, কোনোদিকে না তাকিয়ে গিয়ার বদলাল, তারপর মুখ সোজা করে সবেগে ছোটাল গাড়ি। ধাওয়াকারীরা এখন ওদের পিছনে।

হঠাৎ চমকে উঠল ও। ছাতা হাতে কয়েকটা গাড়ির মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যমনস্ক এক তরুণী... ঠিক ওদের সামনে! ধাবমান সেডানটাকে দেখতে অনেক দেরি করে ফেলল সে, তখন সরবার সময় নেই। আতঙ্কে প্যারালাইসিস-আক্রান্ত রোগীর মত স্থির হয়ে গেল মেয়েটি। হাত থেকে পড়ে গেল ছাতা।

‘ওহ্ গড!’ চৈঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্দিকী।

নয়

‘নোড়ো না!’ বিড়বিড় করে উঠল রানা—গুনে মনে হতে পারে, সামনের মেয়েটির উদ্দেশে বলছে ও কথাটা; আসলে ওটা প্রার্থনা... ওপরঅলার কাছে করছে, যাতে স্থির থাকে মেয়েটা। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য দু’পাশের ফাঁকা জায়গার হিসেব সেরে ফেলেছে ও, কিন্তু নড়াচড়া করলেই সব গুবলেট হয়ে যাবে।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, পার্কিং লটের আইলের

একপাশে সরিয়ে আনল সেডান। পার্ক করা একসারি গাড়ির সঙ্গে ঘষা খেতে থাকল বামপাশ—একের পর এক হেডলাইট আর ফ্রন্ট বাম্পার ধ্বংস করছে, তবে মেয়েটার শরীরের ছ'ইঞ্চি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল।

রিয়ারভিউ মিররে মেয়েটাকে থরথর করে কাঁপতে দেখল রানা—বেচারি নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ড. সিদ্ধিকীর চোখেও অবিশ্বাস—নিশ্চিত একটা অ্যাকসিডেন্ট কীভাবে ফাঁকি দিল এই লোকটা? পরমুহূর্তে পিছনে টায়ারের কর্কশ শব্দ আর হর্ন শোনা গেল—পণ্ডিত্যক থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। রানার মত মেয়েটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। মুচকি হাসল রানা। যাক, মেয়েটা অন্তত একটা কাজের কাজ করেছে। শত্রুদের থামিয়ে দিয়ে পালাবার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে—এটা কাজে লাগতে হবে।

পার্কিং লটে আর ঘোরাফেরা করে কাজ নেই, দিক পাণ্টে মলের এন্ট্রান্সের দিকে সেডান ছোটাল রানা। বড় বড় কাঁচের দরজাগুলোর সামনে এসে ব্রেক কষে থামল ও। ‘ড. সিদ্ধিকী, বেরিয়ে পড়ুন।’

গাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা শুনে চোখ বড় হয়ে গেল বিজ্ঞানীর, বাহনটার ভিতরেই নিরাপদ বোধ করছিলেন তিনি। প্রতিবাদের সুরে বলতে চেষ্টা করলেন, ‘কিন্তু...’

‘কোনও কথা নয়, বেরোন!’

সেডান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা আর ড. সিদ্ধিকী। দৌড়তে শুরু করল এন্ট্রান্সের দিকে। দরজা পেরিয়ে যখন ঢুকে যাচ্ছে, তখন পিছনে ব্রেক কষার শব্দ হলো। এক পলকের জন্য মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানা—ধাওয়াকারীরা এসে পড়েছে, কালো পণ্ডিত্যকটা থামানো হয়েছে ঠিক সেডানের পিছনে।

অ্যাসল্ট অপারেশনের নিয়মকানুন দাঁড়ি-কমা মেনে অনুসরণ করছে এরা। রানা বুঝতে পারল, ড্রাইভার গাড়িসহ সেডানের কাছে থাকবে, বাকি তিন আরোহী এসে ঢুকবে ওদের খোঁজে। এটাই নিয়ম—টার্গেটের এক্সেপ ভেহিকল চোখে চোখে রাখতে হয়। তা ছাড়া ওয়্যারলেসে যোগাযোগও থাকবে ওদের মধ্যে। সেডান ফেলে রানারা যদি অন্য কোনও রাস্তায় পালাবার চেষ্টা করে, ড্রাইভার চোখের পলকে সেখানে হাজির হয়ে যেতে পারবে। লোকগুলোর এই নিয়মানুবর্তিতাকেই কীভাবে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার করা যায়, ভাবতে শুরু করল রানা।

মলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। বিল্ডিংটা দোতলা, সুপ্রশস্ত অভ্যন্তর—ডেকোরেশনও করা হয়েছে চমৎকারভাবে। ভিতরটা লোকে লোকারণ্য—হারিয়ে যেতে কষ্ট হবে না। আশপাশের দোকানগুলোর উপর চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রানা—বামে একটা ইলেকট্রনিক্স স্টোর নজর কাড়ল ওর। ড. সিদ্দিকীর আস্তিনে টান দিয়ে বলল, ‘এদিকে আসুন।’

লোকজনের ভিড় ঠেলে দোকানটার দিকে এগোল রানা, সিগ-সাওয়ারটা ধরে রেখেছে হাতে, জ্যাকেটের আড়ালে লুকিয়ে ম্যাগাজিন বদলে নিল। নতুন একটা ভরেছে, চেম্বারেও ঢোকাল একটা সিঙ্গেল বুলেট—অস্ত্রটা এখন পুরোপুরি লোডেড।

ভেজা পোশাক পরা দুজন মানুষকে স্টোরে ঢুকতে দেখে একটু বিস্ময় ফুটল অল্পবয়সী ক্লার্কের চেহারায়। ভুরু কুঁচকে রানা আর ড. সিদ্দিকীকে দেখল সে, বোঝার চেষ্টা করছে—আসলেই কিছু কেনার মত সামর্থ্য আছে কি না নবাগত দুই কাস্টোমারের। সেডান দখল করবার সময়ই উদ্বাস্তুদের ওভারকোটদুটো ফেলে দিয়েছিল বলে তা-ও কিছুটা রক্ষা,

নইলে অমন পোশাক দেখে লোকটা দূর-দূর করে খেদাত ওদের।

‘কী হলো?’ একটু বিরক্তি ফুটিয়ে বলল ও। ‘আমাদের পছন্দ হচ্ছে না?’

ঝট করে সোজা হলো ক্লার্ক, কথা বলার দৃঢ়তা আর চেহারার আভিজাত্য দেখে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘হাউ মে আই হেল্প ইউ, সার?’

পিস্তলটা ইতিমধ্যে হোলস্টারে রেখে দিয়েছে রানা, চোখ বোলাল ভিতরে সাজিয়ে রাখা হরেক রকম টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ারের দিকে। ‘আমরা যা খুঁজছি, তা স্টোরের পিছনদিকে আছে,’ বলল ও।

‘প্লিজ, আসুন,’ হাঁটতে হাঁটতে বলল ক্লার্ক। ‘দেখান কী প্রয়োজন আপনাদের।’

অল্প কিছু কাস্টোমার রয়েছে স্টোরের ভিতরে, তাদের পাশ কাটিয়ে পিছনের কাউন্টারের দিকে এগোল রানা, ড. সিদ্দিকী অনুসরণ করলেন ওকে।

‘যা চান, তা-ই পাবেন এখানে, সার,’ ক্যানভাসারের ভঙ্গিতে বলল ক্লার্ক। ‘চমৎকার সময়ে এসেছেন, এই হপ্তায় আমরা সব বিক্রিয় ওপর বিশেষ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি...’

লোকটার কথায় কান দিল না রানা। কাউন্টারটার একপাশে একটা দরজা চোখে পড়েছে ওর, দোকানের স্টোররুমে যাওয়া যায়। বিজ্ঞানীকে নিয়ে সেদিকে গেল ও, নব মুচড়ে খুলে ফেলল পাল্লা।

‘করছেন কী, সার?’ প্রায় চৈঁচিয়ে উঠল ক্লার্ক। ‘কাস্টোমারদের স্টোররুমে যাবার নিয়ম নেই!’

‘কিন্তু স্টোররুমটাই তো খুঁজছি আমরা!’ বলে টান দিয়ে অন্তর্ধান-১

ড. সিদ্ধিকীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, ক্লার্ক কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

কিল পড়ল দরজায়। চাপা আওয়াজ ভেসে এল, ‘সার! দরজা খুলুন।’

অনুরোধটা গ্রাহ্য করল না রানা। হাঁটতে শুরু করল স্টোররুমের বিপরীত দিকটা লক্ষ্য করে।

‘এখানে ঢুকলেন কেন?’ বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন সিদ্ধিকী।

জবাব না দিয়ে আঙুল তুলে দ্বিতীয় একটা দরজা দেখাল রানা—সার্ভিস ডোর। ওখান দিয়ে বাইরে থেকে দোকানের সমস্ত মালামাল এনে ঢোকানো হয় স্টোররুমে। আমেরিকার সমস্ত শপিং মলের নিয়ম এটা—স্টোররুম থাকলেই সেটার আলাদা সার্ভিস ডোর থাকতে হবে। এই ব্যবস্থায় আড়াল থেকে সব ধরনের ডেলিভারি ও সাপ্লাই সম্পাদন করা যায়, সামনে থাকা কাস্টোমারদের অসুবিধে হয় না মালামাল আনা-নেয়ার ফলে।

নানা ধরনের কার্টনে ভরা অনেকগুলো র‍্যাক রয়েছে স্টোররুমের ভিতরে, সেগুলোর মাঝ দিয়ে এগোল রানা আর ড. সিদ্ধিকী। দরজার সামনে পৌঁছুল। তালা দেয়া আছে পাল্লায়, তবে সেটা রানার জন্য কোনও বড় সমস্যা নয়, এক গুলিতে নবটা উড়িয়ে দিল ও, তারপর সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে এল মলের বাইরে... বৃষ্টির মধ্যে।

অ্যাসল্ট টিমের সদস্যরা তখন মলের ভিতরে ওদের খুঁজে মরছে, খুব শীঘ্রি তাদের বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা নেই। বিল্ডিং থেকে বেরুনের মূল পথ আর ফায়ার একজিটগুলোর দিকে নজর রাখবে ওরা, কিন্তু সার্ভিস ডোরের দিকে খেয়াল করবে

বলে মনে হয় না... সম্ভবও নয়।

একটু ঘুরপথে এন্ট্র্যান্সের দিকে এগোল রানা, মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলছে। যা ভেবেছিল, তা-ই। সেডানের পাছায় প্রায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো গাড়িটা। প্রয়োজনে দ্রুত ছোটর সুবিধার্থে ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি। টাকমাথা ড্রাইভার ড্রাইভিং সিটে বসে সতর্ক চোখে তাকিয়ে রয়েছে মলের দরজার দিকে, অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই।

পিছন থেকে অগ্রসর হলো রানা, পণ্ডিত্যাকের রিয়ারভিউ আর সাইডভিউ মিরর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। হাতে বেরিয়ে এসেছে সিগ-সাওয়ারটা। নিচু হয়ে ড্রাইভারের দরজার পাশে চলে গেল ও, তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে সচকিত হলো ড্রাইভার, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অনাহুত আগন্তকের দিকে, তবে দেরি করে ফেলেছে সে। পিস্তলের বাট দিয়ে জানালার কাঁচে সজোরে আঘাত হানল রানা, ভাঙা কাঁচের আঘাত থেকে বাঁচতে মাথা নামিয়ে ফেলল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল পাশের সিটের দিকে—ওখানে তার পিস্তল, সেলফোন, সিগারেট আর লাইটার রাখা।

‘খবরদার!’ বুক কাঁপানো স্বরে ধমকে উঠল রানা। ‘নড়বে না!’

থমকে গেল ড্রাইভার। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে রানার দিকে।

‘নামো!’

চকিতে নিজের পিস্তলের দিকে তাকাল টাকমাথা, হিসেব কষছে—ওটা নিতে পারবে কি না।

‘বোকামি কোরো না,’ বলল রানা। ‘লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে এসো গাড়ি থেকে।’

আবার পাশে তাকাল ড্রাইভার, হার মানতে চাইছে না।

গুলি করল রানা, লোকটার দু'পায়ের মাঝখানে, সিটের গদিতে। 'পরেরটা কিন্তু বিচি গালিয়ে দেবে,' হুমকি দিল ও।

সাহস হারিয়ে ফেলেছে টাকমাথা, হ্যাণ্ডস্ আপের ভঙ্গিতে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। 'প্লিজ, মারবেন না আমাকে,' বলল সে।

'তা হলে ভাগো।' রাস্তার দিকটা দেখিয়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে পালাল ড্রাইভার। কয়েক সেকেন্ড তার পিঠের দিকে পিস্তল তাক করে রাখল রানা, তারপর উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন ভয়ে ছোটোছুটি শুরু করে দিয়েছে, সেদিকে ক্রক্ষেপ করল না ও। ড. সিদ্দিকীকে বলল, 'উঠে পড়ুন, কুইক!'

ইতিমধ্যে প্যাসেঞ্জার সিটটা খালি করে দিয়েছে রানা, ফোন-সিগারেটের প্যাকেট-লাইটার-পিস্তল সব উঠিয়ে রেখেছে ড্যাশবোর্ডের উপর; বিজ্ঞানী চড়ে বসতেই হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে আগে বাড়ল ও, সেডানের পাশে গিয়ে থামল একটু। টাকমাথা ড্রাইভারের যিপো লাইটারটা জ্বলে ছুঁড়ে দিল সেডানের তলায়। গাড়ির নীচে বৃষ্টি পৌঁছুচ্ছে না, ফুটো হয়ে যাওয়া ফিউয়েল ট্যাঙ্ক থেকে তেল পড়ে ভিজে রয়েছে। চোখের পলকে দাউ-দাউ আগুন ধরে গেল, তারপর পোড়াতে শুরু করল পুরো চেসিসটাকে।

অ্যাকসেলারেটর চেপে পন্টিয়াকটাকে সবেগে ছোটাল রানা, শপিং মলের সীমানায় পৌঁছুতেই পিছনে শুনল বিস্ফোরণের গুম গুম শব্দ—সেডানটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রিয়ারভিউ মিররে তিন অস্ত্রধারীকে দৌড়ে মল থেকে বেরুতে দেখল ও—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটু

পরেই বাঁক ঘুরল পণ্ডিত্যাক, লোকগুলো হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে ।

র‍্যাম্প ধরে আবার হাইওয়েতে উঠে এল রানা, উত্তর দিকে ছুটছে। পিছনদিকে খেয়াল রাখল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু নতুন কোনও গাড়ি নিয়ে তাড়া করে এল না কেউ। মনে হচ্ছে অবশেষে খসানো গেছে হামলাকারীদের।

জোরে জোরে দম ফেলছেন ড. সিদ্দিকী, এক হাতে খামচে ধরে রেখেছেন বুকটা। রানা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে আপনার? হার্ট অ্যাটাক নয় তো?’

‘না,’ মাথা নাড়লেন বিজ্ঞানী। ‘দম ফুরিয়ে গেছে... বুক ব্যথা করছে তাই।’

‘এটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলেন? শরীরের একটু যত্ন নেন না কেন?’

‘কখনও ছাই ভেবেছি নাকি যে এভাবে প্রাণ নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করতে হবে?’

‘এখন থেকে ভাবুন। পরিচয় যদি সত্যি পাল্টাতে চান, তা হলে শুকাতে হবে আপনাকে। মোটা মানুষের দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।’

‘শুকাব—কথা দিচ্ছি।’

‘গুড,’ বলে হাসল রানা। আড়চোখে লক্ষ করল, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বিজ্ঞানীর, তবে ভেজা কাপড়ের কারণে ঠাণ্ডায় কাঁপছেন। ওর নিজেরও শীত করছে। তাই বলল, ‘হিটারটা বাড়ান... যতটা সম্ভব। শরীর গরম করা দরকার, নইলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।’

কাঁপা কাঁপা হাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ড. সিদ্দিকী। একটু পরেই আরামদায়ক উত্তাপ বেরুতে শুরু করল র‍্যায়ার থেকে।

আগুন পোহানোর ভঙ্গিতে হাত মেলে ধরলেন তিনি। রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সেডানটা পুড়িয়ে দিলেন কেন, জানতে পারি?’

‘যাতে ওটার সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতার কথা পুলিশ বা অন্য কেউ জানতে না পারে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দিলেই হতো, তবে তার সময় পাইনি বলে আগুনটাই একমাত্র বিকল্প ছিল। তা ছাড়া আগুনটা লোকজনের নজর ফেরাতেও কাজে লেগেছে।’

‘আপনার দেখছি সবদিকেই সতর্ক দৃষ্টি!’ প্রশংসার সুরে বললেন ড. সিদ্দিকী।

‘পেশাগত ট্রেনিং,’ সংক্ষেপে বলল রানা।

‘তারপরও... যেভাবে একটার পর একটা কাণ্ড ঘটালেন... সাধারণ কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। আপনি খুব দুঃসাহসী মানুষ।’

বিব্রত বোধ করল রানা। ‘লজ্জা দেবেন না, আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি...’

কথা শেষ হলো না ওর, বেরসিকের মত বেজে উঠল ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা টেকো ড্রাইভারের সেলফোনটা। বিরক্তিকর রিংটোন—নাকী সুরে গান গাইছে হাল-সময়ের এক টিনেজ গায়িকা। ভুরু কুঁচকে ফোনটার দিকে তাকাল গাড়ির দুই আরোহী। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ওরা, তারপর রানা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সেটটা।

‘ধরার কোনও দরকার আছে?’ অস্বস্তি নিয়ে বললেন সিদ্দিকী। ‘ফোনটা তো আমাদের নয়।’

‘আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কলটা আমাদেরই জন্যে,’ বলল রানা। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য হাসল একটু। ‘তা

ছাড়া এই বিশ্রী গানটা থামানোর জন্যে হলেও কলটা রিসিভ করা দরকার।’

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী।

অ্যাপার বাটন টিপে সেলফোনটা কানে ঠেকাল রানা।
‘ইয়েস? লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড ডিপার্টমেন্ট।’

‘কী!’ ওপাশের লোকটা যেন একটু চমকে গেল।

‘হারানো একটা কালো পণ্ডিয়াকের খোঁজ চান তো? লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড ডিপার্টমেন্ট ছাড়া আর কোথায় ফোন করবেন?’

‘হুঁ, দেখা যাচ্ছে আমি একজন বাক্যবাগীশের সঙ্গে কথা বলছি,’ খসখসে ভারী কণ্ঠস্বর, ‘যে একই সঙ্গে আস্ত নির্বোধ!’

‘সেই নির্বোধের হাতেই ঘোল খেয়ে বেড়াচ্ছ?’ বিদ্রূপ করল রানা। ‘তা হলে তোমাদের কী বলব—উজবুক, নাকি গাড়ল?’

অপমানটা গায়ে মাখল না লোকটা। ‘স্বীকার করছি, নিজেদের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে আমাদেরটা নিয়ে পালানো... কৌশল হিসেবে মন্দ ছিল না। তবে এটুকু সাফল্যেই খুশি হয়ে উঠেছ দেখে বুঝতে পারছি তুমি একটা নির্বোধ। আমরা কে, সে-ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণাই নেই। ভেবেছ এত অল্পে হার মানব আমরা? কক্ষনো না! কোথাও পালাবার উপায় নেই তোমার, মিস্টার’। আমরা আসতেই থাকব।’

‘আমিও অপেক্ষায় থাকব,’ কঠিন গলায় বলল রানা।
‘তোমাদের চিনি না বলে ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু তোমরাই কি চিনেছ আমাকে?’

‘হাহ্!’ অবজ্ঞা প্রকাশ পেল ফোনে। ‘নাম জানি না, তবে তুমি কে হতে পারো—সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের। পুলিশ-টুলিশ নও সেটা বোঝাই যাচ্ছে, হলে প্রাইভেট সিকিউরিটির-ই কেউ হবে, তা-ই না? সিদ্দিকী ভাড়া

করেছে তোমাকে... একজন বডিগার্ড, রাইট?’

‘বাহ্, তোমার অনুমানশক্তি দেখে আমি মুগ্ধ!’ টিটকিরি মারার সুরে বলল রানা। ‘মগজটা এত উর্বর করেছ কী করে? নিয়মিত গোবর ঢালো মাথায়?’

‘শোনো মি. বডিগার্ড,’ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লোকটা, বহু কষ্টে রাগ সামলাচ্ছে, ‘বিরাত ভুল করছ তুমি। বুঝতে পারছি, ড. সিদ্দিকী তোমাকে আসল ঘটনা কিছুই বলেনি। কীসের মধ্যে নাক গলিয়ে বসেছ, সেটা বুঝতে পারছ না তাই। এখনও সময় আছে, সরে দাঁড়াও। বিজ্ঞানীর বাচ্চাটাকে তুলে দাও আমাদের হাতে।’

‘বার বার বডিগার্ড-বডিগার্ড বলে আমাকে ছোট করছ তুমি,’ বিরক্ত গলায় বলল রানা। ‘খুব অপমানিত বোধ করছি। ড. সিদ্দিকীকে চাইলে এখন আমার পা ধরতে হবে তোমাকে।’

‘কী বললি!’ আর সহ্য হলো না লোকটার, তুই-তোকোরিতে নামিয়ে এনেছে সম্বোধন। ‘শালা দু’টাকার বডিগার্ড, আমাকে বলে কি না পায়ে ধরতে! তোকে যদি আমি...’ মুখ দিয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুটল তার।

‘থামো!’ বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল শত্রুপক্ষের লোকটা, পরমুহূর্তে বিস্মিত হয়ে ভাবল—ব্যাপার কী? সামনাসামনি নয়, টেলিফোনে ভেসে এসেছে কণ্ঠটা... তারপরও এভাবে তার বুক কেঁপে উঠল কেন? কে এই দেহরক্ষী?

‘...আর যদি একটাও বাজে কথা বলো,’ শীতল গলায় বলল রানা, ‘তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি। ড. সিদ্দিকীর আশপাশেও যেন না দেখি তোমাদের। বুঝেছ?’

‘ইউ আর আ ডেড ম্যান, স্ট্রেঞ্জার,’ থমথমে গলায় বলল

ফোনের লোকটা। ‘নিজের মৃত্যু-পরোয়ানা সই করেছে তুমি...’

‘এসব সস্তা হুমকি অন্য কোথাও গিয়ে ঝাড়ে। ত্রিসীমানায় যদি দেখি তোমাদের, পরোয়ানাটা উল্টো তোমাদের নামেই জারি হবে। মাথায় রেখো কথাটা। গুড বাই!’

লাইন কেটে দিল রানা, তারপর ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে... পাশ দিয়ে যেতে থাকা একটা পিকআপ ট্রাকের পিছনে। ড. সিদ্দিকী অবাক হয়ে বললেন, ‘ফেলে দিলেন কেন?’

‘আপনার বন্ধুরা খোশগল্পের জন্য ফোন করেনি,’ রানা বলল। ‘নতুন এসব সেটের সঙ্গে বার্গলারি-প্রোটেকশনের জন্য ট্র্যাকার থাকে। অনুসরণ করবার আগে তাই শিয়োর হতে চাইছিল, জিনিসটা আমাদের সঙ্গে আছে কি না।’

হেসে উঠলেন বিজ্ঞানী। ‘কোনও কিছুই দেখি আপনার নজর এড়ায় না! শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, ড্রাইভারটাকে ছেড়ে দিলেন কেন?’

‘অকারণে মানুষ খুন করি না আমি,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘গাড়িটা দখলের জন্য ওকে খুন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।’

বৃষ্টিটা কমে এসেছে। পকেট থেকে নিজের সেলফোন বের করে সোহানাকে ‘রিং দিল রানা।

‘কোথায় তুমি?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন এল। ‘দশ মিনিট পরেই ফোন করতে বলেছিলাম না?’

‘সরি, ফেউ খসাতে দেরি হয়ে গেল,’ রানা বলল। ‘গাড়িও বদলেছি। আমরা এখন একটা কালো পণ্ডিয়ারকে।’

‘টেটারবোরোর হলিডে ইন-এ পৌঁছতে পারবে? এয়ারপোর্টের পাশেই হোটেলটা, জাকির অপেক্ষা করবে অন্তর্ধান-১

ওখানে ।’

‘আশা করি পারব । ই.টি.এ. বিশ মিনিট—বলে দাও ওকে ।’

‘ঠিক আছে ।’

দশ

টেটারবোরো এয়ারপোর্ট থেকে হলিডে ইনের দূরত্ব মাত্র আধ মাইল, রানওয়েতে উঠতে-নামতে থাকা বিমানের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যায় । রুট সেভেনটিন ধরে কালো পটিয়াকটা যখন ওখানে পৌঁছল, তখন অবশ্য উৎপাতটা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে—বিরূপ আবহাওয়ায় প্লেনের ওঠানামা কম হবার কারণে । আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না । বৃষ্টি ইতিমধ্যেই ইলশেগুঁড়িতে পরিণত হয়েছে, বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম খুব শীঘ্র শুরু হয়ে যাবে ।

হোটেলের কারপোর্টে সটান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখাপ্রধানকে—হাঁটু-পর্যন্ত লম্বা একটা ওভারকোট পরেছে, হাতদুটো ঢুকিয়ে রেখেছে পকেটে । নিঃসন্দেহে পিস্তল ধরা আছে মুঠিতে, হাবভাবে সতর্ক ভাবটা লুকাতে পারছে না । উত্তেজনাও ফুটে রয়েছে চেহারায় ।

ঠিক জাকিরের পাশে গিয়ে গাড়ি থামাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধূসর রঙের ভ্যান হাজির হলো কোথেকে যেন, পণ্ডিয়াকের রিয়ার-এণ্ডের ছ'ইঞ্চি তফাতে এসে দাঁড়াল। ব্যাপারটা লক্ষ করে আতঙ্ক ফুটল ড. সিদ্দিকীর চেহারায়ে।

‘রিল্যাক্স,’ বলল রানা। ‘এরা আমাদেরই লোক।’

বিজ্ঞানীকে অভয় দিলেও আড়চোখে রিয়ারভিউ মিররে চোখ বোলাল ও, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে নিরাপত্তার ব্যাপারে। ভ্যানটা রানা এজেন্সির হলেও ভিতরে অন্য লোক থাকতে পারে।

উদ্ভিগ্ন হবার মত কিছু অবশ্য দেখতে পেল না রানা, ভ্যানের ভিতর পরিচিত তিনটে মুখই রয়েছে—অন্য কেউ না। তিনজন পুরুষ... সবাই রানা এজেন্সির বিশ্বস্ত অপারেটর। গাড়িটার উপস্থিতিও স্বাভাবিক, ইমার্জেন্সির জন্য টেটারবোরো এয়ারপোর্টের পাশে একটা রেন্টাল এজেন্সির তত্ত্বাবধানে সবসময় রাখা হয় ওটা। বলা বাহুল্য, রেন্টাল এজেন্সিটাও ওদেরই।

একটু অপেক্ষা করল রানা, আগে ভ্যানের আরোহীদের নামতে দিল; পণ্ডিয়াকের ইঞ্জিন চালু রেখেছে, কোথাও গোলমাল দেখলে যেন চট করে সটকে পড়তে পারে।

ভ্যান থেকে নেমে একটু দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিল তিন অপারেটর। জাকির বলল, ‘অল ক্লিয়ার, মাসুদ ভাই।’

মাথা ঝাঁকাল রানা, ড. সিদ্দিকীকে ইশারা করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

‘ডক্টর, এ হচ্ছে জাকির হোসেন—আমার এজেন্সির নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চের ইনচার্জ।’ পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

‘কথা হয়েছে আমাদের,’ বলে হাত মেলালেন বিজ্ঞানী।

‘কেমন আছেন আপনি?’ সৌজন্যসূচক হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল জাকির।

‘আধ ঘণ্টা আগের চেয়ে অনেক ভাল,’ নার্ভাস ভঙ্গিতে পাল্টা হাসলেন সিদ্দিকী।

বাকি তিনজনের সঙ্গেও পরিচয় করাল রানা। ‘আফতাব, শামস, আর জয়... এরাও এজেন্সির অপারেটর।’

একে একে সবাই করমর্দন করল বিজ্ঞানীর সঙ্গে। কুশল বিনিময় শেষ হতেই কাজের কথায় এল রানা। ‘মনসুর আর ওর টিম কোথায়?’

রানা এজেন্সির চার সদস্য বিশিষ্ট উইটনেস প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট টিমের প্রধান মনসুর আহমেদ, ওদের ব্যাপারেই জানতে চাইছে ও।

‘সেফ-সাইটে,’ জানাল জাকির। ‘ড. সিদ্দিকীর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে ওরা।’

‘ওখানে যাব কীভাবে আমরা?’

‘যে-হেলিকপ্টারটা নিয়ে এসেছি, ওটায়। এয়ারপোর্টে রাখা আছে কপ্টারটা, টেকঅফের জন্য তৈরি।’

‘গুড,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘তার আগে গাড়িটার ব্যবস্থা নিতে হবে। এটায় লোকেশন ট্রান্সমিটার থাকতে পারে।’

‘সরিয়ে ফেলছি এখনি।’

‘তার আগে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলতে হবে,’ বলল রানা। ‘সামনের সিটে ছিলাম আমরা সারাক্ষণ, তারপরও ঝুঁকি নিয়ো না। ভিতরের পুরোটা ভাল করে পরিষ্কার করো।’

‘ঠিক আছে। আফতাব!’ ডাকল জাকির। ‘শামসকে নিয়ে ব্যবস্থা করো পণ্ডিয়াকটার। জয় আমাদের সঙ্গে ভ্যানে যাবে।’

‘ড্যাশবোর্ডের উপর একটা পিস্তল পাবে,’ রানা বলে দিল। ‘ওটার সিরিয়াল নম্বর ট্রেস করতে পারো কি না দেখো। আমাদের উপর যারা হামলা করেছিল, ওদের নাম-পরিচয় জানা দরকার।’

‘জী, মাসুদ ভাই,’ বলে পণ্ডিয়াকে চড়ে বসল আফতাব আর শামস, চলে গেল গাড়িটা নিয়ে।

‘আসুন,’ বলল জাকির, রানা ও ড. সিদ্দিকীকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল ভ্যানে। জয় ইতিমধ্যে ড্রাইভিং সিটে আসন নিয়েছে, যাত্রীরা চড়তেই স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে, রওনা হয়ে গেল এয়ারপোর্টের দিকে।

ভ্যানের পিছনদিকটা বেশ প্রশস্ত, সার্ভেইলান্সের জন্য নানা রকম ইকুইপমেন্টে সাজানো। তারপরও গদিমোড়া সিটগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে হাত-পা ছড়ানো যায়। আরাম করে বসল রানা ও ড. সিদ্দিকী। একটা কফিপট আছে পিছনে, সেখান থেকে স্টাইরোফোমের দুটো ডিসপোজেবল কাপে কফি ঢেলে দিল জাকির। আয়েশ করে চুমুক দিল ওরা।

কারে হিটার চলছিল, কিন্তু ড. সিদ্দিকীর শরীর পুরোপুরি গরম হয়নি। এখনও শীতে কাঁপছেন ভদ্রলোক। ব্যাপারটা লক্ষ করে জাকির বলল, ‘একটু অপেক্ষা করুন, কন্সটারে ওঠার আগেই শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করব।’

রানাও একটু একটু কাঁপছে, তবে ঠাণ্ডার কারণে নয়, অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে। অনেকগুলো বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে ওকে বিকেল থেকে, নার্ভগুলোকে এ-কাজে শক্তি জুগিয়েছে অ্যাড্রেনালিন। ডেক্সেড্রিন নামে একটা ওষুধ দিয়ে শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক করে নেয়া যায়, জাকির দিতেও চাইল, কিন্তু রাজি হলো না ও। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, শরীর

তার নিজস্ব নিয়মেই শান্ত করুক নার্সগুলোকে ।

একটু পরেই টেটারবোরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ভ্যান । কর্পোরেট আরোহীদের জন্য নির্ধারিত গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল সরাসরি টারমাকে, টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে দুশো গজ দূরের একটা হ্যাঙ্গারের সামনে গিয়ে থামল । ওখানেই রয়েছে রানা এজেন্সির নিজস্ব বেল্ ২০৬-এল হেলিকপ্টারটা ।

বেশি সময় নষ্ট করল না ওরা, করার প্রয়োজনও হলো না । প্রাইভেট ফ্লাইট অপারেট করা হয় বলে টেটারবোরোতে সিকিউরিটি চেকআপ তেমন কড়া নয়, ডমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য ফর্মালিটি আরও কম । বিশেষ করে হেলিকপ্টারের জন্য কাণ্ডজে ক্লিয়ারেন্স ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না । হ্যাঙ্গারে কয়েক মিনিট থাকল ওরা শুধু ভেজা কাপড় পাল্টে পাইলটদের শুকনো কভারঅল পরতে, তারপরই উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ওড়ার অনুমতি দেয়া হলো । জয় হয়ে গেল ভ্যানের সঙ্গে, কপ্টার চালনার দায়িত্ব নিল জাকির । রানা বসল পাশে, আর ড. সিদ্দিকী পিছনে । তিনজনকে নিয়ে টেকঅফ করল বেল ২০৬-এল, হাডসন নদী নীচে রেখে উত্তরদিকে উড়ে চলল ।

বৃষ্টি থেমে গেছে পুরোপুরি, আকাশ ফকফকে পরিষ্কার । স্বচ্ছন্দে যাচ্ছে কপ্টারটা । মিনিট পনেরো পরেই বাঁয়ে উদয় হলো নিউ জার্সি প্যালিসেডস্—হাডসন রিভারের পশ্চিম তীরের বিখ্যাত ব্যাসল্ট পর্বতশ্রেণী । শেষ বিকেলের আলোয় রঞ্জিত হয়ে আছে বৃষ্টিস্নাত চূড়াগুলো... ঝলমল করছে । দৃশ্যটা অপূর্ব সুন্দর । তবে প্রকৃতির মোহময় রূপে মোটেই মুগ্ধ হচ্ছেন না ড. আন্দালিব সিদ্দিকী, এখনও সিঁটিয়ে রয়েছেন তিনি । কারণটা জানতে চাইল রানা ।

‘ভয় করছে,’ সোজাসাপ্টা ভাষায় স্বীকার করলেন বিজ্ঞানী ।
‘কেউ যদি গুলি করে হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ করায়?’

‘দুশ্চিন্তার কিছু নেই,’ পাইলটের সিট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল জাকির । ‘আমাদের এই হেলিকপ্টার যে-সে জিনিস নয় । বডিটা আর্মার-প্লেটেড; জানালা আর উইণ্ডশিল্ডে যে-প্লেস্কিগ্লাস দেখছেন, ওগুলোও বুলেটপ্রুফ । না হলেও ক্ষতি ছিল না । ঘণ্টায় সর্বোচ্চ একশ’ সাতাশ মাইল স্পিডে ছুটতে পারে এটা, এই গতির একটা কপ্টারে গুলি লাগানো খুব কঠিন । রীতিমত অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফট গান লাগবে । ধাওয়া করেও সুবিধে করতে পারবে না । টানা তিন ঘণ্টা উড়তে পারি আমরা, ফিউয়েল শেষ হবার আগেই সাড়ে তিনশ’ মাইল চলে যেতে পারব ।’

‘যদি রকেট ছোঁড়ে?’ সন্দেহ দূর হচ্ছে না ড. সিদ্দিকীর ।

‘তেমন কোনও ঝুঁকি দেখলে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় চলে যেতে পারব,’ হাসল জাকির । ‘দেখতেই পাবে না, রকেট তাক করবে কীভাবে?’

‘বুঝতেই পারছেন—ভয়টা অমূলক,’ রানা যোগ করল । ‘অত্যন্ত সফিসটিকেটেড কপ্টার এটা, স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার করে । আমরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, ওদের অনেক কাজ বিনে পয়সায় করে দিয়ে নিজেদের জন্যে একটা জোগাড় করেছি ।’

‘কী জানি!’ সিটে হেলান দিলেন সিদ্দিকী । ‘মনে সাহস পাচ্ছি না কিছুতেই ।’

‘দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে মনটা খালি করে ফেলুন । তা হলেই দেখবেন ভয় কেটে যাচ্ছে । অটোসাজেশন কীভাবে দিতে হয়, জানেন তো? এ-ধরনের পরিস্থিতিতে খুব কাজে লাগে ওটা ।’

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন সিদ্দিকী, তারপর চোখ মুদে ফেললেন ।

খানিক নীরবতা বিরাজ করল ককপিটে। শেষে নিউয়ার্কে কী ঘটেছে, সেটা জানতে চাইল জাকির। ফিরে গিয়ে ওকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট পাঠাতে হবে ঢাকায়।

সব খুলে বলল রানা। নতুন ড্রাগের কথা, ড্রাগলর্ড মিণ্ডয়েল সান্টানার কথা, ওদের উপর হামলার বিবরণ... সব। ওর কথা শেষ হলে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জাকির। বলল, ‘হাইডআউটের খোঁজ ব্যাটম্যান পেল কী করে?’

‘অনেকভাবেই পেতে পারে,’ রানা আন্দাজ করল। ‘ডক্টর সিদ্দিকীর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টে খুঁত ছিল হয়তো। দু’সপ্তাহ ছিলেন ওখানে, এর মধ্যে খাবার-দাবার কিনতে দু’একবার বাইরে গেছেন নিশ্চয়ই। তখনই হয়তো চোখে পড়ে গেছেন।’

‘হুম, সেটাই হবে বোধহয়,’ বলে উঠলেন ড. সিদ্দিকী। ‘গত পরশু ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলাম আমি, ফার্মেসিতে কয়েকটা লোক কেমন দৃষ্টিতে যেন তাকাচ্ছিল আমার দিকে।’

‘ছদ্মবেশ নিয়ে যাননি?’

‘চেহারা কীভাবে পাল্টাতে হয়, তার কিছুই জানি না আমি।’

‘কপাল ভাল আপনার,’ জাকির বলল। ‘এত বড় একটা ভুল করার পরও বেঁচে আছেন!’

‘মি. রানার কল্যাণে,’ কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন সিদ্দিকী। ‘সত্যি, আপনি একেবারে ঠিক সময়মত হাজির ছিলেন আমার পাশে। কীভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব...’

‘ধন্যবাদ দিতে হবে না, আপনারই মত আমিও একজন বাঙালী,’ রানা বলল। আগামীতে আর একটু সাবধান থাকবেন, তা হলেই হবে। ট্রেইনিঙের সময় কিছু নিয়ম শিখিয়ে দেব, ওগুলো মেনে চললে সহজে নজর এড়াতে পারবেন সবার।’

‘ট্রেইনিং!’

‘হ্যাঁ। রিলোকেশনের আগে সাবজেক্টদের একটা ছোটখাট কোর্স করতে হয়—নতুন পরিচয়ে অভ্যস্ত হতে, সেই সঙ্গে সতর্কতামূলক কিছু টেকনিক শেখার জন্যে। আপনাকেও করতে হবে ওটা।’

‘কোথায় হবে এই ট্রেইনিং?’

‘কোথায় আবার,’ হাসল রানা, ‘যেখানে আপনি যাচ্ছেন... সেই সেফ-সাইটে!’

হাডসন রিভার ধরে দুইশ’ মাইল উত্তরে গেল হেলিকপ্টার, পেরিয়ে গেল একের পর এক নদীতীরবর্তী জনপদ আর ছোট ছোট শহর। কিংস্টন পেরুতেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো দিগন্তবিস্তৃত ক্যাটস্কিল পর্বতমালা আর পাদদেশের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। সন্ধে নেমে এসেছে ইতিমধ্যে, আকাশের গায়ে ঠায় দাঁড়ানো পাহাড়কে মনে হচ্ছে পৌরাণিক কোনও দৈত্য। নীচে জঙ্গল নয়, যেন মুঠো মুঠো অন্ধকার ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সাদাটে এক চিলতে শূন্যতা... আসলে ওগুলো পাহাড়ি উপত্যকা। উপর থেকে পরিবেশটা ভৌতিক ঠেকছে।

খানিক পরেই ভুরু কুঁচকে গেল রানার। উত্তর দিকের একটা রিজের আড়াল থেকে পাক খেয়ে উঠছে ধোঁয়া, লালচে আভাও দেখা যাচ্ছে। জাকিরের কাঁধে টোকা দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল ও।

‘ড্রাই স্প্রিং ওটা,’ বলল জাকির, ‘বজ্রপাতে আগুন ধরেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কমিউনিকেশন শুনতে পাচ্ছি রেডিওতে। চিন্তার কিছু নেই, মাসুদ ভাই। আগুনটা ছোট, ওরা মোটামুটি অন্তর্ধান-১

নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে। এদিকে প্রায়ই ঘটে এমনটা।’

আর পাঁচ মিনিট পরেই ও ঘোষণা করল, ‘লোকেশনে পৌঁছে গেছি, মাসুদ ভাই।’

রানা জিজ্ঞেস করল, ‘আমাদের আশপাশে আর কোনও এয়ারক্র্যাফট আছে?’

অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে সজ্জিত হেলিকপ্টারে একটা শক্তিশালী রেইডার সিস্টেমও আছে। ওটার ডিসপ্লেতে চোখ বোলাল জাকির। বলল, ‘জী না, মাসুদ ভাই।’

‘ওড, তা হলে নামতে শুরু করো।’

জানালা দিয়ে নীচে উঁকি দিলেন ড. সিদ্দিকী—ছোট্ট একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, ফার গাছে ভর্তি। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। বিস্মিত গলায় তিনি বললেন, ‘নামছেন কোথায়? ওখানে তো জায়গাই নেই!’

জবাব দিল না জাকির, কপ্টারটাকে ল্যাণ্ড করাতে ব্যস্ত ও। আনুভূমিকভাবে নীচে নামতে শুরু করেছে যান্ত্রিক ফড়িংটা।

‘করছেন কী!’ শঙ্কিত গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘গাছের সঙ্গে বাড়ি খাবেন তো!’

‘তা-ই?’ হেসে উঠল জাকির। কনসোলের একটা বোতাম টিপে বলল, ‘এবার নীচে তাকান তো।’

হঠাৎ নড়ে উঠতে দেখা গেল গাছপালার একটা অংশকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ড. সিদ্দিকী দেখলেন, প্রায় ত্রিশ বর্গগজ জায়গা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে... সেখানটায় উঁকি দিচ্ছে ধূসর রঙের কংক্রিট। কিছু বুঝতে না পেরে মুখ তুললেন তিনি, জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকালেন দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে।

‘অত্যন্ত সফিসটিকেটেড একটা ক্যামোফ্লাজ নেট ওটা,’ মৃদু হেসে বলল রানা, ‘উপর থেকে দেখতে গাছপালার মত মনে

হয়। একেবারে কাছে না গেলে টেরই পাবেন না কিছু।’

‘ইম্প্রসিভ!’ স্বীকার করলেন বিজ্ঞানী।

কংক্রিটের ল্যাণ্ডিং প্যাডে এসে নামল কপ্টার, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জাকির। সিটবেল্ট খুলে নেমে এল ওরা তিনজন। বামদিকের কয়েকটা গাছের আড়ালে একটা কন্ট্রোল প্যানেল আছে, ওটার দিকে এগিয়ে গেল জাকির। সুইচ টেপার আগে একটু অপেক্ষা করল—ইঞ্জিন বন্ধ হলেও এখনও কপ্টারের পাখাগুলোর ঘূর্ণন থামেনি। ওগুলো পুরোপুরি স্থির হবার আগে ল্যাণ্ডিং প্যাড ঢাকবার চেষ্টা করলে ডাউনড্রাফট ক্যামোফ্লাজ নেটটাকে রোডের উপর টেনে এনে ফালি ফালি করে দিতে পারে।

একটু পরেই সুইচ টিপল জাকির। মোটরের মৃদু গুঞ্জন উঠল, ল্যাণ্ডিং প্যাড আর হেলিকপ্টারটা ঢাকা পড়ে যেতে শুরু করেছে। মোটরাইজড পোলের ডগায় আটকানো আচ্ছাদনটা ফিরে আসছে খোলা জায়গায়, মাথার উপর থেকে আড়াল করে দিচ্ছে আকাশকে।

‘রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমেও অপারেট করা যায় নেটটা,’ ফিরে এসে ড. সিদ্দিকীকে বলল জাকির। ‘কপ্টারের ভিতরে সুইচ আছে, ওটা দিয়েই খুলেছিলাম তখন। রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমটার সঙ্গে ‘আবার একটা অটোমেটিক সেন্সর আছে। ওটার সাহায্যে শীতকালে মাঝে মাঝে আপনাআপনিই খোলে আর বন্ধ হয় এই নেট—তুষারের ভারে যাতে ছিঁড়ে না পড়ে, সেজন্যে। ল্যাণ্ডিং প্যাডের কংক্রিটে হিটিং কয়েল আছে, তুষার গলিয়ে ফেলে। তাই হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করাতে অসুবিধে হয় না।’

‘এতসব আয়োজন কীসের জন্য?’ জিজ্ঞেস করলেন অন্তর্ধান-১

সিদ্ধিকী ।

‘আপনার মত কেস হ্যাণ্ডেল করবার জন্যে,’ হেসে বলল রানা । ‘এটা আমাদের সেফ-সাইট । কাউকে লুকানোর জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর দ্বিতীয়টি নেই ।’

‘এখানেই থাকতে হবে আমাকে বাকি জীবন?’ ভুরু কোঁচকালেন বিজ্ঞানী ।

‘না, না । এখানে থাকবেন কেন? এটা আপনার সাময়িক আশ্রয় ।’

দু’বছর আগে, এফবিআই যখন রানা এজেন্সিকে উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রাম-এ অন্তর্ভুক্ত করল, তখনই দেখা দিয়েছিল প্রয়োজনটা । রিলোকেশনের আগে সাবজেক্টদের কিছুদিন এজেন্সির দায়িত্বে রাখতে হয়—নতুন কাগজপত্র তৈরি, সেই সঙ্গে সাবজেক্টদের নতুন চেহারা ও পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে । ওদের পুরনো সেফ-হাউসগুলো এ-কাজের জন্যে পুরোপুরি উপযুক্ত ছিল না । তাই নিখুঁত নিরাপত্তার জন্যে সভ্যতাবিবর্জিত, বিরান এলাকায় একটা নতুন সেফ-সাইট দরকার হয়ে পড়ল । অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্যাটস্কিল পর্বতমালার পাদদেশের এ-জায়গাটা লিজ নেয়া হয়েছে । এটার সঙ্গে রানা এজেন্সির কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাবে না কেউ, লিজটা নেয়া হয়েছে অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের নামে । লোকেশনটাও চমৎকার—প্রায় একই চেহারার আরও বেশ কয়েকটা উপত্যকা রয়েছে আশপাশে, সেফ-সাইটটার পিনপয়েন্ট লোকেশন বের করা সহজসাধ্য নয় । ক্যামোফ্লাজ নেটের কারণে সাইটটা অদৃশ্যও থাকে । জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়ার পথ রয়েছে, তবে নিতান্ত বাধ্য না-হলে ওটা ব্যবহার করা হয় না । চলাচলের চিহ্ন দেখে যাতে সাইটের

খোঁজ পাওয়া না যায়, তাই এ সতর্কতা। সাধারণত হেলিকপ্টারই ব্যবহার করা হয় যাতায়াতের জন্য, সেটাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। অত্যাধুনিক রেইডারের মাধ্যমে আগে নিশ্চিত করা হয়—আশপাশে অন্য কোনও এয়ারক্র্যাফট আছে কি না। কেবলমাত্র ক্যামোফ্লাজ নেটের অস্তিত্ব ফাঁস হবার আশঙ্কা না থাকলেই ল্যাণ্ড করে হেলিকপ্টার।

ল্যাণ্ডিং প্যাডের এক পাশ থেকে চারজন মানুষকে উদয় হতে দেখা গেল হঠাৎ। তিন হেলিকপ্টার আরোহীর সামনে এসে থামল তারা, অভিবাদন জানাল।

‘কেমন আছ তোমরা, মনসুর?’ হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ভাল, মাসুদ ভাই,’ প্রত্যুত্তর দিল মনসুর আহমেদ। ‘ও উইটনেস প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট টিমের লিডার। রানার নিজের হাতে গড়া এজেন্ট ও। ‘অনেক দিন পর দেখা হলো আপনার সঙ্গে।’

‘হ্যাঁ। এসো পরিচয় করিয়ে দিই।’ বিজ্ঞানীকে দেখাল ও। ‘ইনিই ড. আন্দালিব সিদ্দিকী—তোমাদের নতুন সাবজেক্ট। ডক্টর, এ হচ্ছে মনসুর আহমেদ—আমাদের স্পেশালিস্ট টিমের লিডার।’ বাকিদের দেখাল এবার। ‘মারুফ আজাদ, সেকেণ্ড ইন কমান্ড। রফিক নওশাদ আর শাহরিয়ার আলম—টিম মেম্বার।’

একে একে সবার সঙ্গে হাত মেলালেন ড. সিদ্দিকী। বললেন, ‘চমৎকার সেটআপ আপনাদের। বিশেষ করে ক্যামোফ্লাজটার তো জবাব নেই।’ উপরদিকটা দেখালেন তিনি।

‘এগুলো সব আসলে মাসুদ ভাইয়ের আইডিয়া,’ বলল মনসুর। ‘এই সাইটের খুঁটিনাটি সব উনিই ঠিক করেছেন।’

‘আগেই অনুমান করা উচিত ছিল আমার,’ হাসলেন সিদ্দিকী। ‘তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হেলিকপ্টারটা নাহয় খালি চোখে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু হিট সিগনেচার লুকানোর কী ব্যবস্থা করেছেন আপনারা?’

‘আপনি হিট সিগনেচার সম্পর্কে জানেন?’ একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল মনসুর।

‘অবশ্যই। এ তো পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্র—সব বস্তুই তাপ বিকিরণ করে। ইনফ্রা-রেড সেন্সরে ধরা পড়ে সেটা। সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট নিয়ে যদি একটা এয়ারক্রাফট কাছাকাছি চলে আসে, তা হলে তো আপনাদের হেলিকপ্টারটাকে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবে। ক্যামোফ্লাজ নেট কোনও কাজে আসবে না।’

‘আপনি হাইটেক মিলিটারি ইকুইপমেন্টের কথা বলছেন, ডক্টর,’ রানা বলল। ‘আপনার শত্রু... মানে, কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ডের কাছে ওই জিনিস থাকার কথা নয়।’

‘তারপরেও... একটা ডিফেন্সিভ সিস্টেম থাকা ভাল না?’

ভুরু কঁচকাল রানা। ‘আপনি কি মিলিটারি অ্যাসল্টের আশঙ্কা করছেন? সেক্ষেত্রে এই সাইট পাণ্টে অন্য কোথাও যেতে হবে আমাদের।’

‘না, না,’ তাড়াতাড়ি বললেন সিদ্দিকী। ‘আমি স্রেফ সিকিউরিটির খুঁত আছে কি না, সেটা জানার চেষ্টা করছি।’

‘আমাদের সিকিউরিটি নিখুঁত—এ দাবি করব না। আসলে টোটাল সিকিওর্ড লোকেশন বলে কিছু নেই, ডক্টর,’ বলল রানা। ‘এমনকী শাইয়েন মাউন্টেনে আমেরিকানদের মিলিটারি কমাণ্ড সেন্টারও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। জায়গামত একটা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটালে পুরো পাহাড়টাই উড়ে যাবে।’

টোক গিললেন সিদ্দিকী। ‘কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়? আপনি কি ভয় দেখাতে চাইছেন আমাকে?’

‘মোটাই না,’ রানা বলল। ‘একটা উদাহরণ দেয়া হলো মাত্র। ওই নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটানো সহজ কাজ নয়, এ-কারণেই শাইয়েন মাউন্টেনকে নিরাপদ ধরা হয়। আমাদের এই সাইট-ও ওই অর্থে নিরাপদ, কারণ মিণ্ডয়েল সান্টানার পক্ষে হাইটেক মিলিটারি ইকুইপমেন্ট জোগাড় করে হামলা চালানো সম্ভব নয়।’

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী। মনে হলো, পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হতে পারেননি তিনি।

‘বাকি কথা ভিতরে গিয়ে বললে কেমন হয়?’ মনসুর বলল। ‘এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, মাসুদ ভাই?’

‘হ্যাঁ, চলো।’

‘ভিতরটা কোথায়?’ জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

উপত্যকার পশ্চিম ধারে গাছে ছাওয়া পাহাড়ি ঢাল দেখাল মনসুর। ‘ওখানে... পাহাড়ের ভিতরে আমাদের বাস্কার হাউস। সামরিক হামলা হলেও চিন্তার কিছু নেই, সার। ছোটখাট বোমাবর্ষণ ঠেকাতে পারে ওটা।’ হাসল ও।

‘অ্যা!’ ড. সিদ্দিকীর চোখে বিস্ময় ফুটল। ‘এতক্ষণ তা হলে আপনারা ভয় দেখালেন কেন আমাকে?’

‘ভয় কোথায় দেখালাম?’ রানা হাসছে। ‘আপনি নিজেই তো ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন।’

মুখ গোমড়া করে ফেললেন সিদ্দিকী।

‘আপনারা যান,’ জাকির বলল। ‘আমি হেলিকপ্টারটার রি-ফিউয়েলিং সেরে আসছি। মারুফ, সাহায্য করবে আমাকে?’

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল থ্রোটেকশন টিমের সেকেণ্ড ইন

কমাও। বিজ্ঞানীকে নিয়ে মনসুরকে অনুসরণ করল রানা। অন্যেরা রইল পিছনে।

‘এখানে ফিউয়েল পাচ্ছেন কোথেকে?’ হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

‘একটা আগরগ্রাউণ্ড-ট্যাঙ্ক আছে,’ পিছন থেকে জবাব দিল রফিক। ‘ছ’মাস পর পর রিফিল করা হয়। হেলিকপ্টারই যেহেতু এখানে যাতায়াতের মূল বাহন, ফিউয়েল না রাখলে চলে না।’

নীরব হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ত্রিশ ফুটের মত উঠল ওরা, ওখানে ঝোপঝাড় আর বোন্ডারের আড়ালে একটা কংক্রিটের তৈরি প্যাসেজওয়ে রয়েছে। সঙ্গীদের নিয়ে প্যাসেজের শেষপ্রান্তে একটা ধাতব দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মনসুর। পাশেই দেয়ালে একটা ইলেকট্রনিক নাম্বার প্যাড রয়েছে, ওটায় দ্রুত কয়েকটা সংখ্যা চাপল ও।

মৃদু শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। ওপাশে আরেকটা প্যাসেজ... আধো-অন্ধকারে ঢাকা। ভিতরে পা রাখতেই হালকা সুরে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করল। বিভ্রান্ত দেখাল ড. সিদ্দিকীকে। জিজ্ঞেস করলেন, ‘অ্যালার্ম কেন?’

‘যাতে কেউ চুপি চুপি এখানে ঢুকে পড়তে না পারে,’ হেসে জানাল মনসুর। ‘ডোরওয়েতে মোশন সেন্সর আছে, কেউ ঢুকলেই অ্যালার্ম বাজিয়ে ভিতরের লোকজনকে সতর্ক করে দেয়। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে অ্যালার্মটা নিষ্ক্রিয় করা না হলে অনুপ্রবেশকারীকে ঠেকানোর জন্য পুরো প্যাসেজটা নকআউট গ্যাসে ভরে যাবে।’

ভিতরদিককার দেয়ালে বসানো দ্বিতীয় একটা নাম্বার-প্যাডে

কোড চাপল ও । সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল অ্যালার্মের উৎপাত ।
একই সঙ্গে জ্বলে উঠল একটার পর একটা বাতি ।

মুগ্ধতা ফুটল ড. সিদ্ধিকীর চোখে । বললেন, ‘সত্যি,
আপনারা কাজ জানেন বটে!’

এগারো

প্যাসেজ ধরে ধীরে ধীরে এগোল পাঁচজনে—সবার সামনে
মনসুর, ওকে অনুসরণ করল রানা, ড. সিদ্ধিকী, রফিক আর
শাহরিয়ার । ডানদিকে বাঁক নিয়ে বড়-সড় একটা লিভিং
এরিয়ায় পৌঁছুল ওরা । জায়গাটা সুন্দর; ফ্লোরটা পালিশ-করা
ওক কাঠের, সুসজ্জিত ফার্নিচারগুলো দামি চামড়া-মোড়া ।
চারপাশের অফ-হোয়াইট দেয়াল জায়গায় জায়গায় ঢাকা
পড়েছে বুকশেলফ, ইম্প্রেশনিস্ট পেইন্টিং, আর নানা ধরনের
ফটোগ্রাফে । একপাশে বড় একটা ফায়ারপ্লেসও আছে ।

‘দারুণ জায়গা!’ প্রশংসার সুরে বললেন ড. সিদ্ধিকী ।
‘বান্ধারের কথা শুনে যা ভেবেছিলাম, তার সঙ্গে একটুও মিলছে
না ।’

‘শুধু সৌন্দর্যই দেখলেন?’ হাসল রানা । ‘আর দশটা
সাধারণ বান্ধারের চেয়ে কয়েকগুণ উন্নত এটা । মনসুর, শোনাও
ওঁকে ।’

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীর দিকে ফিরল প্রোটেকশন টিম-লিডার। ‘বাস্কারটা রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের তৈরি,’ লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ও। ‘বানানো হয়েছে পাহাড়ের চল্লিশ ফুট ভিতরে। স্ট্রাকচারটা ইনসুলেটেড, এর ফলে শীত-গ্রীষ্ম সবসময়েই ভিতরটায় বাহ্যন্তর ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা বিরাজ করে। সোলার প্যানেল আর ব্যাটারির মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাই আমরা, ইমার্জেন্সির জন্য ব্যাকআপ জেনারেটরও রয়েছে। বাস্কারের নীচে একটা কুয়ো রয়েছে, ওখান থেকে আসে বিশুদ্ধ পানি—বাইরে থেকে কেউ বিষ মিশিয়ে দিতে পারবে না। উপরদিকে একটা ভেন্টিলেশন শাফট আছে, ওটার সাহায্যে বাতাস আর সূর্যের আলো আসে। সূর্যের আলোটা আমরা আয়নার সাহায্যে ভিতরেও ব্যবহার করতে পারি।’

‘হুম, অত্যন্ত এনার্জি-এফিশিয়েন্ট ব্যবস্থা দেখছি!’ মন্তব্য করলেন ড. সিদ্দিকী। ‘কিন্তু কোনও কারণে যদি শাফটটা বন্ধ হয়ে যায়, বাতাস পাবেন কীভাবে?’

‘কার্বন-ডাই-অক্সাইড রি-সাইক্লিংয়ের একটা ছোট প্ল্যান্ট রয়েছে ভিতরে... ইমার্জেন্সির জন্য।’

‘সেটা নিশ্চয়ই বিদ্যুতে চলে? আপনাদের এন্ট্রান্সও তো ইলেকট্রনিক। যদি সোলার পাওয়ার আর ব্যাকআপ জেনারেটর... দুটোই ফেল করে, তা হলে ফাঁদে পড়ে যাবেন না?’

এবার মুখ খুলল রানা। ‘তাতেও সমস্যা নেই। ঢোকান দরজাটা ম্যানুয়ালি অপারেট করা যায়। এ ছাড়া একটা ইমার্জেন্সি একজিটও রয়েছে।’

‘কোথায়?’

আঙুল তুলে লিভিং এরিয়ার অপরপ্রান্তে দ্বিতীয় একটা

দরজা দেখাল ও। বলল, ‘সিকিওর্ড একজিট বলতে যা বোঝায়, দরজাটা তা-ই। ওটা ব্যবহার করে ঢুকতে পারবে না কেউ, কারণ বাইরে থেকে খোলার কোনও উপায় নেই ওটা, ওপাশে হাতল-টাতল কিচ্ছু নেই। খোলা-বন্ধ... সব ভিতর থেকে করতে হয়।’

‘আরিব্বাপ! অ্যারেঞ্জমেন্ট তো দেখছি খুবই চমৎকার,’ মন্তব্য করলেন ড. সিদ্দিকী। ‘একটু স্বস্তি পাচ্ছি আমি এখন।’

‘এখনও উত্তেজিত হয়ে আছেন তো!’ বলল রানা। ‘খাওয়াদাওয়া করে একটা ঘুম দিন, জেগে ওঠার পর দেখবেন শুধু স্বস্তি আর স্বস্তি।’

হেসে ফেললেন বিজ্ঞানী। ‘কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমার খিদেও পেয়েছে।’

পিছনদিকে ফিরল রানা। ‘শাহরিয়ার, রান্নাবান্না কি এখনও তুমিই করছ?’

‘না করে উপায় আছে?’ কপট রাগের সুরে বলল শাহরিয়ার আলম। ‘আপনি তো একজন রাঁধুনি রাখবার পারমিশন দিচ্ছেন না! কোন্ দুঃখে যে মায়ের কাছ থেকে রান্নাবান্নায় হাতেখড়ি নিয়েছিলাম...’

‘ওকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, মাসুদ ভাই,’ পাশ থেকে বলে উঠল রফিক। ‘রান্নাবান্নার অভ্যেস থাকাটা ভাল। বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেলেও না-খেয়ে মরতে হবে না।’

‘এই অভ্যেসটা তোদের থাকার দরকার নেই?’ কোমরে হাত রেখে বলল শাহরিয়ার। ‘নাকি ভাবছিস, তোদের বউ কখনও বাপের বাড়ি যাবে না?’

‘গেলে যাবে,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রফিক। ‘তখন তুই

আমাদের রেঁধে খাওয়াবি!’

‘কী-ই-ই!’

সমস্বরে হেসে উঠল সবাই।

রানা বলল, ‘এই সমস্যার সমাধান এখনি করে দিচ্ছি। রফিক, আগামী কয়েকদিন তুমি শাহরিয়ারের সঙ্গে অ্যাসিস্টেন্ট শেফ হিসেবে থাকবে। ঠিক আছে?’

‘ইয়াল্লা, রিফিউয়েলিঙের জন্য জাকির ভাই আমাকে ডাকলেন না কেন?’ কপাল চাপড়াল রফিক।

আবার হাসল সবাই। মনসুর বলল, ‘সমাধান তো হয়েই গেল। শাহরিয়ার, জলদি ডিনারের ব্যবস্থা করো।’

ড. সিদ্দিকীর দিকে তাকিয়ে শাহরিয়ার জানতে চাইল, ‘সার, আপনার খাওয়াদাওয়ায় কোনও বাহ্যবিচার আছে? মানে... কোনও কিছুতে অ্যালার্জি, বা শুধু ভেজিটেরিয়ান...’

‘চিন্তার কিছু নেই,’ স্মিত হেসে বললেন সিদ্দিকী। ‘আমি সবই খাই।’

‘ঠিক আছে, তা হলে আধ ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। আজ আপনাকে ভুনা-খিচুড়ি খাওয়াব।’ রফিকের দিকে ফিরল শাহরিয়ার। ‘এই যে অ্যাসিস্টেন্ট, দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে।’

‘আপনি এগোন, জাঁহাপনা!’ সকৌতুকে বলল রফিক।

হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চলে গেল ওরা। ড. সিদ্দিকীকে লিভিং এরিয়ার পাশের একটা করিডর দেখাল মনসুর। বলল, ‘হাতের বাঁয়ে দু’নম্বর দরজাটা আপনার কামরার। যান, গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি আর মাসুদ ভাই আপনার দু’পাশের কামরায় থাকব। কোনও সমস্যা হলেই ডাকবেন।’

নিজের কভারঅল দেখালেন বিজ্ঞানী, আঁটসাঁট হয়েছে

ওটা। ‘এটা পরে ঠিক আরাম পাচ্ছি না, অন্য কোনও পোশাক পেলে ভাল হত।’

‘ক্লজিটে বিভিন্ন সাইজের কাপড় রাখা আছে,’ বলল মনসুর। ‘একটা না একটা ঠিকই লেগে যাবে। কষ্ট করে আজকের রাতটা ওই কাপড়ে কাটিয়ে দিন। কাল আপনার জন্যে নতুন পোশাক-আশাক আনিয়ে নেব।’

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ড. সিদ্দিকী। তাঁর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা। ভদ্রলোক রুমের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতেই মনসুরকে বলল, ‘কমিউনিকেশন রুমে যাচ্ছি আমি। ঢাকায় কথা বলতে হবে।’

‘ওঁর ব্যাপারে ব্রিফ করবেন না আমাদের?’ জিজ্ঞেস করল মনসুর। ‘কী ধরনের ট্রেনিং দিতে হবে, নতুন পরিচয় কী ধরনের হবে... এসব না জানলে অন্তরাকে কাগজপত্র তৈরি করতে বলব কীভাবে?’

রানা এজেন্সির উইটনেস প্রোটেকশন টিমের পঞ্চম সদস্য অন্তরা আশরাফ—ফর্জারি বিশেষজ্ঞ। তবে ওর এই পরিচয় অল্প কিছু লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। অলব্যানিতে থাকে ও, সাধারণ একজন আর্টিস্টের কাভার নিয়ে। আসলেই একজন প্রতিভাবান শিল্পী ও, বয়েস মাত্র বাইশ। বাবা-মা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, সড়ক-দুর্ঘটনায় একটা পা হারানোর পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। অভাব-অনটন সইতে না পেরে অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে পড়েছিল মেয়েটি—বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের পেইন্টিং নকল করে বিক্রি করতে শুরু করেছিল। আড়াই বছর আগে এ-ধরনের একটি নকল তৈলচিত্রের কেস তদন্ত করতে গিয়ে ওর খোঁজ পায় রানা। ধরা পড়ে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা ওকে জানায় অন্তরা, আয়-রোজগারের

অন্য কোনও পথ না থাকায় এ-পথে নেমেছে সে। সব শোনার পর রানা বুঝতে পারে, আসলে মেয়েটি জাত-ক্রিমিনাল নয়, পরিস্থিতির শিকার। পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে তাই ওকে পাল্টা প্রস্তাব দেয় রানা—ইচ্ছে করলে ওর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে যোগ দিতে পারে ও। রাজি হয়ে যায় অন্তরা। প্রাথমিকভাবে পেইন্টিং-ফর্জারি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ শুরু করে ও, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সব ধরনের জালিয়াতির বিষয়ে ওর একটা সহজাত দক্ষতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। জাতশিল্পী ও, সহজেই যে-কোনও জিনিস নকল করতে পারে, যে-কারও জালিয়াতি ধরতেও পারে। দু'বছর আগে উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রামে রানা এজেন্সি অন্তর্ভুক্ত হবার পর রানা ওকে স্পেশালিস্ট-টিমের মেম্বর করে দিয়েছে, এখন ও সাবজেক্টদের নতুন কাগজপত্র তৈরি করে। কাজটা এত নিখুঁত হয় যে, বড় বড় বিশেষজ্ঞও ওর জালিয়াতি ধরতে পারে না। ইচ্ছে করেই ওকে আড়ালে রেখেছে রানা, কোথাও ওর সত্যিকার পেশা প্রকাশ হতে দেয়নি। রিলোকেটেড সাবজেক্টদের নতুন নাম-পরিচয় খুঁজে বের করার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে, ফর্জারকে কবজা করা। শত্রুরা যাতে তা না করতে পারে, তাই এ সতর্কতা।

অন্তরার নাম শুনে চকিতে সব মনে পড়ে গেল রানার। মনসুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসব ডিটেইলস্ অন্তরাকে পরে দিলেও চলবে। আসলে ড. সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত বিষয়ে আসলে আমি নিজেও তেমন কিছু জানি না। আজ বিশ্রাম নিক, কাল ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে নেয়া যাবে।'।

'আপনি যা বলেন,' শ্রাগ করল মনসুর।

ওঁকে লিভিং এরিয়ায় রেখে কমিউনিকেশন রুমে চলে এল

রানা। অ্যাকোমোডেশন এরিয়ার উল্টোদিকের একটা করিডর ধরে যেতে হয় ওখানে। রুমটা বেশি বড় নয়, তবে গোপনীয়তা বজায় রেখে যোগাযোগের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ভিতরে। দুটো ভিএইচএফ রেডিও সেট রয়েছে, স্ক্যানমল্ড টেলিফোন লাইন রয়েছে তিনটে, ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের জন্য একটা কম্পিউটারও রয়েছে। কম্পিউটারটায় রিলোকেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যও রাখা হয়।

একটা টেলিফোন সেটের রিসিভার তুলে নিল রানা, ডায়াল করল সরাসরি বিসিআই চিফের প্রাইভেট নাম্বারে। কয়েকবার রিং হলো, জবাব আসছে না। বাংলাদেশে এখন ভোর, চিফ ঘুমাচ্ছেন কি না সন্দেহ হলো ওর। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পরে ট্রাই করবে ভাবতেই রিসিভ করা হলো কলটা।

‘ইয়েস?’ যথারীতি ভরাট, গুরুগম্ভীর কণ্ঠ। ঘুমজড়িত জড়তার লেশমাত্র নেই মেজর জেনারেল রাহাত খানের মধ্যে, সম্পূর্ণ সজাগ তিনি।

‘রানা, সার।’

‘হ্যাঁ, বলো। কী খবর?’

কোনোরকম ভূমিকায় গেল না, সংক্ষেপে ড. সিদ্দিকীকে উদ্ধার করে আনার পুরো ঘটনা বর্ণনা করল রানা। শুনে একটু চুপ রইলেন চিফ। তারপর বললেন, ‘কী বুঝলে তুমি পুরো ব্যাপারটা থেকে?’

‘কোথাও কিছু গলদ আছে, সার,’ বলল রানা। ‘ভদ্রলোকের ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সম্ভ্রষ্ট হতে পারছি না আমি। এতসব সংস্থা থাকতে ওঁকে ডি.ই.এ-তে কেন নিয়োগ দেয়া হবে? তাও কি না মানব-কল্যাণমূলক একটা গবেষণায়? ড্রাগ-অ্যাডিকশনের চিরস্থায়ী প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে! এ বিশ্বাস হয় না, অন্তর্ধান-১

সার। আমেরিকানদের খুব ভাল করে চিনি আমরা। ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর মত প্রতিভাকে জঘন্য কোনও গবেষণায় ব্যবহার করার কথা ওদের। তাঁকে দিয়ে এমন কোনও জিনিস আবিষ্কার করানোর কথা, যা দিয়ে বাকি দুনিয়ার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারে ওরা।’

‘হুম,’ গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। ‘আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও বলছে, তিনি মিলিটারির হয়ে কাজ করতেন গত বছর পর্যন্ত।’

‘আরও অসঙ্গতি আছে, সার,’ রানা বলল। ‘যদি ওঁর কথা সত্যি বলে মেনেও নিই, তারপরও মিলছে না অনেক কিছু। ডি.ই.এ-তে কলাম্বিয়ানদের চর থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্যেরা তাঁকে জানপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে না। গত দশ বছরে কয়েকবার প্রমাণ পেয়েছি আমরা, আমেরিকানরা যে-কোন মূল্যে ড. সিদ্দিকীকে হাতে রাখতে চায়। এর জন্যে প্রয়োজনে কলাম্বিয়ানদের আট-দশজন চরকে খতম করে দেবে ওরা। অথচ তিনি কি না ওদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না! কলাম্বিয়ানদের ব্যাপারটাও গোলমালে। হামলাকারীদের জনা কয়েকের চেহারা দেখেছি আমি, একজন ফোনে কথাও বলেছে আমার সঙ্গে—কাউকেই কলাম্বিয়ান বলে মনে হয়নি আমার।’

‘ওটা তেমন বড় কোনও ব্যাপার নয়,’ রাহাত খান বললেন। ‘ওরা ভাড়াটে হতে পারে। তবে হ্যাঁ... গোলমাল যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। ড. সিদ্দিকী এখন কোথায়?’

‘আমাদের সেফ-সাইটে। ওঁকে রিলোকেট করার কাজটা শুরু করব কি না, এ-ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, সার। ভদ্রলোকের যুক্তি-তর্ক একদম বিশ্বাস হয়নি আমার। উনি

আমেরিকায় বসে... তার ওপর আবার গা-ঢাকা দিয়ে বাংলাদেশের উপকারে কাজ করে যাবেন, এটা অবাস্তব। পরে যদি পিঠ ফিরিয়ে নেন, আমাদের কিছুই করার থাকবে না।’

একটু ভাবলেন চিফ। তারপর বললেন, ‘লোকটা আসলেই সিদ্ধিকী কি না, সেটাও শিয়োর হওয়া প্রয়োজন...’

‘ব্যাপারটা আমার মাথায় আছে, সার। আজ রাতের ভিতরেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট জোগাড় করে আমাদের ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।’

‘গুড। এমনিতে কেমন দেখলে লোকটাকে?’

‘স্মার্ট। বিপদে পড়ে ভয় পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ঘাবড়ে যাননি। আমার কথামত প্রতিটা কাজ করেছেন। তা ছাড়া চিন্তা-ভাবনা খুব পরিষ্কার; প্রশ্ন করেন প্রচুর... শেখার আগ্রহ আছে, খুঁটিনাটি সবকিছুতেই কড়া নজর।’

‘একজন জিনিয়াসের ক্ষেত্রে এসব অস্বাভাবিক নয়,’ মন্তব্য করলেন রাহাত খান।

‘সত্যিই যদি ইনি আন্দালিব সিদ্ধিকী হন, তা হলে কী করব, সার?’

‘এখুনি ওকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আপাতত যা চায়, তা-ই করতে থাকো,’ বললেন বিসিআই চিফ। ‘ট্রেইনিং দাও ওকে, রিলোকেশনের প্রস্তুতি নাও। সঙ্গে চোখকান খোলা রাখো। বোঝার চেষ্টা করো, আসলে কী ঘটছে।’

‘ইয়েস, সার!’ অনুগত সৈনিকের মত বলল রানা।

‘সিদ্ধিকী যা যা বলেছে, সেগুলোও ভেরিফাই করে দেখো,’ বললেন রাহাত খান। ‘ওর ব্যাপারে ফাইনালি কিছু করবার আগে আবার যোগাযোগ করো।’

‘ঠিক আছে, সার।’

‘আর হ্যাঁ, সাবধানে থেকো।’

‘থাকব, সার।’

লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

দরজায় শব্দ হলো—জাকির উঁকি দিচ্ছে। ‘আসব, মাসুদ ভাই?’

‘এসো।’

‘আমার ফিরে যাওয়া দরকার,’ ভিতরে ঢুকে বলল জাকির। ‘নিউ ইয়র্কে মেলা কাজ। এদিকটা মনসুর সামলাতে পারবে, আর আপনি তো আছেনই। তারপরও যদি চান...’

‘না, না,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘তোমাকে ওখানেই বেশি দরকার। চলে যাও। মারুফকে বলো হেলিকপ্টারে তোমাকে ড্রপ করে দিয়ে আসতে। আর হ্যাঁ, ডি.ই.এ-তে তোমার কোনও কন্টাক্ট থাকলে ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে একটু খোঁজ নিয়ো—সত্যিই তিনি ওদের হয়ে কোনও কাজ করছিলেন কি না।’

‘খবর পাওয়া সহজ হবে না,’ জাকির বলল। ‘ভদ্রলোক তো গোপনে গবেষণা করছিলেন।’

‘আসলেই করছিলেন কি না—সেটাই প্রশ্ন।’

ভুরু কঁচকাল জাকির। ‘আপনার সন্দেহ আছে?’

‘আমার সন্দেহের কথা শুনে কাজ নেই। তুমি খবর নাও। ব্যাপারটা সত্যি হলে অন্তত কানাঘুষোর আকারে হলেও জানবে ওখানকার লোকজন।’

‘ঠিক আছে। আর কিছু?’

‘আর?’ একটু ভাবল রানা। ‘ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম... ওয়ারহাউসের ওখানে কিছু উদ্বাস্তু লোক সাহায্য করেছিল আমাদেরকে। ওদেরকে কথা দিয়েছি, আগামীকালের ভিতরেই

এক ট্রাকভর্তি খাবার আর গরম কাপড়চোপড় পাঠাব...'

‘আর বলতে হবে না,’ বাধা দিয়ে বলল জাকির। ‘আমি গিয়েই ব্যবস্থা নেব।’

‘আর পুরনো ওই সেডানটার বদলে নতুন একটা পাওয়া উচিত ওই ড্রাইভারের। ও নিজেই মালিক ছিল ওটার।’

‘বুঝতে পেরেছি, মাসুদ ভাই।’

‘থ্যাঙ্কস্,’ হাসল রানা। ‘যাও তা হলে। যোগাযোগ রেখো।’

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল জাকির।

বারো

পরদিন। ভোর ছ’টা।

লিভিং এরিয়ার সোফায় একাকী বসে আছে রানা, সামনের টেবিলের উপর রেখে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ওর সিগ-সাওয়ারটাকে, পরিষ্কার করেছে ন্যাকড়া আর তেল দিয়ে। চোখের কোণায় নড়াচড়ার আভাস পেয়েই মুখ তুলে তাকাল ও, ড. সিদ্দিকী এসে ঢুকেছেন কামরায়, ফ্রি-সাইজের একটা গাউন পরে আছেন।

‘কাউকে দেখছি না... সবাই কোথায়?’ রানাকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।

‘মনসুর কিছু জরুরি পেপারওয়ার্ক করছে,’ রানা বলল।
‘মারুফ কন্ট্রোল রুমে...’

‘কন্ট্রোল রুম!’

‘আপনার হাইডআউটের মত এখানেও বেশ কিছু সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে। তা ছাড়া আছে একটা রেইডার—অচেনা কোনও এয়ারক্র্যাফট আসে কি না, দেখার জন্যে। কন্ট্রোল রুম থেকে ওগুলো সব মনিটর করতে হয়।’

‘ও, আচ্ছা! বাকি দু’জন?’

‘রফিক গেছে হেলিকপ্টারের মেইনটেন্যান্স করতে, আর শাহরিয়ার ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে।’

খাবার রান্না হবার একটা লোভনীয় গন্ধ ভাসছে পুরো বাঙ্কারে, নাক উঁচু করে সেটা গুঁকলেন সিদ্দিকী। ‘আমার আগেই আনন্দাজ করা উচিত ছিল। ভদ্রলোকের রান্নার হাত কিন্তু অসাধারণ, কালকের ভুনা-খিচুড়ির কথা জীবনেও ভুলতে পারব না...’ বলতে বলতে আঁড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করে হাই তুললেন বিজ্ঞানী।

‘ঘুম কেমন হয়েছে?’ মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা।

ওর মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসলেন সিদ্দিকী। ‘অবাক হবেন কি না জানি না... চমৎকার! যা একটা দিন গেছে গতকাল, আমি তো ভেবেছিলাম ঘুমই আসবে না। কিন্তু বিছানায় পিঠ ঠেকাবার পর কীভাবে যে সকাল হয়ে গেল, টেরই পাইনি।’

‘ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়,’ রানা বলল। ‘নার্ভের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে আপনার। আর চাপ সহ্য করতে পারছিল না ওগুলো, এখানকার নিরাপদ পরিবেশ পেয়ে ঘুমের মাধ্যমে নিজেদের শান্ত করে নিয়েছে।’

‘আপনি ঘুমিয়েছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী ।

‘হ্যাঁ, তবে আপনার মত অত লম্বা ঘুম দিতে পারিনি ।
অনেক কাজ ছিল ।’

‘এই অস্ত্র-পরীক্ষারের মত?’ টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন সিদ্দিকী ।

হাসল রানা । ‘ব্যবহারের পর যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষার করে ফেলতে হয় আগ্নেয়াস্ত্র, নইলে ইমার্জেন্সির সময় জ্যাম হয়ে যেতে পারে । আমি তো বেশ দেরিই করেছি । কাল রাতেই পরীক্ষার করা উচিত ছিল এটা । অন্য কাজ ছিল বলে সময় পাইনি ।’

কাজগুলো কী, তা আর জানতে চাইলেন না সিদ্দিকী । শুধু বললেন, ‘এত ব্যস্ত থাকছেন... আপনার নার্সগুলোর কি শান্ত হবার প্রয়োজন হয় না?’

‘হয়, তবে সময় লাগে অনেক কম,’ বলল রানা । পিস্তল-পরীক্ষার শেষ হয়েছে ওর, ন্যাকড়া দিয়ে বিভিন্ন টুকরোর গায়ে লেগে থাকা বাড়তি গান-অয়েল মুছে ফেলল, তারপর শুরু করল জোড়া দিতে । ‘গতকালকের মত পরিস্থিতি প্রায়ই সামলাতে হয় আমাকে । এসবের সঙ্গে আমি পরিচিত । ওই যে... ইংরেজিতে যাকে বলে—কণ্ডিশনড্ ।’

‘কণ্ডিশনড্?’ ভুরু কোঁচকালেন বিজ্ঞানী ।

জবাব দেয়ার আগে সিগ-সাওয়ারের স্লাইডে ব্যারেল বসাল রানা, সাবধানে ওটার ভিতরে ঢোকাল রিকয়েল-স্প্রিং আর গাইড রডটাকে । তারপর বলল, ‘কাল আমি যা করেছি, সেটা শুধু দুঃসাহসের বশে নয় । সাহসের ভূমিকা কিছুটা ছিল হয়তো, কিন্তু মূল চালিকাশক্তি ছিল আমার ট্রেনিং ।’

‘ভেঙে পড়তে থাকা একটা ক্যাটওয়াকের উপরে দাঁড়িয়ে
অন্তর্ধান-১

কীভাবে লড়াই করতে হবে—এটাও বুঝি শেখানো হয়েছে আপনাকে?’ সিদ্ধিকীর কণ্ঠে অবিশ্বাস।

হেসে ফেলল রানা। ‘তা-ই কি শেখানো সম্ভব? আমাকে স্রেফ মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদ মোকাবেলার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। কোন্ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটা ঠিক করি অভিজ্ঞতা আর উপস্থিতবুদ্ধির মাধ্যমে। ইন্সটিঙ্কট-ও কিছুটা ভূমিকা রাখে তাতে।’

সোফায় হেলান দিলেন সিদ্ধিকী। ‘তারপরেও... আপনি আমারই মত একজন রক্তমাংসের মানুষ। ওরকম পরিস্থিতিতে শরীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য। তবুও এতকিছু কীভাবে করলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না।’

‘না-বোঝার মত কিছু বলেছি কি?’ বলল রানা। ‘আপনার খটকা লাগছে কেন?’

‘আমি একজন বায়ো-কেমিস্ট, মানবদেহের বিভিন্ন হরমোন এবং ওগুলোর প্রভাবের উপর আমাকে একজন বিশেষজ্ঞও বলতে পারেন। এপিনেফ্রিন... মানে সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা অ্যাড্রেনালিন বলি আর কী... ভয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভিতরে নিঃসৃত হতে শুরু করে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়, পাকস্থলি খামচে ধরে, পেশিতে কাঁপুনি এনে দেয়। শরীর কথা শোনে না। ওটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, আপনারও হয়েছে নিশ্চয়ই। এসব প্রতিক্রিয়া কাটালেন কীভাবে, সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।’

‘কাটিয়েছি কে বলল?’

‘কাটাননি?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘ওসব প্রতিক্রিয়ার ফলে সত্যিকার অর্থে কী ঘটে, তা জানেন তো? বাড়তি হার্টবিটের ফলে পেশিতে

দ্রুত রক্তসঞ্চালন হয়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে অক্সিজেনের সাপ্লাই বৃদ্ধি পায়—এতে পেশিতে রিফ্লেক্স বাড়ে, মস্তিষ্কের আদেশ আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি পালন করতে পারে। এ-ছাড়াও এপিনেফ্রিনের কারণে লিভার গ্লুকোজ তৈরি করতে থাকে, রক্তে গুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়। শরীরে ফ্যাটি অ্যাসিডের সঞ্চালনও অনেক বেশি পরিমাণে হয়। এই ফ্যাটি অ্যাসিড আর গুগার হচ্ছে শরীরের জ্বালানি... আর বাড়তি জ্বালানির মানে হচ্ছে বাড়তি শক্তি ও স্ট্যামিনা। ভয়টাকে বাদ দিয়ে আমাকে সেই শক্তি আর স্ট্যামিনা কাজে লাগানোর শিক্ষা দেয়া হয়েছে।’

‘এসব আমি জানি, কিন্তু ভয়টাই তো আসল। সেটাকে কীভাবে বাদ দিচ্ছেন?’

ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা। ‘প্যারাসুট পরিয়ে একটা লোককে বিশ হাজার ফুট অলটিচিউডের প্লেন থেকে লাফ দিতে বলুন, ভয় পেয়ে যাবে সে। কারণ কাজটা জীবন-সংশয়ী... ওর জন্যে একেবারে অচেনা। কিন্তু সামান্য ট্রেনিং দিন ওকে—প্রথমে উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে সুইমিং পুলে লাফ দেয়ান, এতে লাফিয়ে পড়ার ভয় কাটবে। তারপর আরও উঁচু জায়গা থেকে বানজি-জাম্পের হারনেস পরিয়ে লাফ দিতে দিন—প্যারাসুটের ঝাঁকি কেমন হয়, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে সে। এরপর ছোট প্লেনে নিয়ে কম অলটিচিউডে জাম্প করান... আস্তে আস্তে উচ্চতা বাড়াতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত বিশ হাজার ফুট থেকে সে যখন জাম্প করবে, তখন কিন্তু আর ভয় পাবে না। এফিনেফ্রিন বা অ্যাড্রেনালিন যা-ই বলুন... তখন কি নিঃসৃত হবে না? হবে। হার্টবিট বেড়ে যাবে, পাকস্থলিতে মোচড় দেবে, পেশি কাঁপবে... কিন্তু এতে তার কোনও অন্তর্ধান-১

অসুবিধে হবে না। কারণ প্যারা-জাম্পে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, শরীরের ওসব প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক কাজ করতে পারছে... ভয় পাবার কিছু নেই। তাই না? ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি আপনাকে?’

মাথা ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী। প্রশংসার সুরে বললেন, ‘আপনার আসলে টিচার হওয়া উচিত ছিল।’

‘ওই পেশায় শাইন করতে পারতাম না,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘ছাত্র হই বা শিক্ষক... ক্লাসরুমের চার দেয়াল খুব অপছন্দ আমার।’

‘সেটা বুঝতেই পারছি,’ বললেন ড. সিদ্দিকী। ‘আপনার মত দুঃসাহসী মানুষকে ফিল্ডেই মানায়।’

‘আবার লুজ্জা দিচ্ছেন। গতকাল কিন্তু সত্যিকার সাহস দেখিয়েছেন আপনি!’

‘সাহস! আমি!’ চোখ কপালে তুললেন সিদ্দিকী। ‘আমাকে সাহসী বলছেন আপনি? গত দু’টো সপ্তাহ কীভাবে ভয়ে কুঁকড়ে ছিলাম, সেটা জানলে আর এ-কথা বলতেন না।’

‘ভয়ই যদি না পান, তা হলে সাহস দেখাবেন কীভাবে? ওটাকে নেতিবাচকভাবে নেয়ার কিছু নেই। গতকাল আমরা যে-ধরনের হামলার মুখে পড়লাম, তাতে অনেক অভিজ্ঞ লোকও ঘাবড়ে যেতে পারত। আমি ওতে অভ্যস্ত, কিন্তু আপনি নন। তারপরেও আপনি যথেষ্ট শক্ত ছিলেন, পাগলামি করেননি, আমার কথামত কাজ করেছেন... এসব যদি সাহসিকতা না হয়, তা হলে কী?’

‘কী জানি!’ কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। ‘গতকালকের সবকিছুই কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কী করেছি না করেছি কিছুই ঠিকমত বলতে পারব না। হয়তো আপনি পাশে

ছিলেন বলেই ঘাবড়াইনি।’

‘অন্য কেউ থাকলেও একই আচরণ করতেন,’ রানা বলল। ‘বিপদের সময় মানুষের আসল প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে আসে। নইলে বেশিরভাগ সময়েই সবাই অভিনয় করে।’

‘সেটা নিশ্চয়ই আপনার বেলায় ঘটে না? আপনি তো বিপদে ভয় পান না।’

‘ভয় আমিও পাই,’ রানা বলল। ‘তবে সেটাকে সামলে স্বাভাবিক কাজ করতে পারি। এতক্ষণ কী বললাম আপনাকে?’

‘কিন্তু এভাবে পরের জন্য ঝুঁকি নেন কেন? লাভ কী এতে?’

‘লাভ-ক্ষতি নিয়ে তো ভাবিনি কখনও!’ রানা গম্ভীর হয়ে উঠল। ‘যা করি, সব দেশের জন্য... মানুষের উপকারের জন্য করবার চেষ্টা করি। এক ধরনের দায়িত্ব অনুভব করি বলতে পারেন...’

‘আমি বলব, এ-ও এক ধরনের অ্যাডিকশন,’ সিদ্দিকী বললেন। ‘মেডিক্যাল একটা টার্ম-ও আছে বোধহয় একটা—*রিস্ক অ্যাডিকশন*। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার নেশা... ঝুঁকি নেয়ার নেশা... শান্ত-নিরুদ্ভিগ্ন জীবনযাপনের প্রতি অনীহা... এসব ভাল লক্ষণ নয়।’

হাসল রানা। ‘আমাকে অসুস্থ বলতে চাইছেন?’

‘ও-ধরনের যত্নব্য করা ঠিক হবে না, কারণ আমি ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্ট নই। তবে এটুকু বুঝি, যে-কোনও নেশাই খারাপ। কারণ একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।’

‘আমি ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করি।’

‘শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সবকিছু জয় করা যায় না,’ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন ড. সিদ্দিকী। ‘বিলিভ মি, মিস্টার রানা... আমি যে-জিনিস আবিষ্কার করেছি, ওটাকে মনের জোর বা ইচ্ছাশক্তি

দিয়ে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।’

দ্রাগটা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু সুযোগ পেল না। অ্যাপ্রন পরে হাজির হয়েছে শাহরিয়ার, রান্না শেষ ওর—ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করতে ডাকছে সবাইকে।

দিনের বেলাটা চুপচাপ কেটে গেল। ড. সিদ্দিকীকে আরেক দফা বিশ্রাম নিতে বলে বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকল রানা এজেন্সির অপারেটররা। আসলে ভদ্রলোকের পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে ট্রেনিং শুরু করতে চাইছে না। ব্রেকফাস্টের পর পরই গোপনে তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে, সেটা ই-মেইল করে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়... বিসিআই হেডকোয়ার্টারে রক্ষিত ডোশিয়ে-র সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য।

দুপুর নাগাদ ফলাফল চলে এল। রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা—ছদ্মবেশী কোনও শত্রুকে ওদের গোপন সেফ-সাইটে নিয়ে আসেনি ও। উদ্ধার করা ভদ্রলোক সত্যিই ড. আন্দালিব সিদ্দিকী, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে গেছে। মনসুরকে ডেকে পরামর্শ করল ও, ঠিক হলো—দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করবে ওরা। আজ শুধু ব্রিফিং হবে, কাল থেকে প্র্যাকটিক্যাল।

লাঞ্চটা বেশ জম্পেশ হলো। সকালের ব্রেকফাস্ট সাদামাঠা ছিল বলেই বোধহয় পোলাও, বোনলেস চিকেন, টিনজাত সবজির কাবাব আর পায়েশ সহযোগে মুখরোচক ভারী খাবারের আয়োজন করেছে শাহরিয়ার। ড. সিদ্দিকী আমেরিকায় বড় হলেও বাংলাদেশি এসব খাবারদাবারে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। খাদ্যরসিক মানুষ তিনি, সবকিছুই খেতে পারেন... মজাও পান। রান্নাটাও হয়েছে বেশ ভাল। রফিক অবশ্য কিছুক্ষণ পর

পরই শাহরিয়ারকে খেপানোর জন্য এটা-ওটা খুঁত ধরছে—দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ খুনসুটি লেগেই রয়েছে।

‘বোনলেস চিকেনের জন্য কোনও সমালোচনা করলে আমি কিন্তু মানব না,’ কপট রাগ দেখিয়ে বলল শাহরিয়ার। ‘দোষটা মুরগির, আমার নয়। খুঁজে-পেতে ডিপ ফ্রিজের তলায় দশদিনের পুরনো দুটো পেয়েছিলাম, তা-ই দিয়ে রান্না করতে হয়েছে। তাজা মাংস নেই তো আমি কী করব? বাজার করাটা কি আমার কাজ?’

হেসে উঠলেন ড. সিদ্দিকী। ‘ওঁর কথায় কান দেবেন না। রফিক সাহেব আপনাকে রাগানোর জন্যে ওসব বলছেন। চিকেনটাই তো সবচেয়ে মজা হয়েছে। স্পেশাল কিছু একটা দিয়েছেন এতে। অয়েস্টার সস নাকি?’

‘দু’চামচ,’ বলল শাহরিয়ার, চেহারায়া বিস্ময়। ‘আপনি দেখি ধরে ফেলেছেন!’

‘ওটা আমার বিশেষ ক্ষমতা,’ হাসিমুখে বললেন সিদ্দিকী। ‘জিভ সবকিছুর স্বাদ বুঝতে পারে। অবশ্য সুপার-পাওয়ার আপনারও আছে—হাতের জাদু! কামাল করে দিয়েছেন একেবারে।’

হাসি ফুটল শাহরিয়ারের মুখে। ‘রান্না যেমনই হোক, এমন কথা শুনলে কার না ভাল লাগে! অথচ কপালটা দেখুন—কষ্টও করি, আবার সমালোচনাও শুনতে হয়।’ রফিককে দেখাল ও। ‘এই নিমকহারামটাকে খাইয়ে কোনও লাভ নেই। কাল থেকে ওকে শুধু শুকনো রুটি আর বাসি ডাল দেব আমি।’

‘তা-ও বোধহয় এরচেয়ে ভাল হবে,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রফিক।

হেসে উঠল সবাই।

খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে সবার। ড. সিদ্দিকী জিজ্ঞেস করলেন, ‘ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা আছে এখানে?’

মাথা ঝাঁকাল শাহরিয়ার। ‘হ্যাঁ। করতে চান?’

‘পেলে ভাল হয়।’

‘ঠিক আছে। কনফারেন্স রুমে যান, আমি নিয়ে আসছি।’

‘কনফারেন্স রুম!’

‘ট্রেইনিঙের কথা ভুলে গেছেন?’ হাসল রানা। ‘আজ আপনার ব্রিফিং হবে। কাল থেকে হাতে-কলমে শেখানো হবে সব।’

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়লেন ড. সিদ্দিকী। সবার সঙ্গে গিয়ে ঢুকলেন কনফারেন্স রুমে। ওখানকার গোলটেবিল ঘিরে বসল সবাই। একটু পরেই এসে গেল শাহরিয়ার—একটা ট্রে-তে করে নিয়ে এসেছে একটা ওয়াইনের বোতল, সেই সঙ্গে গ্লাস আর বরফের কুচি। গ্লাসের সংখ্যা মাত্র একটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী।

‘একাই খেতে হবে আপনাকে,’ রানা বলল। ‘আমরা সবাই ডিউটিতে আছি। এ-অবস্থায় ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।’

কাঁধ ঝাঁকালেন সিদ্দিকী। গ্লাস নিতে নিতে শাহরিয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী এনেছেন?’

‘স্ট্রাগানফ... রাশান ওয়াইন,’ বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল শাহরিয়ার।

গ্লাসে সামান্য একটু ঢেলে চুমুক দিলেন সিদ্দিকী। ‘হুঁ... ভাল জিনিস তো! আগে কখনও খাইনি। রাশান মদ এত ভাল হয়, জানা ছিল না।’

‘নামটাই রাশান, রেসিপিটা নয়,’ চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল শাহরিয়ার। ‘উনবিংশ শতকের এক ফ্রেঞ্চ শেফ

বানিয়েছিল এটা, রাশান এক অ্যারিস্টোক্র্যাটের ব্যক্তিগত বাবুর্চি ছিল সে। অ্যারিস্টোক্র্যাট লোকটার নাম কাউন্ট পল স্ট্রগানফ। সচরাচর যা হয়... পয়সাঅলা মানুষটার নামে নাম হয়েছে ওয়াইনটার, আবিষ্কারের নামে নয়।’

‘খাবারদাবার আর পানীয়ের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি,’ প্রশংসার সুরে বললেন সিদ্দিকী। ‘রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় নামা উচিত আপনার।’

মুচকি হাসল শাহরিয়ার। ‘ওতে এখানকার মত আনন্দ আর উত্তেজনা কোথায়?’

মারুফের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা, ওকেই দেয়া হয়েছে ব্রিফিংয়ের দায়িত্ব। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল স্পেশালিস্ট টিমের সেকেণ্ড-ইন-কমান্ড, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ‘ড. সিদ্দিকী, অনুমতি দিলে ব্রিফিং শুরু করতে পারি।’

‘প্লিজ!’ স্ট্রগানফে চুমুক দিয়ে বললেন বিজ্ঞানী। ‘গো অ্যাহেড।’

‘শুরুতেই জানাই, উধাও হয়ে যেতে হলে, মানে নাম-পরিচয় পাণ্টে গা-ঢাকা দিতে হলে... অর্থাৎ, রিলোকেশনের জন্যে মোট চারটে ধাপ অতিক্রম করতে হবে আপনাকে,’ লেকচার শুরু করল মারুফ। ‘প্রথমটা হচ্ছে নতুন পরিচয় সংগ্রহ। এই দেশের ক্ষেত্রে সেটার জন্যে অথেনটিক একটি বার্থ-সার্টিফিকেট এবং সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার প্রয়োজন হবে আপনার...’

‘অথেনটিক?’ ভুরু কোঁচকালেন ড. সিদ্দিকী। ‘সেটা কীভাবে সম্ভব?’

‘একটা উপায় হচ্ছে, মৃত কোনও ব্যক্তির বার্থ-সার্টিফিকেট আর সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার সংগ্রহ করা। তবে এ ক্ষেত্রে

সতর্ক থাকতে হয়—যার পরিচয় গ্রহণ করছেন আপনি, তার যেন কোনও নিকটাত্মীয় বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবিত না থাকে। কেউ যেন বলতে না পারে, এই লোক বহু আগেই মারা গেছে। এর জন্যে পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে হয়, এমন একটা পরিবার খুঁজে বের করতে হয়, যার সব সদস্য একই সঙ্গে দুর্ঘটনা বা অন্য কোনোভাবে মারা গেছে। ওই পরিবারের একটা বাচ্চা থাকতে হয়, বেঁচে থাকলে যার বয়স আপনারই মত হতো। নবজাত বাচ্চার জন্য অনেক বাবা-মা-ই সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার সংগ্রহ করে, হাসপিটাল রেকর্ডে উল্লেখ থাকে সেটা। তা ছাড়া কিছু কিছু স্টেটে ডেথ-সার্টিফিকেটেও নাম্বারটা লেখা হয়। দুটোই সহজে সংগ্রহ করা যায়।’

‘প্রচুর পেপারওয়ার্ক করতে হবে দেখছি,’ মন্তব্য করলেন সিদ্দিকী। ‘খুব খাটুনি যাবে আপনাদের।’

‘যদি এ-পদ্ধতিটা ফলো করি আর কী!’ হাসল মনসুর।

‘এভাবে নয়? কেন?’ অবাক হলেন সিদ্দিকী।

‘এই পদ্ধতিটা মডারেট থ্রেট লেভেল, সেই সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্যে কার্যকর,’ রানা বলল। ‘আপনার জন্যে নয়। মার্কিন সরকার মাঝে মাঝেই সমস্ত সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার রিভিউ করে। বহুদিন ধরে ইনঅ্যাকটিভ একটা নাম্বার থেকে হঠাৎ করে ট্যাক্স রিটার্ন পেতে শুরু করলে ওরা স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে শুধু কলাম্বিয়ানদের নয়, মার্কিন সরকারের ওয়াশেংটন লিস্টেও আপনার নাম উঠে আসবে—একজন ক্রিমিনাল হিসেবে!’

‘তা হলে?’

‘সম্পূর্ণ নতুন একটা সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার অ্যাসাইন করা হবে আপনাকে।’

‘কিছু নতুন নাম্বার তো অল্পবয়েসীরা পায়। আমার মত বয়স্ক একজন মানুষের জন্যে সেটা বেমানান হবে না?’

‘মোটাই না,’ মারুফ মুখ খুলল। ‘আপনি ইমিগ্র্যান্টদের কথা ভুলে গেছেন। ওরা নাগরিকত্ব পাবার পর নতুন নাম্বার পায়। আমাদের একজন ফর্জারি-স্পেশালিস্ট আছে, সে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে দেবে... আপনি একজন অভিবাসী, সেই সঙ্গে সদ্য-নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষ হিসেবে নতুন নাম্বারের জন্য আবেদন করবেন। পেয়েও যাবেন, আমরা ব্যাপারটা নিশ্চিত করব। কাজেই আপনার নাম্বারটা হবে একেবারে অথেনটিক... ব্র্যাণ্ড-নিউ... কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারবে না।’

‘চমৎকার বুদ্ধি,’ স্বীকার করলেন ড. সিদ্দিকী। ‘কে এই স্পেশালিস্ট?’

‘তার পরিচয় আপনার না জানলেও চলবে,’ রানা বলল। ‘দেখা করারও প্রয়োজন নেই। আমরা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলে বাকি কাজ ও নিজেই করে নেবে।’

কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। ‘কী ধরনের কাগজপত্র তৈরি করবেন উনি?’ কৌতূহল মিটছে না তাঁর।

‘ডিটেইলড্ ব্যাকগ্রাউণ্ড,’ মারুফ বলল। ‘কোথায় আপনার জন্ম হয়েছে, কোথায় বড় হয়েছেন, কোন্ স্কুলে পড়েছেন, কোথায়-কোথায় থেকেছেন... সোজা কথায় নকল পরিচয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি। এসব সাপোর্ট করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের আই.ডি., ড্রাইভারস্ লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, পাসপোর্ট... এমনকী আপনার পুরনো স্কুলের লাইব্রেরি কার্ডও তৈরি করে দেবে ও।’

বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেছে ড. সিদ্দিকীর।

‘অবাক হবার কিছু নেই,’ মারুফ বলল। ‘আমরা শুধু কাগজপত্রই তৈরি করে দেব, কিন্তু ওগুলো ঠিকমত কাজে লাগানোর দায়িত্ব আপনার। পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে আপনাকে, কেউ জিজ্ঞেস করলেই যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া গড়গড় করে বলে যেতে পারেন... মিলিয়ে দেখলে কেউ যেন একচুল এদিক-ওদিক দেখতে না পায়। মনে রাখবেন, রিলোকেশনের আসল সাফল্য কিন্তু সাবজেক্টের ওপর নির্ভর করে, যারা অ্যারেঞ্জ করে দেয় তাদের উপর নয়।’

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ড. সিদ্দিকী। ‘বুঝলাম। সব মুখস্থ করতে আমাকে, তেমন কঠিন কিছু তো নয়।’

‘এখুনি মন্তব্য করবেন না,’ বলে উঠল মনসুর। ‘আরও তিনটে স্টেজ বাকি আছে কিন্তু!’

থমকে গেলেন সিদ্দিকী, কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়।

‘এনিওয়ে, এবার আসি দ্বিতীয় পর্যায়টার ব্যাপারে,’ খেই ধরল মারুফ। ‘সেটা হলো, চেহারা বদলানো। নতুন পরিচয়ের সঙ্গে আপনার নতুন একটা চেহারা নিতে হবে। অল্প চেষ্টায় কিছু কিছু পরিবর্তন সহজেই আনা সম্ভব, যেমন চুলের রং-পাল্টানো, মুখে দাড়ি-গোঁফ রাখা, চোখে চশমা পরা... এসব। মডারেট রিস্ক লেভেলে এটুকুই যথেষ্ট হয়ে থাকে। তবে আপনার কেসটা যেহেতু এরচেয়ে গুরুতর, তাই সার্জিক্যাল প্রসিডিওর ফলো করাটাই উচিত হবে...’

‘সার্জিক্যাল মানে?’ বাধা দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন সিদ্দিকী।

‘প্লাস্টিক সার্জারি, ডক্টর,’ বুঝিয়ে বলল রানা। ‘অপারেশনের মাধ্যমে আপনার চেহারা এমনভাবে পাল্টে দেয়া হবে, যাতে আপনার মা-ও ছেলেকে চিনতে না পারেন।’

‘আমার মা মারা গেছেন বহুদিন আগে, বাবা-ও,’ থমথমে গলায় বললেন সিদ্দিকী।

‘দুঃখিত,’ বিব্রত কণ্ঠে বলল রানা। ‘কিছু মিন করে বলিনি ওটা। কথার কথা বলেছি।’

‘অপারেশন করার কি সত্যিই দরকার আছে?’

‘আইডেন্টিটি চেঞ্জটা যদি নিখুঁত করতে চান... হ্যাঁ।’ রানা বলল। ‘আপনার শারীরিক গঠনও পাল্টাতে হবে। কাল গাড়িতে আপনাকে তো বলেছি সেটা। মোটা মানুষের প্রতি সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শুকাতে হবে আপনাকে। সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বটে, হয়তো রিলোকেশনের আগে পেরে উঠবেন না, তবে শুকাতে আপনাকে হবেই... আগে বা পরে।’

‘আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করব না,’ কথা দিলেন সিদ্দিকী।

‘চেষ্টায় হবে না, যে-সব ইন্সট্রাকশন দিচ্ছি, তার সবক’টা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তা ছাড়া শুধু চেহারা পাল্টালে বা ভুয়া ব্যাকগ্রাউণ্ড মুখস্থ করলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আপনাকে আসল যে-কাজটা করতে হবে, তা আরও কয়েক গুণ কঠিন।’

‘কী সেটা?’

‘ওটা আমাদের চার নম্বর স্টেপ, যথাসময়ে জানতে পারবেন,’ মারুফ বলল। ‘আগে তৃতীয় ধাপটার কথা বলে নিই। এটা অর্থনৈতিক... মানে নতুন জীবনে আপনার টাকা-পয়সা সংক্রান্ত। নতুন একটা পরিচয় নেবেন আপনি, তার মানে এই নয় যে, আয়-রোজগার নতুন করে শুরু করবেন... কোনও রকম ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ছাড়া। স্বাভাবিকভাবেই আগের জীবনের জমানো টাকাগুলো সঙ্গে নিতে চাইবেন

আপনি, সেজন্যে কৌশল খাটাতে হবে আমাদের। যাতে এই টাকা ট্রেস করে আপনাকে খুঁজে বের করতে না পারে কেউ।’

‘কৌশলটা কী?’

‘বাহামায় অথবা সুইস ব্যাঙ্কে একটা নাম্বারড অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপনি, বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা ওটায় ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সফার করে ফেলবেন। পদ্ধতিটা মোটামুটি নিরাপদ, কারণ নাম্বারড অ্যাকাউন্টে নাম-পরিচয় বা ঠিকানা দিতে হয় না। এ-কারণে আপনার নতুন আইডেন্টিটি জানতে পারবে না কেউ। তারপর আরও নিরাপদ থাকবার জন্য রিলোকেটেড হবার পর আপনি আপনার বাসস্থানের আশপাশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ভিন্ন ভিন্ন নামে কয়েকটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন, নাম্বারড অ্যাকাউন্ট থেকে ওগুলোয় প্রয়োজনমতক অনিয়মিতভাবে টাকা আনিয়ে নেবেন। খরচ করবেন একেক সময় একেকটা থেকে। তবে খেয়াল রাখবেন, কখনও যেন দশ হাজার ডলারের বেশি ট্রান্সফার না করেন, কারণ বড় ধরনের প্রতিটা ট্রানজ্যাকশনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পৌঁছে যায়। তারমানে এ-ই নয় যে, নয় হাজার নয়শ’ নিরানব্বুই ডলারের ট্রান্সফার করতে পারবেন। দশ হাজার ডলারের কাছাকাছি নিয়মিত ট্রানজ্যাকশন হলেই প্যাটার্নের খোঁজে নজর রাখতে শুরু করে এফবিআই আর ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট।’

‘তা হলে কোন্ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করব?’

‘নির্দিষ্ট কিছু থাকবে না, ছোট-বড় সব ধরনেরই করতে থাকবেন... যাতে আপনার এই মানি-ট্রান্সফার কখনও কোনও ছকের মধ্যে না পড়ে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে আপনার কাছে?’

ইতিবাচক ভঙ্গিতে সায় দিলেন ড. সিদ্দিকী।

‘আপনার আয় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের লোকজনের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে,’ যোগ করল মনসুর। ‘যে-কোনও সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়েই ওরা সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য। তাই আগেভাগেই ওদের সন্দেহ দূর করে দিতে হবে। গল্পটা এমন হতে পারে যে, বিদেশি একটা ট্রাস্ট ফাণ্ডের কাছে আপনি আপনার ব্যবসা বিক্রি করে দিয়েছেন, ওরা ছোট ছোট কিস্তিতে টাকাটা শোধ করছে।’

‘বুঝতে পেরেছি,’ বললেন সিদ্দিকী।

‘বেশ,’ রানা বলল। ‘প্রথম তিনটে ধাপ যদি পরিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে শেষটা শুনুন—এটাই সবচেয়ে কঠিন। মারুফ...’

‘ওটা আপনিই বুঝিয়ে দিন, মাসুদ ভাই,’ বলল মারুফ। অন্যেরাও সায় দিল প্রস্তাবটাতে।

মাথা ঘুরিয়ে বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল রানা। ‘শুনুন তা হলে। মারুফ আগেই বলেছে, গায়েব হয়ে যাওয়ার আসল সাফল্য নির্ভর করে সাবজেক্টের উপরে... মানে আপনার উপরে। নতুন জীবন... এক অর্থে পুনর্জন্মও বলতে পারেন একে... শুরুতে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। শত্রুদের কাছ থেকে মুক্তি... নতুন একটা সূচনা... পুরনো ভুলগুলো শুধরে নেয়ার সুযোগ... এসব ‘ক’জনই বা পায়? কিন্তু অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যে ছিন্ন করতে হবে, সেটা ভাবে না কেউ। ব্যাপারটা সহজ নয়, আগের জীবনের কিছু আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না... সিম্পলি নাথিং। আপনার কোনও পরিবার আছে?’

‘না,’ মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী। ‘আপনার তো সেটা জানবার কথা।’

‘আমাদের ফাইলে আপনার সম্পর্কে সব তথ্য নেই, তাই শিয়োর হয়ে নিচ্ছি। কখনও বিয়ে করেছেন? বাচ্চাকাচ্চা আছে?’

‘না, নেই। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি সারাক্ষণ, সংসার করার সুযোগ কোথায়?’

‘প্রেমিকা বা বান্ধবী?’

‘উঁহুঁ।’

‘ঘনিষ্ঠ, বা খুব কাছের কোনও মানুষ...’

‘সামাজিকতা করতে পারি না আমি,’ সরল গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘তাই বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ নেই। যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছি এতদিন, সবাই আমার প্রফেশনাল কোলিগ, বা পরিচিত মানুষ।’

‘তার মানে আপনি হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলে শুধু শত্রু ছাড়া আর কেউ তা-নিয়ে উতলা হয়ে পড়বে না? আপনিও কাউকে মিস করবেন না?’

‘ঠিক ধরেছেন।’

‘গুড, তা হলে ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন বা পরিবার থাকলেই যত সমস্যা। প্রথম প্রথম সাবজেক্টরা নতুন জীবন এনজয় করে ঠিকই, কিন্তু একটা সময়ে ঠিকই পরিবার-পরিজন আর বন্ধুবান্ধবকে মিস করতে শুরু করে। একটা সময়ে চুপিসারে যোগাযোগও করে বসে। শত্রুরা এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগায়। গা-ঢাকা দেয়া লোকটার আত্মীয় আর বন্ধুদের উপর নজর রাখে—তাদের চিঠিপত্র চেক করে, ফোন ট্যাপ করে, ফেউ লাগায়... ফলে যোগাযোগ করামাত্র সাবজেক্টের লোকেশন আর নতুন পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়ে।’

‘আমার ক্ষেত্রে এ-ধরনের কোনও সমস্যা হবে না,’ জোর গলায় বললেন সিদ্দিকী।

‘আগে পুরোটা শুনুন। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে শুধু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া নয়। আপনার শখ, অভ্যাস, আচার-আচরণ, এমনকী হাঁটাচলার ভঙ্গি পর্যন্ত পাল্টে ফেলতে হবে।’

‘বলেন কী!’ আঁতকে উঠলেন সিদ্দিকী।

‘হ্যাঁ, একটা উদাহরণ দিই। আপনি কি কোনও সায়েন্টিফিক জার্নালের নিয়মিত গ্রাহক?’

‘বেশ কয়েকটার। কেন?’

‘সবগুলোর মায়া কাটাতে হবে আপনাকে। কারণ আপনি গা-ঢাকা দেবার পরই শত্রুরা ওসব জার্নালের ওপর নজর রাখতে শুরু করবে। যারা নতুন গ্রাহক হবে, তাদের প্রত্যেককে চেক করতে শুরু করবে...’

‘আর বলতে হবে না,’ হাত তুলে রানাকে থামালেন সিদ্দিকী। ‘আমাকে খাওয়াদাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ সব বদলে ফেলতে হবে—এই তো?’

‘একজ্যাক্টলি।’

‘এ-তো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। আমি পারব?’

‘আপনাকে তৈরি করবার দায়িত্ব আমাদের,’ রানা বলল। ‘আগামী কয়েকদিনে কয়েকবার আপনার ইন্টারভিউ নেব আমরা, খুঁটিনাটি সব জেনে নিয়ে লিস্ট তৈরি করব—কী কী পরিবর্তন করতে হবে জানাব আপনাকে। সেগুলোর উপর একই সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং চলতে থাকবে। আচার-আচরণ, কথা বলার ঢং, হাঁটাচলা... সবই বদলে দেব আমরা। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি এতসব অন্তর্ধান-১

পরিবর্তনে রাজি আছেন কি না।’

একটু নীরব রইলেন ড. সিদ্দিকী। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘রাজি না হয়ে আমার উপায় নেই, মি. রানা। বাঁচার এই একটাই মাত্র পথ খোলা রয়েছে আমার সামনে।’

‘আপনাকে একটা বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি...’

‘দুঃখিত,’ চেহারা করুণ ভাব ফোটালেন বিজ্ঞানী। ‘ওটায় আমি রাজি হতে পারছি না। যত কষ্টই হোক, যা-ই করতে হোক, আমি এ-দেশেই থাকতে চাই।’

‘সেক্ষেত্রে,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা। ‘আগামীকাল ভোর ছ’টা থেকে আপনার ট্রেইনিং শুরু হবে। তৈরি থাকবেন।’

তেরো

নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল পরের দুটো দিন। ড. সিদ্দিকীর ট্রেইনিং নিয়ে ব্যস্ত রইল রানা আর স্পেশালিস্ট টিমের সদস্যরা। প্রতিদিন ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা করে খাটানো হচ্ছে তাঁকে—ইন্টারভিউ, লেকচার... সেই সঙ্গে আচার-আচরণ পাল্টানোর বিভিন্ন কৌশল শেখানো হচ্ছে একের পর এক। শুধু ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, তাই পুরো সময়টা অবজার্ভেশনেও রাখা হচ্ছে তাঁকে, দক্ষ চোখে ভদ্রলোকের সমস্ত ভাবভঙ্গি, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি চিনে নিচ্ছে

ওরা, কাগজে নোট করে নিয়ে পরে সেগুলো বদলানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

কাজটা সহজ নয়... প্রশিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারও জন্যই। কিন্তু স্পেশালিস্ট টিম এ-কাজে অভিজ্ঞ, ড. সিদ্দিকীও চমৎকার পারফরমেন্স দেখাচ্ছেন। অত্যন্ত মেধাবী মানুষ তিনি... সোজা কথায় জিনিয়াস। স্মরণশক্তি খুবই ভাল, কোনও বিষয় একবারের বেশি দু'বার বলতে হয় না তাঁকে। সবকিছু আয়ত্ত করে নিচ্ছেন অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে। স্পেশালিস্ট টিম ব্যাপারটা লক্ষ করে মুগ্ধ—এরকম সাবজেক্ট ওদের জন্য স্বপ্নের মত। এর আগে যাদের রিলোকেটেড করেছে ওরা, তাদেরকে নতুন পরিচয়ে অভ্যস্ত করতে জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল ওদের—এসপিয়োনাভ এজেন্টদেরই এসব শিখতে যথেষ্ট সময় লাগে, সাধারণ মানুষকে অল্প সময়ে শেখানো তো আরও কঠিন।

মুগ্ধ অবশ্য রানাও হচ্ছে, তবে একই সঙ্গে কিছুটা দুশ্চিন্তা অনুভব করছে ও। ড. সিদ্দিকী যেভাবে এগোচ্ছেন, তাতে ট্রেইনিং শেষ হতে মোটেই সময় লাগবে না। প্লাস্টিক সার্জারিটা হচ্ছে শেষ কাজ, ওটা করেই তাঁকে খুব শীঘ্রি নতুন পরিচয় দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গোটা রহস্যটার ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। সারাক্ষণ বিজ্ঞানীকে চোখে চোখে রাখছে ওরা, লাভ হয়নি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ সিদ্দিকী, এখন পর্যন্ত একটাও বেফাঁস কথা বলেননি তিনি, উল্টোপাল্টা কোনও কাজও করেননি। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ওঁকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হতে হবে ওদের, আসল ঘটনা আর জানা হবে না। কীভাবে কী করা যায় ভেবে অস্থির হলো রানা, সমাধান আর পেল না।

সেফ-সাইটের পঞ্চম দিন। খুব ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার। হাতঘড়ি চোখের সামনে তুলে লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল—পাঁচটা বাজে। অ্যালার্ম বাজার কথা সাড়ে পাঁচটায়, আধঘণ্টা আগেই ঘুম ভাঙল কেন? ভুরু কুঁচকে গেল ওর। পরমুহূর্তেই দরজায় মৃদু টোকা শুনতে পেল... আগেও পড়েছে নিশ্চয়ই, সেজন্যেই ঘুম ভেঙেছে।

ঝটপট বিছানা থেকে নামল রানা। গায়ে একটা রোব জড়িয়ে উঁকি দিল দরজার ফাঁক করে। মারুফ দাঁড়িয়ে আছে করিডরে।

‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘একটু আসবেন, মাসুদ ভাই?’ মারুফের কণ্ঠে অস্বস্তি।
‘একটা ব্যাপার দেখানো দরকার আপনাকে।’

‘এক মিনিট সময় দাও আমাকে।’

রোব খুলে দ্রুত প্যাণ্ট-শার্ট পরল রানা, তারপর বেরিয়ে এল রুম থেকে।

‘আসুন,’ বলে পা চালাল মারুফ। ‘কমিউনিকেশন রুমে যেতে হবে আমাদের।’

লিভিং এরিয়া পেরিয়ে অন্যপাশের করিডরটায় পৌঁছুল দুজনে... তারপর দরজা খুলে ঢুকল কমিউনিকেশন রুমে। দেয়াল হাতড়ে লাইট জ্বালল মারুফ, রানাকে নিয়ে গেল ভিএইচএফ রেডিও সেটটার সামনে। বলল, ‘কিছু বুঝতে পারছেন?’

তীক্ষ্ণ চোখে যন্ত্রটাকে দেখল রানা—নীরব হয়ে আছে ওটা। সেটাই স্বাভাবিক, প্রয়োজন না হলে অন্ করা হয় না সেটটা। হেডসেট, মাইক্রোফোন সব জায়গামত গোছানো রয়েছে—ভাল করে দেখেও কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। সোজা

হয়ে মারুফের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ও।

‘মাস্টার সুইচটা দেখুন,’ শান্তস্বরে বলল মারুফ।

তাকাল রানা—নীচের দিকে নামানো রয়েছে সুইচটা, অণুপজিশনে। তবে কোনও ধরনের ট্রান্সমিশন বা রিসেপশন হচ্ছে না, কারণ মেইন পাওয়ার সুইচটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করার আগে মাস্টার সুইচ অফ করে নেয়া নিয়ম, তবে ভুলে করা হয়নি বোধহয়। ছোট ভুল... ব্যাপারটা তেমন অস্বাভাবিক বলা চলে না।

ওর চিন্তাধারা বোধহয় ধরতে পেরেছে মারুফ, বলল, ‘ওটা গতকাল এভাবে ছিল না, মাসুদ ভাই। এর মধ্যে আমরা ব্যবহারও করিনি সেটটা। করলে মাস্টার-সুইচ অফ করার কথা ভুলতাম না।’

‘কীভাবে শিয়োর হচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘গতকাল রাত দশটায় কন্ট্রোল রুমের ডিউটিতে ক্লোজ-আপ হবার আগে একবার রাউণ্ড নিয়েছি আমি—তখন সব ঠিকঠাক ছিল। বিশ মিনিট আগে শাহরিয়ার আমাকে রিলিভ করেছে, শুতে যাবার আগে আবার একটা চক্কর দিচ্ছিলাম... দেখি এই কাণ্ড!’

‘ভাবছ আনঅথরাইযড্ ট্রান্সমিশন করেছে কেউ?’

‘তাতে কোনও সন্দেহ নেই,’ বলল মারুফ। ‘কারণ অসঙ্গতি শুধু এই একটা নয়, আরও আছে।’

‘কোথায়?’ চারপাশে নজর বোলাল রানা।

‘কম্পিউটারে,’ বলল মারুফ। ‘আসুন দেখাচ্ছি।’

রুমের আরেকপাশে রাখা কম্পিউটারটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কী-বোর্ডে কয়েকটা বাটন টিপে একটা ফাইল খুলল। বলল, ‘দেখুন, লগ বলছে—দু’ঘণ্টা আগে বেশ কিছু

ফাইল অ্যাকসেস করা হয়েছে।’

‘কে করেছে?’ গম্ভীর গলায় জানতে চাইল রানা।
‘তোমাদের সবার আলাদা পাসওয়ার্ড আছে না? কারটা ব্যবহার করা হয়েছে?’

‘কারোটা না,’ তিক্ত গলায় বলল মারুফ। ‘হ্যাকিং করা হয়েছে... অত্যন্ত দক্ষভাবে।’

‘কোন কোন ফাইল ঘাঁটা হয়েছে, তা বলতে পারবে? পুরনো কোনও সাবজেক্টের ব্যাপারে তথ্য চুরি করা হয়নি তো?’

‘ওসব আমরা এই কম্পিউটারে রাখি না, তাই সে-ভয় নেই। তবে অনেকগুলো ফাইল খোলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করা হয়েছে আমাদের টিম-মেম্বারদের পার্সোনাল ডেটাগুলোর পিছনে।’

চেহারা থমথমে হয়ে গেল রানার।

দরজায় শব্দ হলো, মনসুর এসে ঢুকেছে কমিউনিকেশন রুমে। রানার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝল, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?’

খুলে বলল মারুফ।

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল স্পেশালিস্ট টিম লিডার।
‘মাসুদ ভাই, একজনই আছে এখানে... যার কম্পিউটারে ঢোকার পাসওয়ার্ড নেই। একজনই আছে... যার আনঅথরাইজড ট্রান্সমিশন করবার দরকার হতে পারে। ড. সিদ্দিকী!’

‘তা আমি জানি না ভেবেছ?’ গম্ভীর গলায় বলল রানা।
‘কিন্তু এর পিছনে কারণটা কী, সেটা বুঝতে পারছি না। কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ভদ্রলোক... কেন? কম্পিউটারই বা ঘেঁটেছেন কেন?’

‘গিয়ে জিজ্ঞেস করব?’

‘না,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘ওভাবে পেট থেকে কথা বের করা যাবে না। স্বীকারই করবেন না হয়তো। বাস্কারের ভিতরে কোনও ক্যামেরা রাখিনি আমরা, কাজেই ছবি দেখিয়েও প্রমাণ করে দিতে পারব না যে, কাজটা ওঁর।’

‘তাই বলে চুপ করে থাকব?’ মারুফ প্রতিবাদ করল।

‘উঁহু, অন্যভাবে প্রেশার দেব ওঁকে,’ রানা বলল। ‘ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা জানার এটাই সুযোগ। সাবধানে এগোতে হবে আমাদের...’

কথা শেষ হলো না ওর, আবার দরজায় শব্দ হওয়ায় থেমে গেল। শাহরিয়ার এসেছে, হাসিখুশি চেহারায় শঙ্কা ফুটে রয়েছে। বলল, ‘আপনারা সবাই এখানে? আমি তো খুঁজে মরছি...’

‘কী ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করল মনসুর।

‘তিনটে হেলিকপ্টার ডিটেস্ট করেছে আমি... এদিকেই আসছে!’

‘হেলিকপ্টার!’

‘হ্যাঁ, কন্ট্রোল রুমে আসুন। দেখাচ্ছি।’

দ্রুত পায়ে শাহরিয়ারকে অনুসরণ করল বাকিরা, প্রায় ছুটতে ছুটতেই কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকল।

ভিতরটা নানা ধরনের টিভি স্ক্রিনে ভরা—বাস্কারের বাইরে বসানো অনেকগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিড দেখাচ্ছে। তবে সেসবের দিকে তাকাল না শাহরিয়ার, সঙ্গীদের নিয়ে গেল একপাশে বসানো একটা রেইডার কনসোলার দিকে। ওটার গোলাকার ডিসপ্লে-তে সবুজ রঙে ফুটে উঠেছে আশপাশের বিশাল একটা এলাকার প্রতিকৃতি। আঙুল তুলে তিনটে সচল

বিন্দু দেখাল ও—দ্রুত নড়ছে।

কয়েক সেকেণ্ড ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর বলল, ‘হ্যাঁ, স্পিড আর ফরমেশন দেখে হেলিকপ্টারই মনে হচ্ছে।’

‘দশ মিনিট আগে উদয় হয়েছে কপ্টারগুলো,’ বলল শাহরিয়ার। ‘হাডসন নদী ধরে এদিকে এসেছে। আমরা যে-ফ্লাইট প্ল্যান ফলো করি, অনেকটা সেটা ধরেই।’

‘কো-ইনসিডেন্স?’ প্রশ্ন করল মারুফ।

‘হতে পারে,’ মনসুর বলল। ‘হাডসনের এদিকটায় বেশ কিছু ছোট ছোট এয়ারপোর্ট আছে, অলব্যানি-তেও আছে একটা। করপোরেট রিট্রিটে যাচ্ছে হয়তো বড় কোনও ব্যবসায়ী, ওগুলোর কোনও একটা এয়ারপোর্টে নামবে। অনেক সময় ওয়াশিংটনে যাবার জন্যে পলিটিশিয়ানরাও এই রুট ব্যবহার করে।’

‘ওদের কেউ ভোর পাঁচটায় বিছানা ছাড়ে বলে মনে হয় না আমার,’ শাহরিয়ার বলল।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো—রফিক-সহ ড. সিদ্দিকী এসে ঢুকেছেন কন্ট্রোল রুমে। সবাইকে এক জায়গায় দেখে বিস্মিত গলায় জানতে চাইলেন, ‘কী হচ্ছে এখানে?’

‘তিনটে হেলিকপ্টার আসছে এদিকে, ডক্টর,’ বলল মারুফ। ‘সন্দেহজনকভাবে!’

‘কী!’ আঁতকে উঠলেন বিজ্ঞানী। ‘আমার খোঁজে নয়তো?’

‘এখুনি অস্থির হবার কিছু নেই,’ রানা বলল। ‘ওদের উদ্দেশ্য জানি না আমরা, ব্যাপারটা কাকতাল-ও হতে পারে। যদি না-ও হয়, তারপরেও চিন্তা নেই। আমাদের এই সেফ-সাইট খুঁজে বের করা সহজ নয়। এদিকে বহু পাহাড় আর

উপত্যকা আছে, দিনের পর দিন লেগে যাবে মাত্র তিনটে কন্টার দিয়ে সার্চ করে আমাদের লোকেশন বের করতে।’

‘মাসুদ ভাই!’ বলে ডিসপ্লে দেখাল শাহরিয়ার। বিন্দু তিনটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ছে হেলিকন্টারগুলো।

‘পাহাড়ী এলাকায় ঢুকছে,’ বলল মনসুর। ‘সময় বাঁচানোর জন্য ছড়িয়ে পড়ছে, অল্প সময়ে যাতে বেশি জায়গা কাভার করতে পারে।’

রফিকও এগিয়ে এসে উঁকি দিচ্ছে। বলল, ‘পণ্ডশ্রম করতে যাচ্ছে ব্যাটার। উপর থেকে কিছু দেখতে পাবে না। অন্ধের মত বেশিক্ষণ হাতড়াতেও পারবে না, ফিউয়েল ফুরিয়ে গেলে কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যেতে বাধ্য হবে।’

রানা কথা বলল না, নীরবে কন্টারগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে ও। ওগুলো কারা চালাচ্ছে, জানা নেই, তবে লোকগুলোর কাজের ধারা ওকে ভাবিয়ে তুলল। নিখুঁত নিয়মে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা, প্রত্যেকটি কন্টার আলাদা সার্চ গ্রিড বেছে নিয়েছে—সেটার উপর দিয়ে দ্রুত ছুটছে এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত। উঁচুমানের ট্রেইনিং পাওয়া সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ পার্সোনেল... সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট ছাড়া এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

মনসুরও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। বলল, ‘ব্যাটারা দেখি সিস্টেম্যাটিক্যালি সার্চ করছে!’

‘কিন্তু করছে খুব দ্রুত,’ চিন্তিত গলায় বলল রানা। ‘এখনও ঠিকমত আলো ফোটেনি বাইরে, ঠিকমত কিছু দেখতেই তো পাবার কথা নয়। নাইট-ভিশন গগলস্ থাকলেও আরও আস্তে মুভ করা উচিত, নইলে অনেক কিছু চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।

হাইলি-ট্রেন্ড কারও তো এ-ধরনের ভুল করবার কথা নয়।’

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই যার যার তল্লাশি শেষ করে ফেলল হেলিকপ্টারগুলো, উড়ে চলে গেল আরেকদিকে... নতুন তিনটে সার্চ গ্রিড বেছে নিয়েছে। এবার আগের চেয়েও দ্রুত কাজ করছে ওগুলো।

‘এ-কীভাবে সম্ভব?’ বোকা বোকা গলায় বলল শাহরিয়ার। ‘কোনও মানুষের পক্ষে এত দ্রুত একটা এলাকা ভিজুয়ালি চেক করা সম্ভব নয়।’

‘সম্ভব, যদি চেকিংটা ভিজুয়ালি করা না হয়,’ বলল রানা।

‘মানে?’ তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন ড. সিদ্দিকী।

‘আপনার আশঙ্কাটাই সত্যি হয়েছে,’ শীতল গলায় বলল রানা। ‘ওদের কাছে ইনফ্রারেড ইকুইপমেন্ট... থার্মাল সেন্সর আছে। ওরা আমাদের হেলিকপ্টারের হিট সিগনেচার খুঁজছে।’

‘পাবে না নিশ্চয়ই?’ বললেন সিদ্দিকী। ‘ওটা তো গত দু’দিন থেকে চালানো হয়নি। ইঞ্জিন-বডি... সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে।’

‘তাতে লাভ নেই,’ বলল মনসুর, গলায় উদ্বেগ। ‘ইনফ্রারেড স্ক্যানারে হেলিকপ্টারের আকৃতিটা বোঝা যাবে—ঠাণ্ডা-গরমে কিছু যাবে-আসবে না। তা ছাড়া ল্যাণ্ডিং প্যাডের হিট-প্যাটার্নও আশপাশের মাটির চেয়ে অন্যরকম দেখাবে।’

‘গুড গড!’ আতঙ্কিত গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘আমরা ধরা পড়ে যাচ্ছি?’

‘হ্যাঁ,’ স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। ‘এবং খুব শীঘ্রি। যেভাবে এগোচ্ছে ওরা, তাতে দশ মিনিটের ভিতরেই আমাদের মাথার উপর চলে আসবে।’

‘এ হতে পারে না... এ হতে পারে না...’ হিস্টিরিয়াগ্রস্তের

মত বিড়বিড় করতে শুরু করলেন ড. সিদ্দিকী।

‘ডক্টর!’ কড়া গলায় ডাকল রানা। ‘আমার দিকে তাকান!’

তাকালেন বিজ্ঞানী—চোখের তারায় আতঙ্ক ফুটে রয়েছে, গত কয়েকদিনে গড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যেন।

রেইডার ডিসপ্লের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। ‘কারা এরা?’

‘জিজ্ঞেস করছেন কেন?’ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন সিদ্দিকী। ‘মিণ্ডয়েল সান্টানার কথা বলেছি না আপনাকে?’

‘অসম্ভব!’ মাথা নাড়ল রানা। ‘যত টাকাই খরচ করুন, এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট জোগাড় করা সম্ভব নয়। ইনফ্রারেড স্ক্যানার, থার্মাল সেন্সর-মাউন্টেড এয়ারক্র্যাফট—এসব স্পেশাল মিলিটারি ইকুইপমেন্ট। সত্যি করে বলুন, কে আপনার পিছনে লেগেছে।’

‘আমি জানি না,’ টোক গিলে বললেন সিদ্দিকী। ‘সত্যি জানি না। শুধু সান্টানার কথা জানি আমি...’

লোকটার কলার চেপে ধরতে ইচ্ছে হলো রানার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—কিছু একটা লুকাচ্ছেন ড. সিদ্দিকী। সেই শুরু থেকেই এই লুকোচুরি খেলা খেলে যাচ্ছেন তিনি। আর এ-কারণে নিজের পাশাপাশি অন্যদের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন—নিউয়ার্কে রানা পড়েছিল ভাড়াটে খুনিদের সামনে... এখন গোটা স্পেশালিস্ট টিমই একটা মিলিটারি অ্যাসাল্টের মুখে পড়তে যাচ্ছে। কেন? গায়ের জোরে রহস্যটা তাঁর পেট থেকে বের করে আনতে ইচ্ছে হলো ওর।

কিন্তু এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। দশ মিনিটও সময় নেই হাতে, সঙ্গীরা সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রোধটাকে গলা টিপে মারল রানা, মারুফের দিকে তাকিয়ে

বলল, 'রেইডারে চোখ রাখো। ওরা কাছে চলে এলেই বলবে আমাকে।' এবার মনসুরের দিকে ফিরল ও। 'একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।'

'আপনিই বলে দিন কী করব, মাসুদ ভাই,' সোজাসুজি বলল স্পেশালিস্ট টিম-লিডার। 'আমি কিছু বলতে চাই না।'

'একা সিদ্ধান্ত নেব না, তোমাদের মতামত জানা দরকার। কে কে এখানেই থাকতে চাও?'

'থাকার প্রশ্ন আসছে কেন?' বিস্মিত গলায় বললেন ড. সিদ্দিকী। 'আমাদের পালাতে হবে!'

'পালালেই সব সমস্যার সমাধান হয় না, ডক্টর,' রানা বোঝাল। 'ভাল একটা ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে লড়াই করেও হামলাকারীদের হারিয়ে দেয়া যায়। আর আমাদের এই বাস্কার যে চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশন, সেটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না?'

'আমার একটা পয়েন্ট ছিল, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল রফিক। 'আমাদের সন্দেহ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে হেলিকপ্টারের ওদের কাছে শুধু খারমাল সেন্সরই না, অত্যাধুনিক সব ধরনের অস্ত্রও থাকবে। বাস্কারটা উড়িয়ে দিতে পারবে ওরা।'

'আমার মনে হয় পিছু হটাই এ-মুহূর্তে সবচেয়ে লজিকাল অ্যাকশন হবে,' যোগ করল শাহরিয়ার।

'কিন্তু যাব কীভাবে?' প্রশ্ন ছুঁড়ল মারুফ। 'হেলিকপ্টারটাকে টেকঅফ করতে দেখলেই পাগলা কুকুরের মত ছুটে আসবে ওরা। রকেট ছুঁড়ে ধ্বংস করে দিতে পারবে।'

'তা করবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'ওরা ড. সিদ্দিকীকে জ্যান্ত চায়।' নিউয়ার্কের হামলাকারীদের সতর্কতার

কথা মনে পড়ছে ওর। ‘তবে হ্যাঁ, কন্সটার নিয়ে যে পালানো যাবে না, এটা ঠিক।’

‘তা হলে?’

‘বান্ধারের আগরগাউণ্ড গ্যারাজে দুটো জিপ আছে আমাদের,’ বলে উঠল মনসুর। ‘ওগুলো নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে পারি আমরা।’

‘সমস্যা একটাই,’ শাহরিয়ার বলল। ‘থারমাল সেন্সরে জিপগুলোকেও দেখতে পাবে ওরা।’

ঠোট কামড়ে কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, ‘সবগুলোই ব্যবহার করি না কেন? দুটো জিপ আর একটা হেলিকপ্টার—একেকটা একেক দিকে যাবে। কোন্টায় ড. সিদ্দিকী আছেন, বোঝার উপায় থাকবে না ওদের। তাই কোনোটাই উড়িয়ে দেয়ার সাহস পাবে না।’

‘ডিকয় টেকনিক—চমৎকার!’ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মনসুর। ‘বেশিদূর যেতেও হবে না আমাদের। বিশ মাইল পশ্চিমে নিউ ইয়র্ক স্টেট থ্রু-ওয়ে... ওটায় উঠতে পারলেই নিশ্চিত, প্রচুর ট্রাফিক থাকে রাস্তাটায়। ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে অসুবিধে হবে না, চাইলে গাড়ি পাল্টেও নেয়া যাবে।’

‘সিদ্ধান্তটায় কারও আপত্তি আছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

দেখা গেল নেই, ড. সিদ্দিকীও চুপ করে আছেন।

‘গুড,’ বলল রানা। ‘লেটস্ গো।’

চোদ্দো

পরবর্তী কয়েক মিনিট যান্ত্রিক দক্ষতায় কাজ করল সবাই। কী করতে হবে না-হবে, তা নিয়ে আলোচনা করল না কেউ। রানা এজেন্সির অভিজ্ঞ অপারেটররা খুব ভাল করেই জানে নিজ নিজ দায়িত্ব। কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে পাশের আরেকটা রুমে গিয়ে ঢুকল ওরা—ওটা বাস্কারের অস্ত্রাগার। র্যাকে সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, একপ্রান্তের একটা কেবিনেটে রয়েছে অ্যামিউনিশন।

প্রথমেই বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট পরল সবাই, ড. সিদ্দিকীর দিকেও একটা বাড়িয়ে ধরল রানা। ‘এটা পরে ফেলুন,’ বলল ও। ‘আপনাকে খুন করতে চায় না ওরা, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি দেয়া যায় না।’

মাথা ঝাঁকিয়ে ভেস্ট পরতে শুরু করলেন বিজ্ঞানী। ততক্ষণে রফিক আর্মস্ বিতরণ করতে শুরু করেছে। পিস্তল নিল সবাই, সেইসঙ্গে একটা করে এম-১৬ অ্যাসল্ট রাইফেল। নামেই রাইফেল, আসলে ওগুলো মেশিনগানের মত ব্রাশফায়ার করতে পারে—ওভাবেই মডিফাই করে নেয়া হয়েছে। অস্ত্রটা সাধারণ মেশিনগানের চেয়ে হালকা, সহজে বহন করা যায়।

ড. সিদ্দিকীও হাত বাড়ালেন। রানা মাথা নেড়ে বলল, ‘না,

আপনার অস্ত্র নেয়ার প্রয়োজন নেই। পিস্তলই চালাতে জানেন না, রাইফেল তো আরও পারবেন না। মাঝখান থেকে হয়তো আমাদের গায়েই গুলি করে বসবেন।’

‘তা হলে আমি আত্মরক্ষা করব কীভাবে?’ প্রতিবাদ করলেন সিদ্দিকী। ‘খোদা না-করুন, আপনাদের কিছু হয়ে গেলে তো আমার হাতে একটা অস্ত্র থাকা দরকার।’

‘প্রার্থনা করুন, যাতে তেমন কিছু না ঘটে,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘আর যদি প্রার্থনাটা কবুল না-ই হয়, তা হলে আমাদের লাশের হাত থেকে অস্ত্র নিয়েই ব্যবহার করতে পারবেন আপনি।’

‘হায় আল্লাহ্! কী সব বলছেন আপনি!’

‘দেখুন, কীভাবে ফায়ার করতে হবে,’ নিজের রাইফেলটা দিয়ে ডেমনস্ট্রেশন দেখাল রানা। ‘স্টকটা কাঁধে ঠেকাবেন, ব্যারেলটা তাক করে রাখবেন টার্গেটের দিকে। দম বন্ধ করে ট্রিগার চাপবেন, ঠিক আছে? ফায়ারের সময় কিন্তু প্রচণ্ড একটা লাথি মারে এম-১৬, শক্ত করে ধরবেন, নইলে যত গুলিই করুন... সব আকাশের দিকে চলে যাবে। মনে থাকবে তো?’

‘আশা করি,’ নার্সাস গলায় বললেন সিদ্দিকী।

‘আবার বলছি, একেবারে বাধ্য না হলে অস্ত্র নেবেন না। আমরা মরলেও ক্ষতি নেই, হাত-পা ঝাড়া থাকলে সহজেই গাছগাছালির কাভার ব্যবহার করে দৌড়ে পালাতে পারবেন। হাতে অস্ত্র থাকলে স্রেফ বোঝা বাড়বে। বুঝেছেন?’

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী।

ইতোমধ্যে দৌড়ে গিয়ে কিচেনের স্টোভ আর আভেন বন্ধ করে এসেছে শাহরিয়ার। ও ফিরতেই সবার দিকে শেষবারের মত তাকাল রানা। বলল, ‘রেডি? চলো বেরিয়ে পড়ি।’

লিভিং রুম হয়ে প্যাসেজওয়ে ধরে দ্রুত এগোল দলটা। দরজার কাছে গিয়ে প্যানেলে কোড চাপল মনসুর, খুলে গেল পাল্লা। বাস্কার থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

ভোর হয়েছে, কিন্তু ঘন গাছগাছালির কারণে পুরো উপত্যকা এখনও গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। ঠিকমত কারও মুখও দেখা যাচ্ছে না। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে মাটিতে সোঁদা গন্ধ, ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। দূর থেকে ভেসে আসা রোটরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—প্রতি মুহূর্তে জোরাল হয়ে উঠছে শব্দগুলো। মারুফের দিকে তাকাল রানা, আগেই ঠিক করা হয়েছে—হেলিকপ্টার নিয়ে ও যাবে।

‘গুড লাক, মারুফ,’ বলল রানা। ‘সাবধানে থেকো।’

‘চিন্তা করবেন না,’ হাসিমুখে বলল স্পেশালিস্ট টিমের ডেপুটি। ‘ব্যাটারা অনেকক্ষণ থেকে উড়ছে, খুব বেশি ফিউয়েল বাকি আছে বলে মনে হয় না। অথচ আমার ট্যাঙ্ক একদম ভর্তি। বেশিক্ষণ ধাওয়া করতে পারবে না। সহজেই ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারব। সাবধানে বরং আপনারা থাকবেন!’

‘ঠিক আছে। যাও।’

ঢাল বেয়ে নেমে গেল মারুফ, ল্যাণ্ডিং প্যাডের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। ও দৃষ্টিসীমার আড়ালে যেতেই সচল হলো রানা, সবাইকে অনুসরণ করতে বলে এগোল আগারথাউণ্ড গ্যারাজের এন্ট্র্যান্সের দিকে।

বড় বড় কয়েকটা ঝোপের আড়ালে লুকানো দরজাটার কাছে পৌঁছে থামল ও। মনসুরকে সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করার ইশারা দিয়ে ডাকল, ‘ড. সিদ্দিকী! আমার কাছাকাছি থাকুন।’

জবাব পাওয়া গেল না, বিজ্ঞানী এগিয়েও এলেন না। বিরক্ত

ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরল রানা, চোখে বিস্ময় ফুটল ভদ্রলোককে দেখতে না পেয়ে।

‘ড. সিদ্দিকী! কোথায় আপনি?’

বাকিরাও এবার পিছনে তাকাল। সত্যিই দেখা যাচ্ছে না ড. সিদ্দিকীকে। আবছা আলোয় শুধু চোখে পড়ছে উপত্যকার গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভৌতিক অবয়ব, কোথাও কেউ নেই।

আগ্রাসী হেলিকপ্টারগুলোর আওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। শঙ্কা অনুভব করল রানা। চেষ্টা, ‘ডক্টর সিদ্দিকী!!’

নিরন্তর রইলেন বিজ্ঞানী।

‘কী আশ্চর্য!’ বিস্মিত গলায় বলল রফিক। ‘গেলেন কোথায় ভদ্রলোক?’

‘আমাদের সবার পিছনে ছিলেন সিদ্দিকী,’ শাহরিয়ার বলল। ‘পিছু পিছুই তো আসছিলেন, বাস্কার থেকে বেরুনের পর অবশ্য আর খেয়াল করিনি।’

‘এ-কথা বলিস না যে, ভদ্রলোক ভিতরেই রয়ে গেছেন!’

‘তা বলছি না। তবে ভদ্রলোক ভীষণ নার্ভাস হয়ে ছিলেন, ও-অবস্থায় ব্লাডারের চাপ বাড়ে। বাথরুমে ঢুকেছেন হয়তো।’

সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করে ফেলেছে মনসুর, গুমগুম শব্দ তুলে খুলে যেতে শুরু করল গ্যারাজ ডোরের পালা। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ও বলল, ‘নষ্ট করবার মত সময় হাতে নেই। শাহরিয়ার-রফিক, জিপদুটো নিয়ে এসো বাইরে। আমি দেখে আসছি ডক্টর বাস্কারেই রয়ে গেছেন কি না।’

‘তোমার যাবার দরকার নেই,’ রানা বলল, ‘আমি যাচ্ছি...’

‘সব কাজ আপনি করলে হবে?’ বাধা দিয়ে বলল মনসুর। ‘তা হলে আমরা আছি কীসের জন্যে? আপনি এখানেই থাকুন, অস্তর্ধান-১

মাসুদ ভাই। শাহরিয়ার আর রফিককে নিয়ে তৈরি হোন, কোনদিকে কীভাবে যেতে হবে, সেসব ঠিক করতে হবে না! আমি ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে নিয়ে আসছি।’

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না মনসুর, ছুটে চলে গেল বাস্কারের দিকে। রফিক আর শাহরিয়ারের দিকে তাকাল রানা। ‘জিপ নিয়ে এসো,’ বলল ও। ‘আমি দেখি, ডক্টর বাইরেই কোথাও আছেন কি না।’

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যারাজে ঢুকে গেল দুই অপারেটর। রানা গিয়ে ঢুকল ঝোপঝাড়ের ভিতরে, চেষ্টা করে ডাকছে সিদ্দিকীকে—কে জানে, ভয়ের চোটে কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারেন ভদ্রলোক। কিন্তু ডাকাডাকিই সার হলো, বিজ্ঞানীর খোঁজ পেল না ও। হাল ছাড়ল না রানা, ঝোপঝাড় ভেঙে খুঁজতে থাকল লোকটাকে।

আরও বেড়েছে রোটরের আওয়াজ, খুব কাছে চলে এসেছে তল্লাশিরত হেলিকপ্টার-তিনটে। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হুতই চমকে উঠল রানা—এখন পর্যন্ত মারুফের টেক-অফের শব্দ পায়নি ও। করছে কী ছেলেটা? এখনও যাচ্ছে না কেন? দেরি করলে তো পালাতে পারবে না, আটকা পড়ে যাবে।

রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেষ্টাতে শুরু করেছে—কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে! বিজ্ঞানীকে খোঁজার চেষ্টা বাতিল করে দিল ও, দ্রুত ছুটল ল্যাণ্ডিং প্যাডের দিকে। জানতে হবে—মারুফ এখনও টেকঅফ করেনি কেন। সমস্যাটা কোথায়।

কাছাকাছি পৌঁছুতেই হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল ও, সবসময়ের মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হয়নি। মাথার উপর ক্যামোফ্লাজ নেটটাও আকাশ ঢেকে

রেখেছে আগের মত—সরানো হয়নি। আরেকটু এগোতেই নাকে ভেসে এল ঝাঁঝাল গন্ধ—এভিয়েশন ফিউয়েল! গন্ধের তীব্রতায় মনে হচ্ছে বড়সড় একটা লিক ঘটেছে ওখানে। তীক্ষ্ণ চোখে মারুফকে খুঁজল রানা, কিন্তু সামান্যতম নড়াচড়াও চোখে পড়ল না।

মন কু-ডাক ডাকছে, প্যাডের দিকে দৌড়াতে শুরু করল রানা... কিছু একটা ঘটেছে ওখানে—খারাপ কিছু! বেশিদূর যেতে পারল না ও, হঠাৎ পা বেধে গেল কীসের সঙ্গে যেন, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সোজা হয়ে পতনের আঘাতটা সয়ে নিল রানা, উঠে বসল। এম-১৬টা হাত থেকে ছুটে পড়ে গেছে, ওটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও কয়েক মুহূর্ত পরেই, এবার মাটির দিকে তাকাল কীসের ঠোকর খেল দেখার জন্য। পরমুহূর্তেই বুক খামচে ধরল কী যেন—দৃশ্যটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে স্পেশালিস্ট টিমের ডেপুটি, নিখর দেহ নিয়ে, ওর সঙ্গেই পা বেধে পড়ে গেছে রানা। মারুফের পিঠ থেকে বেরিয়ে আছে একটা ছুরির হাতল, পিছন থেকে ছোরা মারা হয়েছে ওকে, ল্যাণ্ডিং প্যাডে পৌঁছতেই পারেনি বেচারী! ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে তাজা রক্ত, ভিজিয়ে ফেলছে চারপাশ। তাড়াতাড়ি পালস্ চেক করল রানা, তাতে লাভ হলো না। আগেই মারা গেছে মারুফ।

বিহ্বল হয়ে গেছে রানা, বিশ্বাস করতে পারছে না—এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথাও ঘামাতে পারল না, হঠাৎ চোখের কোণে কমলা আভা দেখে ঝট করে ঘুরল। লেলিহান শিখা দেখে থমকে গেল ও, চোখের পলকে গোটা ল্যাণ্ডিং প্যাডটাকে গ্রাস করল সেই আগুন, ছড়িয়ে অন্তর্ধান-১

পড়ছে চারপাশের বনে-বাদাড়েও। এতক্ষণে গোটা আয়োজনটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে—শুধু মারুফকে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি খুনি, হোস ব্যবহার করে এভিয়েশন-ফিউয়েল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে পুরো প্যাড আর আশপাশের গাছপালা, তীব্র ঝাঝাল গন্ধটা এজন্যেই পাচ্ছিল ও। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে নজর বোলাল রানা—আগুনটা কে লাগাল, দেখার জন্য। কিন্তু নেই কেউ, সম্ভবত সলতে-টলতে জাতীয় কিছুতে আগুন দিয়ে কেটে পড়েছে আগেই।

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাড়ছে আগুনটার পরিধি—অস্বাভাবিক নয় সেটা, এভিয়েশন-ফিউয়েল পৃথিবীর সবচেয়ে দাহ্য পদার্থগুলোর একটা। কাঁচা গাছপালা, ঝোপঝাড়... সব অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে আগুনের কাছে, চড়চড় করে পুড়ছে ওগুলো। চামড়ায় তীব্র আঁচ অনুভব করে নিজের অজান্তেই দু'পা পিছিয়ে গেল রানা, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। অসহায়ভাবে তাকাল মারুফের লাশের দিকে, ওকে আগুনে ফেলে রেখে যেতে মন চাইছে না, আবার লাশটা সঙ্গে নিলেও বাকিদের কাছে দ্রুত পৌঁছুতে পারবে না। ইতোমধ্যে ওদের হেলিকপ্টারটাকে গ্রাস করেছে আগুন, ফিউয়েল ট্যাঙ্কে পৌঁছুলেই বিশাল বিস্ফোরণ ঘটবে। ক্যামোফ্লাজ নেটটাও পুড়তে শুরু করেছে। সেফ-সাইটের অস্তিত্ব ফাঁস হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখুনি সরে যেতে হবে ওদের।

কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল রানা, তারপর ভাবাবেগটাকে দমন করে উল্টো ঘুরেই ছুটেতে শুরু করল বাস্কারের দিকে। একটু পরেই পিছনে গগনবিদারী শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল—দূর থেকেও পিঠে শকওয়েভের ধাক্কা অনুভব করল ও। তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল পুরো উপত্যকা, চোখ ঝলসে যেতে

চাইল।

থামল না রানা, ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটতে থাকল গ্যারাজের এন্ট্র্যান্সের দিকে। একটু পরেই ঢালের গোড়ায় পৌঁছে গেল ও, দূর থেকে দেখতে পেল জিপদুটোকে—গ্যারাজ থেকে বের করে এনেছে শাহরিয়ার আর রফিক। ড্রাইভিং সিটে হতচকিত চেহারা নিয়ে বসে আছে দুজনেই—আগুন আর বিস্ফোরণের শব্দে বোকা বনে গেছে। মনসুরকে দেখা গেল না, এখনও ফেরেনি বোধহয়। ওকে উদয় হতে দেখে চেষ্টা করে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল শাহরিয়ার, কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না।

রানার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে দুটো রকেট এসে আঘাত করল জিপগুলোকে। নিমেষে আগুনের গোলায় পরিণত হলো বাহনদুটো, টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। দুই আরোহীও একই সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

বজ্রাহতের মত থমকে গেল রানা, কোনোমতে মাথা ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই একটা অ্যাসল্ট চপার দেখতে পেল, ডানায় রকেট লঞ্চার বসানো আছে... ওখান থেকেই ছোঁড়া হয়েছে রকেটগুলো। জিপদুটোকে ধ্বংস করে এবার রানার দিকে মনোযোগ দিল চপারের আরোহীরা, হোভার করতে করতে ক্রমশ ওটা ঘুরে যাচ্ছে ওর দিকে।

নিজেকে নাগ্না মনে হলো রানার কাছে, কোনও কাজ নেই কাছাকাছি, পাহাড়ি ঢালে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় রকেট তো দূরের কথা... বুলেটের হাত থেকেও বাঁচাতে পারবে না ওকে। চপারের নাক এখন রানার দিকে, ফিউজলাজের তলায় বসানো হেভি মেশিনগানটা তাক হয়ে গেছে একই সঙ্গে। মাজল স্ক্যাশ দেখা যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। ঠিক তখনই ঢালের আরেক পাশে উদয় হলো একটা ছায়ামূর্তি, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে

এম-১৬ থেকে অব্যাহত ধারায় গুলি ছুঁড়তে শুরু করল চপারের উপর—রানার দিক থেকে ওটার গানারের মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে চায়।

‘মাসুদ ভাই!’ ডাক শোনা গেল। ‘চলে আসুন এদিকে!’

মনসুর। বাস্কার থেকে বেরিয়ে এসেছে ও।

ডাক শুনে ঝট করে বাস্কারের এন্ট্রান্সের দিকে ঘুরল রানা। ছুটে শুরু করল। পিছনে গর্জে উঠল হেলিকপ্টারের হেভি মেশিনগান, রানাকে না পেয়ে কামড় বসাল মাটিতে—ধুলোর ঝড় উঠল ওর পিছনে, একই সঙ্গে ছিন্নভিন্ন ঝোপঝাড় উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা, গানার যেন লক্ষ্যস্থির করতে না পারে। শরীরের খুব কাছ দিয়ে বেশ কিছু বুলেট ছুটে গেল, তবে কাজ হলো কৌশলটাতে, ওর গায়ে লাগল না একটাও। হেলিকপ্টার-মাউন্টেড মেশিনগান আসলে বড় আকারের স্থির গ্রাউণ্ড-টার্গেট ধ্বংস করার জন্য উপযোগী অস্ত্র, ওটা দিয়ে ছুটন্ত একজন মানুষকে ঘায়েল করা কঠিন।

বাস্কারের এন্ট্রান্স বেশি দূরে নয়, খুব দ্রুত ওখানে পৌঁছে গেল রানা, মনসুরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল প্যাসেজওয়েতে, কনসোলার বাটন টিপে বন্ধ করে দিল দরজাটা। দু’সেকেণ্ড পরেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ওপাশটা—রকেট ছোঁড়া হচ্ছে এন্ট্রান্স লক্ষ্য করে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, এত সহজে ভাঙবে না দরজাটা। সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করল ও শান্তভাবে—ভুলক্রমে যাতে কাজটা বাদ না পড়ে, তা হলে নকআউট গ্যাস ছড়িয়ে গিয়ে ওদেরকেই বেহঁশ করে ফেলবে।

কনসোলে সবুজ বাতি জ্বলতেই ঘুরল ও, মুখোমুখি হলো

মনসুরের। স্পেশালিস্ট টিম-লিডারের চেহারায় একটা বিহ্বল ভাব ফুটে আছে, হঠাৎ করে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখে হতচকিত হয়ে গেছে ও। রানাকে ঘুরতে দেখে কোনোমতে শুধু বলল, ‘মাসুদ ভাই, রফিক আর শাহরিয়ার...’

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। ‘সরি, প্রথম রকেটদুটো ওদেরকেই হিট করেছে...’

‘আর মারুফ?’

‘ল্যাণ্ডিং প্যাডের পাশে পেয়েছি ওকে... পিঠে ছুরি মারা অবস্থায়।’

‘কী!’ প্রায় চৈঁচিয়ে উঠল মনসুর।

‘এসব নিয়ে আলোচনার এখন সময় নেই,’ রানা বলল।

‘ড. সিদ্দিকীকে পেয়েছ?’

নিজেকে সামলে মনসুর বলল, ‘ভিতরে নেই ভদ্রলোক। তবে পিছনের ইমার্জেন্সি একজিটটা খোলা পেয়েছি আমি—বিপদ দেখে ওখান দিয়েই বেরিয়ে গেছেন হয়তো। আর একটা ব্যাপার... দরজাটার তলায় গাঁজ লাগানো ছিল, যাতে আবার ওখান দিয়ে বাস্কারে ঢোকা যায়। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অবস্থা বেগতিক দেখলে আবার ফিরে আসার প্ল্যান করেছেন।’

‘বন্ধ করেছে ওটা?’

‘সময় পাইনি, তার আগেই তো নরক ভেঙে পড়ল। এখন যাব?’

‘আগে কন্ট্রোল রুমে চলো, বাইরের অবস্থা দেখে নিই। আমাদেরকেও হয়তো পিছনের দরজাটা দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে, খামোকা বন্ধ করে লাভ নেই।’

মনসুর-সহ কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকল রানা—মনিটরিং
অন্তর্ধান-১

কনসোলটা চালু রেখে গিয়েছিল মারুফ, ওটার দিকে তাকাল। বেশ কিছু স্ক্রিন ফিড হারিয়েছে—ঝিরঝির করছে ওগুলো, সম্ভবত বাইরে বসানো ক্যামেরাগুলো আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে। যে-ক'টা অক্ষত আছে, সেগুলো থেকে দেখা গেল—আগুনটা বিশাল আকার ধারণ করেছে, উপত্যকার বেশিরভাগ অংশই এখন লেলিহান শিখার দখলে। চোখের সামনে আরও কয়েকটা মনিটর ঝিরঝিরিতে ঢেকে গেল—বাইরের ক্যামেরাগুলো একে একে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একটা স্ক্রিনে হামলাকারী কণ্টারগুলোকেও দেখা গেল—হোভার করতে করতে রকেট ছুঁড়ছে বাস্কারের প্রবেশপথের দিকে। অবশ্য তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই—দরজাটা পুরা টাইটেনিয়ামের তৈরি, সহজে ভাঙবে না।

নাকে একটা কটু গন্ধ ভেসে আসতেই মনসুরের দিকে তাকাল রানা। ‘ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছ?’

‘নিশ্চয়ই ভেন্টিলেশন শাফট দিয়ে আসছে,’ বলল মনসুর। কনসোলের একটা বাটন চাপল। ‘মুখটা বন্ধ করে দিলাম। এখন আর বাইরের বাতাস বা ধোঁয়া ঢুকবে না। ভিতরে যা বাতাস আছে, তা দিয়ে আগামী দু’দিন কাটিয়ে দিতে পারব আমরা। অবশ্য না পারলেও ক্ষতি নেই। ফিউয়েল শেষ হয়ে গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে যেতেই হবে ওদের।’

‘যাবার আগে কয়েকজনকে নামিয়ে রেখে যেতে পারে,’ বলল রানা। ‘নাহ্, কোণঠাসা হওয়া যাবে না, তার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।’

‘ঠিক বলেছেন,’ মাথা ঝাঁকাল মনসুর। ‘কিন্তু সান্টানা এভাবে মরিয়া হয়ে উঠল কেন, বুঝতে পারছি না। যেভাবে হামলা চালাচ্ছে, তাতে আমাদের পাশাপাশি তো ড. সিদ্দিকীও

মারা পড়তে পারেন।’

‘এরা কলাম্বিয়ান নয়... হতে পারে না,’ বলল রানা, কণ্ঠে নিশ্চিত ভাব। সামনের স্কিনগুলোর উপর দ্রুত চোখ বোলাচ্ছে ও—ওগুলোর আউটপুট প্রতি-মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট তীব্র আলোর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হতে পারছে না লেন্সগুলো। ‘সান্টানার কাছে এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট থাকতে পারে না।’

‘তা হলে কে...’

কথা শেষ হলো না মনসুরের, তার আগেই মাথার উপরের ভেন্টিলেশন ডাক্ট দিয়ে ভক ভক করে ঢুকে পড়ল রাশ রাশ কালো ধোঁয়া, পুরো রুমটাকে ছেয়ে ফেলছে। কাশতে শুরু করল রানা ও মনসুর, নাক আর গলা জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছে... ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে।

‘শাফটের মুখ বন্ধ হয়নি, মনসুর,’ কোনোমতে কাশি সামলে বলল রানা।

‘কী বলছেন!’ বলল মনসুর। ‘হবে না কেন? আপনার সামনেই তো বন্ধ করলাম। সিস্টেমে কোনও ত্রুটি থাকলে লাল বাতি জ্বলত।’

‘তা হলে ধোঁয়া আসছে কোথেকে?’

‘কী জানি!’ বোকা বোকা দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকাল মনসুর। ‘বুঝতে পারছি না।’

ঘন কালো ধোঁয়া নেমে আসছে ডাক্টের ছাকনি ভেদ করে। কয়েক সেকেন্ড স্থির রইল স্পেশালিস্ট টিম-লিডার, তারপর হঠাৎই সচকিত হয়ে উঠল ও। দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘মাসুদ ভাই, গন্ধটা...’

রানাও চিনতে পেরেছে। ‘এভিয়েশন ফিউয়েল!’ ঝট করে

ডাক্টর দিকে তাকাল ও, তারপর মনসুরের দিকে। ‘বেরোও!
এখানে থাকা চলবে না!’

দরজা খুলে ছিটকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা আর মনসুর, সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল। চোখের সামনে পুরো বাস্কারের ভিতরটায় আগুনের উদ্বাহ নৃত্য দেখতে পাচ্ছে, অভিশেষন ফিউয়েলের তীব্র গন্ধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে জায়গাটা। পিছনে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ হলো—ভেণ্টিলেশনের ছাকনিটা ভেঙে গেছে.... ডাক্ট ধরে আগুনের শিখা পৌঁছে গেছে কন্ট্রোল রুমে।

‘ইয়াল্লা... ক্...কীভাবে...’ থতমত খেয়ে গেছে মনসুর, মুখের কথা আটকে যাচ্ছে।

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। এটা দুর্ঘটনা নয়, আগুনটা শাফট দিয়ে ভিতরে ঢোকেনি। সিকিউরিটি ক্যামেরায় ও দেখতে পেয়েছে, পাহাড়ের মাথায়... যেখানে শাফটের মুখ... বাইরের দাবানল এখনও ওখান পর্যন্ত পৌঁছেনি। সেক্ষেত্রে ভিতরে আগুন লাগার একটাই কারণ থাকতে পারে।

স্যাবোটাজ!

কিন্তু কে এই কাজ করল, কীভাবে করল, কেন করল... এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন। আগে নিজেদের বাঁচতে হবে। ভিতরের আগুন এখনও ততটা তীব্র হয়ে ওঠেনি, ওটা ওদের আটকে ফেলার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে বাস্কার থেকে। মনসুরের হাত ধরে টান দিল রানা। ‘এসো, বেরোতে হবে!’ ●

‘সামনের দিকে যাওয়া যাবে না,’ কাশতে কাশতে বলল মনসুর। ‘হেলিকপ্টারগুলো আছে ওখানে, আগুনও বেড়ে গেছে।’

‘পিছনের ইমার্জেন্সি একজিটটা ব্যবহার করব,’ বলল রানা।
‘ওদিককার জঙ্গলে এখনও আগুন পৌঁছায়নি।’

ছুটতে ছুটতে করিডর পেরিয়ে লিভিং এরিয়ায় বেরিয়ে এল ওরা—এখানে আগুনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। আগুনের পয়েন্ট অভ অরিজিন বোধহয় এটাই।

ব্যস্ত চোখে জ্বলন্ত লিভিং এরিয়ার উপর নজর বোলাল রানা, ভাবছে এই নরক ভেদ করে কীভাবে অন্যপাশে যাবে। দেখতে পেল একটা পথ, মনসুরকে দেখিয়ে বলল, ‘এগোও, আমি পিছনে আছি!’

ডানদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে এগোতে শুরু করল দুজনে একজিট ডোরের দিকে, ওখানটায় এখনও সামান্য ফাঁকা জায়গা রয়েছে। তারপরেও উন্মুক্ত মুখ আর শরীরের সামনের অংশে তীব্র হলকা লাগল, বেশিক্ষণ থাকলে আগুন ধরে যাবে পোশাকে। ভাগ্য ভাল, উত্তাপটা অগ্রাহ্য করে দ্রুত ওরা পৌঁছে যেতে পারল অন্যপাশে। বেরুনোর দরজাটা এখন মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

লাথি মেরে দরজার তলায় লাগানো গৌজটা খুলল মনসুর, তারপর হাতল টেনে খুলে ফেলল পাল্লাটা। দুজনে বেরিয়ে গেল জ্বলন্ত বান্ধার থেকে। ওপাশটায় সামনের দিকের মত আরেকটা কংক্রিটের প্যাসেজওয়ে আছে, সেটা ধরে ছুটতে থাকল ওরা—সামনে স্পেশালিস্ট টিম লিডার, পিছনে রানা। ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে খোলা দিকটা থেকে, সবুজ অরণ্য দেখে বোঝার উপায়ই নেই, ছোট্ট পাহাড়টার ঠিক উল্টোপাশে কী তাগুব চলেছে।

প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে... এমন সময় হঠাৎ ঝাঁকি খেল মনসুর, চিৎকার করে ছিটকে গেল পিছনে। তৈরি ছিল না
‘অন্তর্ধান-১

রানা, ভারী দেহটা গায়ের উপর পড়তেই ভারসাম্য হারাল, হুড়মুড় করে সঙ্গীসহ পড়ে গেল প্যাসেজের মেঝেতে। দুজনের হাত থেকেই ছুটে কয়েক হাত দূরে চলে গেল এম-সিক্সটিন।

সামনে কী ঘটেছে দেখতে পায়নি রানা, কানে শুধু ভেসে এল অটোমেটিক রাইফেলের গুরুগম্ভীর গর্জন... এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে কেউ ওদের লক্ষ্য করে। মাথার উপর দিয়ে মাতালের মত ছুটেছে এলোমেট্রো বুলেট, কংক্রিটে ঘষা খেয়ে ফুলকি ছোটাচ্ছে, প্রতিধ্বনি তুলছে।

যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ করে থেমে গেল গুলিবর্ষণ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কর্ডাইটের গন্ধ। মনসুরের দেহের নীচে চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে উঠল রানা, বাম কাঁধে প্রচণ্ড একটা আঘাত লেগেছে কীভাবে। গাছের সারি থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ কানে এল ওর—মনে হলো, অ্যাসল্ট রাইফেলের ফায়ারিং চেম্বারে আটকে যাওয়া শেল খোলার চেষ্টা করছে কেউ।

গায়ের উপর নিস্তেজ হয়ে রয়েছে মনসুর। রানা ডাকল, 'মনসুর!'

জবাব পাওয়া গেল না।

'মনসুর, সরো।'

এবারও নিরস্তুর স্পেশালিস্ট টিম লিডার। নাক কোঁচকাল রানা, কর্ডাইটের গন্ধ ছাপিয়ে কটু আরেকটা গন্ধ পাচ্ছে... রক্তের! তাড়াতাড়ি নিস্তেজ দেহটা দুহাতে ঠেলে সরাল ও, উঁচু হলো কনুইয়ে ভর দিয়ে... এবং থমকে গেল।

চেহারা, চেনার আর জো নেই, অন্তত তিনটে বুলেট আঘাত করেছে মনসুরকে, উড়িয়ে নিয়ে গেছে মুখমণ্ডল। ঘন লাল রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষতগুলো থেকে। নিজের কাঁধটার দিকে তাকাল

ও—হ্যাঁ, গুলি লেগেছে ওর-ও। কেভলার ভেস্টের স্ট্র্যাপ আর গলার মাঝখানের উন্মুক্ত অংশটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট, রক্ত বেরুচ্ছে... ব্যথা লাগছিল সেজন্যেই।

জঙ্গলের দিক থেকে শাপশাপান্ত ভেসে আসতেই চমক ভাঙল রানার, মাথা ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকে তাকাল ও। বাতাসে একটা ঝোপের পাতা নড়ে উঠতে দেখল, আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়—ড. সিদ্দিকী! হাতে একটা রাইফেল রয়েছে বিজ্ঞানীর... ঠিক মারফেরটার মত! ককিং মেকানিজম নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে লোকটা, নিশ্চয়ই আবার গুলি করবার মতলব!

পরমুহূর্তেই চেম্বারে জ্যাম হয়ে থাকা শেলটা খসে পড়বার আওয়াজ পেল রানা, ড. সিদ্দিকীর চেহারাটা খুশি খুশি হয়ে উঠতে দেখল। ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও, অস্ত্র কুড়ানোর সময় নেই, তাই উল্টো ঘুরে খালি হাতেই ফের ছুটল বাস্কারের দিকে। পিছনে গর্জে উঠল সিদ্দিকীর রাইফেল, এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে এল রানার ডাইনে-বাঁয়ে। একজিট ডোরের আধখোলা পাল্লাটা ঠেলে ডাইভ দিল ও, ঢুকে পড়ল বাস্কারের ভিতরে। পা দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ওপাশে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শোনা গেল—নিশানা ঠিক করে ফেলেছেন বিজ্ঞানী, প্রতিটা বুলেট এসে বিঁধছে এখন দরজায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে দরজা আর পিছনের আগুনের দিকে পালা করে তাকাল রানা।

ফাঁদে পড়ে গেছে ও।

পনেরো

তীব্র একটা ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রানার ভিতরে। ইচ্ছে হলো এফুনি ড. সিদ্দিকীকে ধরে এনে খুন করে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। একজিট ডোরের ওপাশের প্যাসেজওয়ায়ে এখন শুটিং গ্যালারিতে পরিণত হয়েছে, দরজা খুললেই ওকে মোরব্বার মত কেঁচে ফেলবে বিজ্ঞানীর ছোঁড়া বুলেটবৃষ্টি। একটু আগেও তা-ই ঘটতে চলেছিল, শুধুমাত্র মনসুর সামনে থাকায় এবং সিদ্দিকীর রাইফেল জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বেঁচে গেছে ও।

কিন্তু এখানেও থাকা চলে না—মোরব্বা হবে না বটে, কিন্তু আগুন ওকে রোস্ট বানিয়ে ফেলবে। উভয় সঙ্কটে পড়েছে রানা। বেরুনোর বিকল্প রাস্তা হচ্ছে সামনের এন্ট্রান্সটা, কিন্তু সিকিউরিটি ক্যামেরা নষ্ট হবার আগে ওদিককার প্যাসেজটায় আগুন ধরে যেতে দেখেছে ও, ঢালের কাছাকাছিও দাবানল পৌঁছে গেছে। হামলাকারী চপার-তিনটে তো আছেই। ওখান দিয়ে কি আদৌ বেরুনো সম্ভব? আরেকটা গোপন পথ আছে অবশ্য... একটা টানেল, ওটার কথা ড. সিদ্দিকীকে জানায়নি ওরা। টানেলটা অ্যামিউনিশন রুমের ভিতর থেকে সোজা চলে গেছে হেলিপ্যাড পর্যন্ত। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড শুরুই হয়েছে ওই হেলিপ্যাড থেকে, আগুনের তীব্রতা তাই সবচেয়ে বেশি হবার

কথা ওখানটায়। তা ছাড়া সংকীর্ণ টানেলটায় বাতাস কী পরিমাণ আছে, কে জানে। ধোঁয়া ঢুকে পড়লে সর্বনাশ হবে। সবদিক ভেবে টানেলটা ব্যবহারের পরিকল্পনা বাতিল করে দিল রানা।

আর কোনও বুদ্ধি আসছে না মাথায়, কী করবে—বুঝে উঠতে পারছে না ও। হঠাৎ নজর পড়ল কাঁধের দিকে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে। ওটা না থামালে আগুন বা গুলির চেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি দেয়াল ঘেষে লিভিং এরিয়া পেরুল রানা, করিডর ধরে ছুটল কিচেনের দিকে... ওখানে ফাস্ট এইড কিট আছে।

ফুসফুসে কালো ধোঁয়া ঢুকছে, খক খক করে কাশতে শুরু করল ও। ডান হাত ভাঁজ করে নাক-মুখ ঢাকল রানা, এলোমেলো পায়ে এগোতে থাকল—শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। কমে গেছে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ, রিফ্লেক্স কাজ করছে না ঠিকমত, রক্তক্ষরণে দুর্বলও হয়ে পড়েছে ও। চোখদুটোও জ্বালাপোড়া করছে ভীষণ।

লিভিং এরিয়া থেকে কিচেনের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু এসব সমস্যার কারণে ওটুকুই পেরুতেই যেন যুগ-যুগান্তর লেগে গেল। ভিতরে ঢুকে সামান্য স্বস্তি অনুভব করল রানা, এখানে এখনও আগুন পৌঁছেনি। কিন্তু কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলেছে অভ্যন্তর, তার মধ্যেই দেয়াল হাতড়ে ফাস্ট এইড বক্সটা খুঁজে বের করল ও।

কাঁপা কাঁপা হাতে বক্সটা খুলল রানা, টান দিয়ে ভিতরের সমস্ত জিনিস এনে ফেলল কিচেনের কাউন্টারের উপর। লাল রঙের কয়েকটা পাউচ রয়েছে ওর মধ্যে, প্রত্যেকটার ভিতরে হাতের মুঠি আকারের ব্লাড-স্টপার গজ থাকে। কিন্তু দরজায় অন্তর্ধান-১

আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠতে দেখে ও বুঝতে পারল, ব্লাড-স্টপার ব্যবহার করে ড্রেসিং নেবার সময় নেই, তার আগেই পুড়ে মরবে। তাই ঝট করে রূপালি রঙের এক রোল ডাক্ট-টেপ তুলে নিল, মাথাটা খুলে ওটা থেকে দুটো টুকরো বের করল। শার্টের হাতা ছিঁড়ে ঘাড়ে লেগে থাকা রক্ত মুছল রানা, তারপর টেপের টুকরোদুটো ক্রস আকারে বসিয়ে দিল ক্ষতের উপর। টেপদুটো হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরল ও, আঠালো দিকটা এর ফলে ভালমত আটকে গেল চামড়ায়, রক্তপাত বন্ধ হলো সাময়িকভাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ হতেই আবার ছুটল রানা, আগুনের শিখা টপকে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে। লিভিংরুমের পাশেই একটা বাথরুম আছে, ঢুকল গিয়ে ওটায়। শাওয়ার ছেড়ে পুরো শরীর ভালমত ভেজালো ও, তারপর একটা টাওয়েল ভিজিয়ে পাগড়ির মত বেঁধে ফেলল মাথাতে। শরীর ভিজে যাওয়ায় আগুন কিছুটা সময় ওর নাগাল পাবে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রথমে আশপাশের রুম আর করিডর থেকে তিনটে ফায়ার-এক্সটিংগুইশার জোগাড় করল ও, তারপর ছুটতে শুরু করল বাস্কারের এন্ট্র্যান্সের দিকে। বেরুনোর জন্য ওই পথটাই ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে—আগুন আছে বটে, তবে সেটা এক দিক থেকে সুবিধেজনক ওর জন্যে। হামলাকারী চপারগুলোর আরোহীরা আগুনের ভিতর ওকে দেখতে পাবে না, আগুনের কারণে নীচে নামারও সাহস পাবে না। একটু বুদ্ধি খাটালেই ওখান দিয়ে পালানো সম্ভব।

দরজার কাছে এসে এক্সটিংগুইশারগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। আল্লাহ-খোদার নাম জপে সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ

করল—অটোমেটিক তালাটা না খুললে সর্বনাশ হবে! তবে ওর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন সৃষ্টিকর্তা, কোড টেপা শেষ হতেই সবুজ বাতি জ্বলে উঠল কনসোলে, তালার বোল্ট সরে যাবার মৃদু খুট শব্দও শোনা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাতলে হাত দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাহতের মত পিছিয়ে গেল। ধাতব হাতলটা ভীষণ গরম হয়ে আছে!

পকেট থেকে রুমাল বের করল রানা, ওটার সাহায্যে ধরল আবার হাতলটা, মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল। পাল্লাটা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো ও। এবারও উত্তাপ অনুভব করছে, তবে সেটা শুধু হাতে নয়, সারা শরীরে! খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে আগুনের হলকা, যেন হিংস্র পশু, কামড় বসাচ্ছে গায়ে।

এন্ট্রান্স ডোরের ওপাশে প্যাসেজওয়েটা জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়েছে। শোঁ-শোঁ করে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল বাতাসের। চরম উত্তাপ বান্ধারের ভিতরের সমস্ত অক্সিজেন শুষে নিচ্ছে। দৃশ্যটা ভয়াবহ।

তবে বিচলিত হলো না রানা, কীভাবে এই আগুনকে মোকাবেলা করবে, তা ঠিক করে ফেলেছে আগেই। পিছন থেকে এক্সটিংগুইশার তিনটে তুলে নিল ও, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্বলন্ত প্যাসেজওয়ে-র ভিতরে ছুঁড়ে দিল একে একে। ঠং ঠং করে আছড়ে পড়ল ওগুলো। নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে গেল রানা। অপেক্ষা করছে ফলাফল দেখবার জন্য।

উচ্চচাপে ধাতব সিলিঙারে ভরে রাখা হয় অগ্নিনির্বাপনী কেমিক্যালগুলোকে। ও আশা করছে, আগুনের তাপে সিলিঙারের বহিরাবরণ দুর্বল হয়ে গেলে বিস্ফোরণ ঘটবে। এতে শকওয়েভের ধাক্কায় সমস্ত বাতাস সরে যাবে, অক্সিজেন

না পেয়ে আগুনটা বাধ্য হবে নিভে যেতে। এভাবে বিস্ফোরণের মাধ্যমে তেল ও গ্যাসকূপের আগুন নেভানো হয়, জানা আছে রানার। এখানে কতদূর কার্যকর হয় কৌশলটা—সেটাই দেখার বিষয়।

কয়েক সেকেন্ড পরই বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। দরজা থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল রানা, তারপরও শকওয়েভের ধাক্কাটা এসে বুকে লাগল ঘুসির মত। পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে দেয়াল ধরে তাল সামলাল। আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটতেই লাফ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও, ছুটে আসা শকওয়েভের হাত থেকে বাঁচল এবার—শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল ওটা। তৃতীয় বিস্ফোরণটা ঘটল ঠিক দু'সেকেন্ড পর। শকওয়েভটা চলে যেতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, দরজা পেরিয়ে প্যাসেজওয়ায়েতে ঢুকে পড়ল।

পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই কাজ হয়েছে বিস্ফোরণে। প্যাসেজের অনেকখানি অংশ ফাঁকা দেখতে পেল রানা—আগুন নিভে গেছে। এক্সটিংগুইশার থেকে ছিটকে বেরুনো কেমিক্যালও ভূমিকা রেখেছে এতে।

দম বন্ধ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রানা, ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেল নিমেষে, সামনে আবার আগুনের দেয়াল দেখতে পেল, কিন্তু থামল না। জ্বলন্ত শিখা ভেদ করে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে এসে ডাইভ দিল বাইরে। ঢালের উপর কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়ল ও, ঝোপঝাড় ভেঙে গড়াতে শুরু করল নীচে। বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা বড় পাথর পড়ল, সেটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল গড়ানো। ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠল ও।

কয়েক সেকেন্ড নিস্পন্দভাবে পড়ে রইল রানা, আঘাতটা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। এই ফাঁকে আশপাশটা ব্যস্ত চোখে

জরিপ করল ও—দাউ দাউ করে জ্বলছে গাছপালা, পাহাড়ের ঢাল আর জঙ্গল অনেকটাই গ্রাস করে ফেলেছে আগুন। চপারগুলোও যায়নি, নিরাপদ দূরত্বে থেকে হোভার করছে।

উঠে দাঁড়াল রানা। মাথা থেকে খুলে ফেলল টাওয়েলটা—সারা শরীরের মতই ওটা তীব্র উত্তাপে খটখটে শুকনো হয়ে গেছে। রোটরের গর্জন বেড়ে যেতে শুনে শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা তুলে তাকাল, ওকে দেখে ফেলেছে নাকি? কিন্তু না, ওর দিকে নয়, ঢালের যে-পাশটায় আগুন ঠিকমত পৌঁছায়নি, সেদিকে গিয়ে পজিশন নিয়েছে দুটো চপার।

দুপাশের হ্যাচ খুলে যেতে দেখল রানা, সেখান দিয়ে দড়ি ফেলা হলো, কয়েক মুহূর্ত পরেই র‍্যাপলিং করে নামতে শুরু করল কয়েকজন মানুষ। মোট পাঁচজন—প্রত্যেকের পরনে কালো রঙের কমব্যাট ফেটিং, পিঠে ঝুলছে কম্প্যাক্ট সাবমেশিনগান, মাথায় হেলমেট আর কানে ইয়ারফোনও রয়েছে। লোকগুলোর গতিবিধি মুগ্ধ করবার মত—বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই, সহজ-সাবলীলভাবে দড়িতে পিছলে নেমে আসছে। সন্দেহ নেই, উঁচু মানের ট্রেইনিং পাওয়া সৈনিক এরা।

ধীরে ধীরে ঢাল ধরে নেমে যেতে শুরু করল রানা, যা-দেখার দেখে ফেলেছে। খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, মিগুয়েল সাগ্টানা কেন, দুনিয়ার কোনও ড্রাগলর্ডের পক্ষেই এ-ধরনের প্রশিক্ষিত সৈনিক ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র মিলিটারিতেই এ-ধরনের ট্রেইনড্ পার্সোনেল থাকে, তা-ও আবার সব শাখায় নয়, শুধুমাত্র স্পেশাল অপারেশন্সে! টাকা খরচ করে এসব লোক ভাড়া করা যায় না।

হেলিকপ্টারগুলোকে আবার নড়তে দেখে সংবিৎ ফিরল অন্তর্ধান-১

ওর—বিপদ কাটেনি। দাবানলে আক্রান্ত জঙ্গলের উপর ট্যাকটিক্যাল পজিশন নিতে যাচ্ছে ওগুলো, যাতে ওদের গ্রিড ভেদ করে কেউ পালাতে না পারে। নীচে তল্লাশি চালাবে গ্রাউণ্ড-টিম, উপর থেকে চপারগুলো থারমাল সেন্সরের মাধ্যমে লুকআউট রাখবে—একেবারে ছক-বাঁধা প্রসিডিওর ফলো করছে হামলাকারীরা।

আগুন এড়িয়ে চলতে পারবে না রানা, ওকে দেখতে পাবে ওরা। দৌড়ুনোও যাবে না, সেন্সরে মুভমেন্ট ধরা পড়বে। বাঁচতে হলে একটাই উপায় আছে—আগুনের শিখার যতটা সম্ভব কাছাকাছি থেকে ধীরে-ধীরে সরে যেতে হবে। সেটাই করবে বলে ঠিক করল ও।

একটা শুকনো প্রাকৃতিক নালা দেখতে পেল রানা, জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে উত্তরমুখী হয়ে। তলায় তেমন ঝোপঝাড় নেই, ফলে আগুন ধরেনি। আশান্বিত হয়ে উঠল ও, ক্রল করে ওটাতে নেমে পড়ল। চারপাশের গনগনে বাতাস ঘিরে ধরেছে ওকে, ঠুস-ঠাস করে ফাটছে আশপাশের ডালপালা। শরীর ঝলসে যেতে চাইছে, তারপরও স্বস্তি অনুভব করল ও—নড়াচড়ার শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে এই নরকযজ্ঞের ভিতরে, তীব্র উত্তাপ ওকে চপারগুলোর থারমাল সেন্সরের চোখ থেকেও অদৃশ্য করে রাখবে।

উঠে দাঁড়াল রানা, নিচু হয়ে এগোতে শুরু করল নালা ধরে। তবে ধীরগতিটা বেশিক্ষণ চালু রাখা গেল না, আগুনটা এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, নালার ভিতরেও ওকে পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে, রুদ্ধ করে দিতে চাইছে শ্বাস-প্রশ্বাস; নাদ্য হয়ে একটু পরেই ছুটতে শুরু করল ও, যত দ্রুত সম্ভব এই মরণফাঁদ থেকে বেরুতে হবে ওকে। নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

চোখে ঝাপসা দেখছে রানা, চামড়া শুকিয়ে খসখসে কাগজের মত হয়ে গেছে, চুল আর চোখের পাপড়ি পুড়তে শুরু করেছে। তেষ্ঠায় গলা শুকিয়ে কাঠ, বিস্কন্ধ বাতাসের স্বল্পতার কারণে ঘন ঘন শ্বাস নিতে হচ্ছে... হাইপার-ভেন্টিলেশনের তালে তালে হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। দাঁতে দাঁত পিষে শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে ও। চেষ্ঠা করছে নালার দুপাশে নজর রাখার। প্রচলিত ট্যাকটিকস্ অনুসারে অগ্নিকাণ্ডের পেরিমিটারে পজিশন নেবার কথা গ্রাউণ্ড টিমের সদস্যদের, যাতে চপারের খারমাল সেন্সরকে ফাঁকি দিলেও মনুষ্য-চোখকে ফাঁকি দিতে না পারে শত্রু।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানোর ফল মিলল কিছুক্ষণের মধ্যে, এগোতে থাকা আগুনের দেয়ালকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল রানা। নালার এই অংশটা বেশ গভীর, তলাটা এবড়ো-থেবড়ো। চোখে ঝাপসা দেখায় ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না ও, হোঁচট খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ল। নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর।

ব্যথা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, ঝট্ করে উঠে বসে পিছনে তাকাল। দাবানলের পরিধি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, খুব একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি ও নিজের আর আগ্রাসী আগুনের মাঝে। দ্রুত সরে না পড়লে আবার আটকা পড়বে। উঠে দাঁড়াতে গেল ও, কিন্তু থমকে গেল নালার কিনারায় একটা ছায়ামূর্তি উদয় হতে দেখে।

কালো রঙের কমব্যুট ফেটিং পরা সশস্ত্র এক সৈনিক, গ্রাউণ্ড টিমের সদস্য। নানাটা সম্ভবত সন্দেহের উদ্বেক ঘটিয়েছে তার মনে, তাই দেখতে এসেছে। ডাইভ দিয়ে তলায় শুয়ে পড়ল রানা, নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। সারা শরীর ধোঁয়ায় অন্তর্ধান-১

কালো হয়ে আছে, ভাল করে খেয়াল না করলে ওকে আলাদা করা যাবে না। সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল না ও, মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অদ্ভুত এক জিনিস... কেউ তাকিয়ে থাকলেই কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়। ট্রেইনিঙের সময় তাই রানাকে শেখানো হয়েছে—যত চমৎকার ক্যামোফ্লাজ-ই থাকুক, টার্গেটের দিকে সরাসরি তাকাবে না; তাকাবে আড়চোখে। এখনও তা-ই করল ও। মুখ ঘোরানো থাকল মাটির দিকে, চোখের কোণ দিয়ে প্রতিপক্ষের গতিবিধির উপর লক্ষ রাখল রানা।

নালার পাশে এসে থামল সৈনিক, তীক্ষ্ণ চোখে নজর বোলাল ভিতরে। রানার শরীরের উপর দিয়ে একবার তার দৃষ্টি ঘুরে এল, তবে এখন নোংরা দেহটাকে মরা গাছের কাণ্ডের মত দেখাচ্ছে দূর থেকে। তারপরও শিয়োর হতে চাইল লোকটা নামতে গেল তলায়, কিন্তু তার আগেই বিকট শব্দে একটা ফাঁপা গাছের ডাল ফাটল—বিস্ফোরণের মত শোণাল শব্দটা। পাই করে ঘুরল সৈনিক, তাকাল আগুনের দিকে—এখানটায় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ কি না, তা বোঝার চেষ্টা করছে।

কেভলার ভেস্টের নীচে গুঁজে রাখা সিগ-সাওয়ারটা এখনও রয়েছে, সাবধানে ওটা বের করে হাতে নিল রানা। সৈনিক লোকটা যদি শেষ পর্যন্ত নালায় নামে, তা হলে গুলি করবে। তবে তার প্রয়োজন হলো না। ধাবমান আগুনের দেয়ালকে দেখে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিল লোকটা, নালার ভিতরে দায়সারাভাবে শেষবার নজর বুলিয়ে সরে গেল কিনার থেকে।

নড়াচড়া না করে আগের মতই খানিকক্ষণ পড়ে রইল রানা, লোকটা দূর থেকে নজর রাখতে পারে। তবে একটু পরেই আগুনের উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠায় আর ঘাপটি মেরে থাকা

সম্ভব হলো না। ঝুঁকি নিয়ে উঠল রানা, মাথা নিচু করে আবার এগোতে শুরু করল। এখন আর দৌড়তে পারছে না, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে, নইলে ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে সৈনিক লোকটা। লোকটা আশপাশে আছে কি নেই, সেটা বোঝা যাচ্ছে না, মাথা নিচু রাখায় বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, সে-চেষ্টা করাটাও উচিত হবে না।

ধীর গতিতে এগোনোর মাশুল শুনতে হলো অল্প সময়ের ভিতরেই। পিঠে আগুনের আঁচ অনুভব করল রানা, লেলিহান শিখা ওর নাগাল পেয়ে গেছে প্রায়। বাধ্য হয়ে আবার ছুটতে শুরু করল রানা, ক্লান্ত পায়ের থপ থপ আওয়াজ হচ্ছে। নালার বাইরে একটা চিৎকার শুনল ও, বুঝতে পারল—সন্দেহটা ঠিক ছিল, পেরিমিটার গার্ড নালার কাছাকাছিই আছে, ওর পায়ের আওয়াজ কানে গেছে লোকটার। থেমে গেল রানা, আর দৌড়ানো ঠিক হবে না, ওর পজিশন বুঝে ফেলবে প্রতিপক্ষ। সামনে একটা খোঁড়ল দেখতে পেল, পাহাড়ি ঢলের পানির আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ওটাতে।

খোঁড়লের ঠিক উপরে এসে থামল সৈনিক, ছাদটা খুব একটা পুরু নয়, পায়ের শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল, কয়েক টুকরো আলগা মাটি খসে পড়ল রানার গায়ে। লোকটা এখন মেশিনগান বাগিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। শঙ্কিত বোধ করল রানা, ছাদটা না ধসে পড়ে ব্যাটার ওজনে! সোজা তা হলে ওর গায়ের উপর পড়বে শত্রু। এদিকে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যেতে শুরু করেছে খোঁড়ল আর আশপাশের জায়গাটুকু। চোখ জ্বালাপোড়া করছে, দম আটকে কাশি ঠেকিয়ে রাখল ও... তবে কতক্ষণ পারবে, সেটাই প্রশ্ন। ট্রেনিঙের সময় পানির নীচে একটানা সাড়ে তিন মিনিট দম ধরে রাখতে পারত, এখনও সে-ক্ষমতা অন্তর্ধান-১

আছে কি না, বলা কঠিন। অনেকদিন হলো এভাবে দম আটকে রাখতে হয়নি ওকে।

আরও কয়েক টুকরো মাটি খসে পড়ল। লোকটা তাড়াতাড়ি সরে না গেলে সমূহ বিপদ। পিস্তল মুঠো করে ধরে দাঁতে দাঁত পিষল রানা। আর কোনও উপায় না পেলে নীচ থেকে প্রতিপক্ষকে গুলি করতে হবে, তারপর ছুটতে হবে পরিষ্কার বাতাসের জন্য। এভাবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু গুলি করলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। শব্দ শুনতে পাবে গ্রাউণ্ড টিমের অন্য সদস্যরা, যদি না-ও শোনে, মৃত লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দেখেই ছুটে আসবে এদিকে। চপার তিনটে থাকবে সঙ্গে, একা কিছুতেই পেরে ওঠা যাবে না তাদের সঙ্গে।

আশার কথা একটাই, উপরের লোকটাকেও ধোঁয়ার মধ্যে দম বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে, তার পক্ষেও বেশিক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব নয়। রানাকে শুধু ওই লোকটার চেয়ে বেশি সময় দম ধরে রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ চলে যাবার পর খোঁড়ল থেকে বেরুতে পারে। চোখ বন্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাস ধরে থাকল তাই রানা।

উপরে আবছা শব্দ শোনা গেল, সৈনিক লোকটা রেডিও মাইক্রোফোনে কথা বলছে। কয়েক সেকেন্ড পরই হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ কয়েক গুণ বেড়ে গেল। নীচের দিকে নেমে আসছে ওগুলো। পায়ের শব্দ হলো, মাটি খসে পড়ল আবার... মনে হলো লোকটা চলে গেছে।

বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে চোখে আঁধার দেখছে রানা, লাল-নীল ফুটকি মত কী সব ভাসছে সামনে। আর সম্ভব নয়, ছিটকে খোঁড়ল থেকে বেরুতে ও, বিপদের তোয়াক্কা না করে

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল নালা ধরে... আগুন আর ধোঁয়া থেকে দূরে। দম আটকে মরতে না চাইলে পরিষ্কার বাতাস দরকার আগে, অস্ত্রধারী শত্রুদের নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে।

হোঁচট খেয়ে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছুটতে থাকল ও। কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কতদূর যাচ্ছে... কোনও হিসেব নেই। জ্বলন্ত নরক থেকে বেরুনোই এখন আসল লক্ষ্য। খানিকদূর যেতেই নালাটা শেষ হয়ে গেল, কিনার আঁকড়ে উপরে উঠে এল রানা, তারপর আবার ছুটল।

এভাবে দৌড়ুনোয় লাভ হলো, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারল ও, বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। বুকের জ্বালাপোড়া কয়ে যেতে শুরু করেছে, চঞ্চল দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল রানা। একটা পাহাড়ি ঢালে রয়েছে ও—সেফ সাইট থেকে দেড়শ' গজ দূরে। বড় একটা পাথর দেখতে পেয়ে ওটার আড়ালে গিয়ে লুকাল। হেলিকপ্টারগুলোর গগনবিদারী আওয়াজ কমেনি, উঁকি দিল ও।

এদিকটায় আসছে না ওগুলো, উচ্চতা কমিয়ে স্থির হয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে কেইবল্‌ ঝুলতে দেখে পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারল রানা। দাবানলের তীব্রতা বেড়ে গেছে, গ্রাউণ্ড টিমের জন্য নীচে থাকা আর নিরাপদ নয়, ওদেরকে পিকআপ করতে যাচ্ছে চপারগুলো। কয়েক মুহূর্ত পর অনুমানটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ঝুলন্ত কেইবলের সঙ্গে যার যার বেল্টের হারনেস আটকাল গ্রাউণ্ড টিমের পাঁচ সদস্য, তার পর-পরই যন্ত্রচালিত উইঞ্চের সাহায্যে তুলে নেয়া হলো তাদের। নিখুঁত পিক-আপ... হ্যাচ ঠিকমত বন্ধ হবার আগেই মুখ ঘুরিয়ে ফেলল চপারগুলো, উচ্চতা বাড়িয়ে তীব্র গতিতে

চলে পশ্চিমমুখী একটা রুট ধরে—একটু পর হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। ইঞ্জিনের আওয়াজও মিলিয়ে গেল। এখন শুধু উন্মত্ত আগুনের গর্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল রানা, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল, দাবানল থেকে দূরে সরে যেতে হবে ওকে যত দ্রুত সম্ভব। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পিছনে একটা চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ও, তবে তাকাল না ওদিকে। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে—বান্ধারের ভিতরের আগুনটা ওদের অ্যামিউনিশন রুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও, সমস্ত মনোযোগ এখন সামনে এগোনোর দিকে। রক্তক্ষরণে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীর, দেহটা বারবার থেমে বিশ্রাম নিতে চাইছে, কিন্তু তীব্র মনোবলের জোরে সে-ইচ্ছে অগ্রাহ্য করল রানা। থামলে আবার চলতে পারবে না, তাই দাঁতে দাঁত পিষে সমস্ত কষ্ট সহ্য করল ও, এলোমেলো পা ফেলে চলতেই থাকল বনভূমির এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে।

কতক্ষণ হেঁটেছে বলতে পারবে না, হঠাৎ নতুন শব্দ শুনতে পেল ও। সাইরেন বাজছে... একটা না, কয়েকটা। ভুরু কুঁচকে স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা করল ও—সাইরেনের উৎস কী হতে পারে, তা ভাবল। মনে পড়ে গেল, এই বনভূমির সীমানা থেকে মাত্র আট মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহর আছে। নিশ্চয়ই ওখান থেকে দাবানল নেভাতে ছুটে আসছে পুলিশ আর দমকলের ইমার্জেন্সি ট্রু-রা। সেফ-সাইটে যাবার জন্যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে পথটা আছে, নিশ্চয়ই সেটা ধরেই আসছে। পথটা লুকানো বটে, তবে খুঁজে পেতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয় তাদের।

শুণ ইচ্ছে হলো পথটায় গিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে।

উদ্ধার পাওয়া যাবে, বিশ্রাম পাওয়া যাবে, কাঁধের ক্ষতটার চিকিৎসাও পাবে। সবচেয়ে বড় কথা, তৃষ্ণা মিটবে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে রানার, জিভ যেন শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে কেউ। পানি না পেলেই নয়। ফায়ার ব্রিগেড ত্রু-দের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিপদ কাটাবার এই সহজ উপায়টা খুব প্রলুব্ধ করছে ওকে।

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে দমে যেতে হলো। সন্দেহ নেই, অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ওকে... একটারও জবাব দিতে পারবে না। অন্তত যতক্ষণ না ড. আন্দালিব সিদ্দিকীকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কারণ জানতে পারছে... যতক্ষণ না ওর এজেন্সির নিবেদিতপ্রাণ চার এজেন্টকে কেন খুন হতে হলো, সেটা বের করতে পারছে। এ-মুহূর্তে পুলিশের সামনে গেলে বরং ওকেই সন্দেহ করা হবে সেফ-সাইটে আবিষ্কার হতে চলা লাশগুলোর জন্য। অ্যারেস্ট করা হতে পারে। যারা স্পেশাল ফোর্স কিংবা মিলিটারি টেকনোলজি ব্যবহার করে, তারা সাধারণ কেউ নয়; এমন প্রতিপক্ষের জন্য পুলিশ কাস্টডিতে রানাকে নিকেশ করা অত্যন্ত সহজ কাজ। ওর মুখ বন্ধ রাখার জন্য সেটাই করবে তারা।

মানে হচ্ছে, গা-ঢাকা দিতে হবে ওকে। গোপনে রহস্যটা ভেদ করতে হবে। মাথায় আগুন জ্বলছে রানার, মনসুর আর তার টিমের কথা ভাবলেই বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। সবকিছুর জন্য দায়ী ওই ড. সিদ্দিকী। তাকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে, সেই সঙ্গে শায়েস্তা করতে হবে অচেনা ওই ঘাতকদের—নিজের কাঁধে একটা গুরুদায়িত্ব চাপাল রানা।

সাইরেনের শব্দ খুব কাছে চলে এসেছে, সতর্ক পায়ে বনের আরও ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, কারও চোখে পড়তে চায় না। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল, শারীরিক কষ্টকে আর গ্রাহ্য করছে না। কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছে মনে মনে, আত্মপ্রত্যয় ভুলিয়ে দিচ্ছে যাতনাকে।

তবে সবার আগে সাহায্য দরকার ওর। ...আর সেটা একজনই করতে পারে এ-মুহূর্তে।

সোহানা।

ষোলো

‘ওয়ারউইক হোটেল!’ তরুণ রিসেপশনিস্টের গলাটা কেমন যেন ঘুমজড়িত শোনাল, হয়তো সারারাত জাগবার ফলে। রাতের শিফট শেষ করে এনেছে সে, আটটা বাজলেই নতুন একজন এসে জায়গা নেবে রিসেপশনে।

‘পাঁচশো চার নম্বর রুমে দিন, প্লিজ।’

নিচু গলায় সেলফোনে কথা বলছে রানা, মেইনরোডের পাশে একসারি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ও, একটানা প্রায় দু’ঘণ্টা হেঁটে বনভূমির সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট শহরটার সিকি মাইল দূরে এই জায়গাটায় এসে পৌঁছেছে। ফোন করবার আগে এতটা সময় নেবার পিছনে কারণ একটাই,

ইমার্জেন্সি সার্ভিস দাবানলের এলাকায় সম্ভাব্য সার্ভাইভারের খোঁজে সেল-ফোন স্ক্যানার ব্যবহার করবে; ও চায়নি সোহানার সঙ্গে ওর কথোপকথন কেউ মনিটর করুক। শহরের কাছাকাছি এসে পড়ায় সম্ভাবনাটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এখানকার এয়ারস্পেসে শহরবাসীদের হাজারো ফোনকলের মাঝখান থেকে ওরটা আলাদা করা যাবে না।

‘একটু জোরে বলুন, সার,’ রিসেপশনিস্ট বলল। ‘আমি আপনার কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছি না।’

‘পাঁচশো চার নম্বর রুম। আমি সোহানা চৌধুরীকে চাইছি।’

‘বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সার, এত সকালে ওঁকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? এখনও রুম সার্ভিস ব্রেকফাস্ট নিয়ে যায়নি, তারমানে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন...’

‘আমি ওঁর স্বামী বলছি,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। সহজ একটা কৌশল।

‘ও! ঠিক আছে, হোল্ড অন প্লিজ।’

খুটখাট শব্দ হলো, তারপর ওপাশে রিং হতে শোনা গেল। কয়েকবার বাজল ফোন, সোহানা ধরছে না। পথশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমাচ্ছে বোধহয়। জরুরি প্রয়োজনে সাপোর্ট দেবার জন্যে রানার কঁথামত গতকালই ওই হোটেলটায় উঠেছে ও, পৌছেছে বেশ রাতে। সকাল হতে না হতেই ডাক পড়বে, নিশ্চয়ই আশা করেনি।

মোট দশবার হলো রিং, তারপর রিসিভার তোলার আওয়াজ পেল রানা। ঘুম-ঘুম কর্তে সোহানা বলল, ‘উম্ম... হ্যালো?’

‘সোহানা... আমি,’ বাংলায় বলল রানা। যোগাযোগের অন্তর্ধান-১

মাধ্যম হিসারে সেলফোন সবচেয়ে অরক্ষিত, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকলে যে-কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারে। বাংলায় বলেও স্বস্তি নেই, যতটা সম্ভব আভাসে-ইঙ্গিতে কথা বলতে হবে ওদের।

রানাকে নাম বলতে না শুনে সোহানাও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। ঘুম-টুম মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল ওর চোখ থেকে। পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, ‘হাই ডার্লিং! হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ!’

‘সারপ্রাইজ তো বটেই,’ রানা বলল। ‘কাল রাতের ওই ঝগড়ার পর আবার এই সাতসকালে ফোন করব, তা নিশ্চয়ই আশা করেনি?’

‘উঁহঁ। হঠাৎ বদলে গেলে কেন?’

‘ভেবে দেখলাম, দোষটা আমারই। তুমি আমার চেয়ে বেশি আয় করো, তা নিয়ে আমার জেলাস হওয়াটা ঠিক হয়নি। তোমার টাকায় কিছু কিনব না বলে জেদ দেখানোও অন্যায় হয়েছে।’

‘হুম, বুঝতে পারছ তা হলে?’

‘হ্যাঁ, আমি সরি। প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।’

‘কীভাবে?’ সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

‘চলো, লং ড্রাইভে যাই,’ রানা প্রস্তাব দেয়ার ভঙ্গিতে বলল। ‘আগামী কয়েকটা দিন শুধু ঘুরে বেড়াব আমরা, কাজকর্ম কিছুর করব না। ছুটি কাটাব... একসঙ্গে।’

‘লোভনীয় প্রস্তাব... আমার কোনও আপত্তি নেই।’

‘শুড। তুমি আমাকে তুলে নিতে পারবে?’

‘নিশ্চয়ই। কী ধরনের গাড়ি আনব?’ গল্লের ছলে এবার কাজের কথা পাড়ল সোহানা।

‘ফোর্ড টরাস,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘বেশি ঝকমকে হবার

দরকার নেই। গাঢ় নীল বা গাঢ় সবুজ রং কেমন লাগে তোমার?’

‘খুবই ভাল,’ সোহানা বলল। বেশিরভাগ টরাস গাড়িই নীল বা সবুজ রঙের, জানা আছে ওর। এই দু-রঙের হাজার হাজার গাড়ি চলে আমেরিকার রাস্তাঘাটে, সহজে অন্যান্য গাড়ির ভিড়ে মিশে যাওয়া যাবে। ‘আগের গাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে, ওটা বিক্রি করে নতুন একটা কিনে ফেলি, কী বলো?’ রানা এজেন্সির কোনও গাড়ি যে ব্যবহার করা ঠিক হবে না, সেটা বুঝতে পারছে ও।

‘আমিও তা-ই চাইছি,’ রানা বলল। ‘আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ভাল মডেলটা কিনো।’ ওটার ইঞ্জিন দুইশ’ হর্স-পাওয়ারের, রাস্তায় যে-কোনও বিপদ মোকাবেলায় বাড়তি শক্তিটা কাজে লাগবে।

‘ঠিক আছে,’ সোহানা বলল।

‘কিছু নতুন জামা-কাপড়ও দরকার,’ রানা যোগ করল। ‘বেশ কয়েকদিন ট্র্যাভেল করব তো, আমি তো সঙ্গে কিছুই আনিনি।’

‘কী কী লাগবে?’

‘স্ল্যাকস্, একটা স্পোর্টস কোট, জুতো, জিন্স, একটা পুলোভার, এক জোড়া রকপোর্টস্ বুট... আমার সাইজ তোমার মনে আছে তো?’

‘তা কি ভোলা যায়?’

‘আজে-বাজে রঙের কিছু কিনবে না কিন্তু!’

‘আমার পছন্দের ওপর আস্থা নেই তোমার?’ পাকা গিল্লির মত অভিমানী সুরে বলল সোহানা।

‘আছে তো! তাও মনে করিয়ে দিচ্ছি আর কী!’

‘হুম! আর কী চাই?’

‘আগরওয়া...’

‘ভেরি সেব্রি!’ মুচকি হাসল সোহানা।

পান্তা না দিয়ে বলে চলল রানা, ‘...মোজা, টুথব্রাশ, রেয়ার, একটা ফার্স্ট এইড কিট—রাস্তায় কত রকম বিপদ ঘটতে পারে!’

‘বুঝেছি। সতর্ক থাকা ভাল। আর?’

‘কিছু স্যাণ্ডউইচ এনো, সঙ্গে পানি... প্রচুর পরিমাণে বটলড ওঅটর।’

একটু নীরবতা, সোহানা সবকিছু কাগজে লিখে নিচ্ছে। খানিক পর বলল, ‘আমাকে একটু সময় দিতে হবে... খুব বেশি না, কয়েক ঘণ্টা। তোমাকে কোথেকে পিকআপ করব?’

‘এখনও ঠিক বলতে পারছি না, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমি পরে তোমার সেলফোনে রিং করে জানাব। নতুন নাম্বারটা সঙ্গে রেখো।’ ওটা ইমার্জেন্সিতে ব্যবহারের জন্য একটা স্পেশাল সেলফোন, লাইনটা স্ক্র্যাম্বল করা। এমনিতে অফ করা থাকে, তাই ফোনটা চালু করতে নির্দেশ দিল রানা।

‘ওকে।’ বুঝতে পেরে বলল সোহানা। ‘টেক কেয়ার, ডিয়ার।’

‘তুমিও।’

লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা অফ করে দিল রানা, ব্যাটারির আয়ু টিকিয়ে রাখতে হবে। সেটটা ঢুকিয়ে রাখল প্যাণ্টের পকেটে, তারপর উঁকি দিল গাছের আড়াল থেকে। শহরের দিক থেকে হৈচৈ... সেইসঙ্গে ইমার্জেন্সি ভেহিকলের আওয়াজ ভেসে আসছে। দাবানলটা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, শহর পর্যন্ত গ্রাস করবার একটা সম্ভাবনা থাকায় স্টেট পুলিশ ওখানকার

বাসিন্দাদের ইভ্যাকুয়েট করতে শুরু করে দিয়েছে। একটু পরেই রাস্তা ধরে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের যানবাহন শহরে ঢুকতে-বেরুতে শুরু করল। সাধারণ লোকজন আছে, আছে করাত-কুঠারসহ ইমাজেসি সার্ভিসের কর্মীও—দাবানলের বিস্তৃতি ঠেকাতে জঙ্গলের একটা অংশের গাছপালা কেটে পেরিমিটার তৈরি করবে ওরা। এতসব মানুষের চোখ এড়িয়ে শহরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ—রানার বিধ্বস্ত অবস্থা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কী করা যায়, ভাবছে ও।

মাথার উপর এরোপ্লেন আর হেলিকপ্টারের গর্জন শোনা গেল। চোখ তুলে তাকিয়ে স্বস্তি অনুভব করল রানা—অ্যাসল্ট টিম নয়, স্পটার আর ফায়ার-ফাইটারেরা যাচ্ছে আগুন নেভাতে... আকাশ থেকে ছড়াবার মত ফায়ার-রেটার্ড্যান্ট কেমিক্যাল নিয়ে। শক্তিত হবার মত কিছু নেই; যে-তাণ্ডব শুরু হয়েছে, তার ভিতর খুনিদের আর ফিরে আসবার কথা নয়।

কিন্তু এখানে বসে থাকাও চলে না। সন্দেহ নেই, শেরিফস্ ডিপার্টমেন্ট শহরের বাইরে রাস্তায় ব্লকেড বসিয়েছে, যাতে বিপজ্জনক এলাকায় সাধারণ লোকজন যেতে না পারে। এর অর্থ, সোহানাও আসতে পারবে না ওর কাছে। ব্লকেড পেরিয়ে রঁদেভু'র জন্য নিরাপদ স্পট খুঁজে বের করতে হবে। চোখ বন্ধ করে এলাকার মানচিত্রটা স্মরণ করল রানা, বুঝতে পারল ছোট্ট এই শহরটা পেরিয়ে পরের শহরে যেতে হবে ওকে। হাইওয়ে ধরে গেলেই হয়, নিউ ইয়র্ক থ্রু-ওয়ে এখান থেকে চার মাইল দূরে হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে। রাস্তাটা ধরে আরও পাঁচ মাইল গেলে পড়বে দ্বিতীয় শহরটা। মোট ন'মাইল দূরত্ব... লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—সাধারণ অবস্থায় পায়ে হেঁটে যাওয়া কোনও ব্যাপারই

অন্তর্ধান-১

নয়, কিন্তু রক্তক্ষরণে দুর্বল দেহ নিয়ে এ-কাজ সহজ হবে না।

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না রানা, উঠে দাঁড়াল। বসে থাকলে বরং শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাবে, তারচেয়ে চলার উপরে থাকাই ভাল। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

রোদ চড়তে শুরু করল খানিক পর, দাবানলের দিক থেকে ভেসে আসা বাতাসও গরম। ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেল রানা, কাঁধের ক্ষতটা জ্বলতে শুরু করেছে। তবে যন্ত্রণা থেকে মনকে সরিয়ে রাখল ও, চোখ রাখল সামনের দিকে, মনোযোগ পরের পদক্ষেপের উপর। আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলল, কেমন যেন মাতালের মত লাগছে। টলছে। দেহটা যেন নিজের নয়, স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ফেলছে পা। মাঝে মাঝেই চোখ কচলাতে হলো, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছে। গলাও শুকিয়ে কাঠ, প্রথম দিকে থুতু গিলছিল, এখন গ্রন্থিগুলোও শুকিয়ে গেছে। বিস্ময় বোধ করল রানা—মরুভূমিতে এ-ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা আছে ওর, কিন্তু সবুজ-সুনিবিড় জঙ্গলের ভিতরও যে এমন বুকফাটা তৃষ্ণায় আক্রান্ত হতে হবে, সেটা কখনও কল্পনা করেনি।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও, অনেক চেষ্টায় দিকটা ঠিক রেখেছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে হাইওয়েটা দেখে নিচ্ছে, ঠিক করে নিচ্ছে কোন্‌দিকে এগোতে হবে। এভাবে অসহ্য পরিশ্রম আর যন্ত্রণার মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল, তবে সেটা বুঝল না ও। ওর কাছে পদযাত্রাটার স্থায়িত্ব অনন্তকাল মনে হচ্ছে।

হঠাৎ সামনে একটা ছোট্ট সবজি-খেত দেখতে পেল রানা, ওপাশে একটা দোচালা বাড়ি রয়েছে। সম্ভবত কোনও

কৃষি-পরিবারের আবাস। একপাশে ছোট ছাউনি আর গ্যারাজ রয়েছে—রং উঠে সবকিছু বিবর্ণ হয়ে রয়েছে। তবে অন্যপাশের আঙিনায় দড়িতে শুকাতে দেয়া কাপড় দেখে বোঝা যাচ্ছে, পরিত্যক্ত নয় বাড়িটা, মানুষ আছে। খেতটাও সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা—গাঢ় সবুজ শাক-লতা-পাতা দুলছে বাতাসে, নিয়মিত যত্ন পাবার ফল। বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিতে ইচ্ছে হলো রানার, সাহায্য চাইবে। কিন্তু দমে গেল বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ভেবে। ওর রক্তাক্ত শরীর দেখে নিঃসন্দেহে ভয় পাবে তারা; সাহায্য করবে কি না ঠিক নেই, কিন্তু পুলিশে খবর দেবে অবশ্যই। সেটা হতে দেয়া যায় না।

মুষড়ে পড়ার মত অবস্থা হলো রানার, সহ্য ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, সাহায্য ছাড়া একটুও এগোনোর উপায় নেই। অথচ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাহায্য চাইতে পারছে না। আনমনে মাথা নাড়তে গিয়ে দেখতে পেল পানির কলটা, খেতের একপাশে ওটা, সেচের জন্য ব্যবহার হয়, পাইপ লাগানো আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে কলটার কাছে চলে গেল রানা, পঁচা খুলে পাইপের মুখটা ভরে দিল মুখে। ঠাণ্ডা, মিষ্টি পানিতে ভরে গেল ভিতরটা, ঢক ঢক করে গিলতে থাকল ও। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, বাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে যেতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি পাইপটা নামিয়ে রাখল রানা, কলের মুখ বন্ধ করে এক ছুটে ফিরে এল গাছপালার আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড পরই গাউন-পরা মাঝবয়েসী এক মহিলা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। খেতের কিনারে এসে হাত দিয়ে চোখদুটোকে রোদের আড়াল করল সে, মাথা তুলে তাকাল পূর্ব দিকে। আকাশ কালো হয়ে

আছে দাবানলের কালো ধোঁয়ায়—সেদিকেই তার নজর।

‘অ্যাই, শুনছ?’ বাড়ির দিকে মুখ ফেরাল মহিলা, গলা চড়িয়ে স্বামীকে ডাকছে। ‘আগুন তো এদিক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে বলে মনে হচ্ছে। মদ গেলা বন্ধ করে বাইরে এসো, সাহায্য করো আমাকে। পানি দিয়ে বাড়ির ছাদ আর দেয়াল ভিজিয়ে রাখতে হবে।’

অক্ষুট একটা গাল ভেসে এল বাড়ির ভিতর থেকে। শুনে খেপে গেল মহিলা। ‘ওয়ান্টার, আবার যদি মুখ খারাপ করো, তা হলে কিন্তু ভাল হবে না। বেরোও বলছি!’

রাগে গজ গজ করতে করতে খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা এক লোককে বেরুতে দেখা গেল। স্ত্রী-র বকাঝকা খেয়ে কলের দিকে এগিয়ে গেল সে, পানির পাইপটা নেয়ার জন্য। আর কিছু দেখার প্রয়োজন মনে করল না রানা, সাবধানে সরে এল খেতের কাছ থেকে। গাছপালার গভীরে ঢুকে স্বস্তি অনুভব করল, ওকে দেখতে পায়নি স্বামী-স্ত্রী। পানি খেতে পারায় কিছুটা শক্তিও পাচ্ছে শরীরে।

আবার চলতে শুরু করল ও, মিনিট দশেক পর হাইওয়ের কাছে ফিরে এল। সামনেই নিউ ইয়র্ক থ্রু-ওয়ের সংযোগস্থল। একটা কালভার্ট চোখে পড়ল, তলাটা খটখটে শুকনো। ওখানে গিয়ে ছায়ার মধ্যে আশ্রয় নিল ও, জায়গাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে। পকেট থেকে বের করল সেলফোনটা, সুইচ অন করে ডায়াল করল সোহানার নাম্বারে।

রিং হলো কি হলো না, সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া গেল। উৎকর্ষা নিয়ে ওর কলের অপেক্ষায় ছিল সোহানা। বলল, ‘হ্যালো?’

‘আমি।’

‘বুঝতে পেরেছি। এত দেরি করলে কেন ফোন করতে?’

‘সুযোগ পাইনি,’ সংক্ষেপে বলল রানা। ‘তুমি কেনাকাটা সেরেছ?’

‘হ্যাঁ, এখন গাড়ির শো-রুমে। পেমেন্ট মিটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু পেপারওয়ার্ক দেরি হচ্ছে। আশা করি পনেরো মিনিটের মধ্যেই রওনা হতে পারব।’

‘কিছু ক্যাশ টাকা সাথে এনো।’

‘কত?’

‘দু’হাজার...’

‘আমার কাছে তিন হাজার ডলার আছে।’

‘ওড। তা হলে চিন্তা নেই।’

‘কোথায় আসতে হবে, তা তো বললে না।’

‘আটলান্টিক সিটির রাস্তা ধরবে, তবে ওখানে যাবে না। উত্তর দিকে এগোলেই নিউ ইয়র্ক স্টেট থ্রু-ওয়ে; ওটা ধরে কিংসটনের একজিট থেকে পঞ্চাশ মাইল পেরুলেই একটা মোড় আছে... বাস্কারভিলে যাবার জন্য। ওই রাস্তায় এগোতে থেকো, একটা হাইওয়েতে এসে উঠবে। ডানদিকে একশো গজ দূরে একটা কালভার্ট দেখতে পাবে। ওটায় উঠে একটু অভিনয় করতে হবে তোমাকে... টায়ার-পাংচার, কিংবা ইঞ্জিন নষ্ট হবার...’

‘কালভার্ট থেকে উঠবে তুমি?’

‘হ্যাঁ। যদি না দাবানলটা এখান পর্যন্ত পৌঁছে যায় আরকী!’

‘দাবানল!’ একটু অবাক হলো সোহানা। ‘কীসের মধ্যে পড়েছ তুমি, বলো তো?’

‘এলেই দেখতে পাবে,’ রানা বলল। ‘আমি সেলফোন অনু রাখছি, কাছাকাছি পৌঁছে রিং দিয়ে।’

‘ঠিক আছে,’ বলে একটু থামল সোহানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ঠিক আছো তো?’

‘আছি। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।’

লাইন কেটে দিল রানা। আর কিছু করবার নেই এ-মুহূর্তে। কালভার্টের তলায় একটা খাদের মত আছে, ওটার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়ল ও। চারপাশ থেকে শুকনো পাতা কুড়িয়ে শরীর ঢাকল, তারপর শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম দরকার, ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

তবে কাঁধের ক্ষতটার ব্যথা, সেইসঙ্গে নানা রকম দুশ্চিন্তা ঘুমকে যোজন যোজন দূরে সরিয়ে রাখল। ড. সিদ্দিকীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণটা বুঝতে পারছে না রানা। সন্দেহ নেই, ভোররাতে সে-ই ভিএইচএফ সেট ব্যবহার করে অ্যাসল্ট টিমকে খবর দিয়েছে। কিন্তু কেন? প্রোটেকশন টিম আর রানাকে খতম করবার জন্য? সেজন্যেই কি তাকে প্ল্যান্ট করেছিল কেউ? ওদের বিরুদ্ধে এমন মরিয়া হয়ে উঠল কে? হামলাকারীরা মিলিটারি ট্রেনিং সৈনিক ছিল, তারমানে আমেরিকান সরকার এর পিছনে আছে। ওদের হাইটেক ইকুইপমেন্টও তা-ই প্রমাণ করে। কিন্তু রানা কিংবা প্রোটেকশন টিমের পিছনে এত নিখুঁত আয়োজন করে হামলা চালাবার মত যুক্তিযুক্ত কারণ তো নেই। সম্প্রতি আমেরিকানদের কোনও ক্ষতি করেনি ও, ওর উপর কেউ খেপে থাকলেও নাহয় একটা কথা ছিল!

ড. সিদ্দিকীকে উদ্ধারের পুরো ঘটনাটা নিয়ে ভাবল রানা। লোকটার আচার-আচরণ খতিয়ে দেখল। সত্যিই আতঙ্কে আধমরা হয়ে ছিল সে, ব্যাপারটা অভিনয় ছিল না। কথা হলো, বিপন্ন একজন মানুষ যাদের সাহায্য পাচ্ছে, তাদেরকেই খুন

করতে চাইবে কেন? পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে।

হেলিকপ্টারের আওয়াজে চিন্তায় ছেদ পড়ল। উঁকি দিয়ে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের একটা যান্ত্রিক ফড়িংকে উড়ে যেতে দেখল রানা, পেটে বিশাল একটা টিউব বাঁধা... পানি নিয়ে যাচ্ছে। আবার গুয়ে পড়ল ও, কেভলার ভেস্টটার কারণে অস্বস্তি বোধ করায় ওটা খুলে ফেলল। কাঁধের ডাস্ট টেপটাও পরখ করল—এখনও শক্তভাবে আটকে আছে ওটা, রক্তক্ষরণ ঠেকাচ্ছে। তবে ফুলে গেছে আহত জায়গাটা, আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করল রানা, পারল না।

এবার পা নাড়ার চেষ্টা করল ও, কেমন যেন বেঁকে আছে দুই হাঁটু, চেষ্টাটা সফল হলো না। এতক্ষণ চলার মধ্যে থাকায় অ্যাড্রেনালিন কাজ করছিল, কিন্তু বিশ্বাসের জন্য থামতেই ওটার প্রভাব কেটে গেছে। আহত শরীর কুঁকড়ে যেতে বসেছে। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা—সোহানা যেন তাড়াতাড়ি আসে, খুব দ্রুত চিকিৎসা দরকার ওর।

বাইরে তীব্র গরম, তারপরও শীত শীত করতে থাকল ওর। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। নিজের অজান্তেই পা-দুটো গুটিয়ে ফেলল রানা, হাতদুটো ভাঁজ করে নিয়ে এল বুকের কাছে। সবকিছু কেমন যেন ঘোলা হয়ে আসছে চোখের সামনে। ঘুম নয়, জ্ঞান হারাতে চলেছে ও। তাড়াতাড়ি সেলফোনটা বের করে রিঙ্গার অফ করল, ভাইব্রেশন মোডে নিয়ে এল ওটাকে। সজ্ঞান থাকতেই কাজটা না করলে পরে বিপদ হতে পারে। রিংটোনের শব্দে ওকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারে অযাচিত কেউ।

কাজ শেষ করে আবার সেলফোনটা রেখে দিল ও, এবার বুক-পকেটে। বিপদ মোকাবেলার জন্য ভাঁজ করা হাতের অন্তর্ধান-১

মুঠোয় নিয়ে নিল সিগ-সাওয়ারটা। তারপর চোখ মুদল।
কাঁপুনি কমল না শরীরের, ওই অবস্থাতেই চৈতন্য হারাল রানা
কয়েক মুহূর্তের ভিতর।

সতেরো

বুকের কাছে সেলফোনের কাঁপুনি অনুভব করে জেগে উঠল
রানা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর ট্রেইনিঙের ফলে সচেতন হয়ে
উঠল মুহূর্তে, তবে সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করল না।
আশপাশে কোনও মানুষ আছে কি না, দেখতে
হবে—কথোপকথন শুনে যাতে ওর সন্ধান পেয়ে না যায় কেউ,
সেটার জন্যই এই সতর্কতা। হামাগুড়ি দিয়ে কালভার্টের তলা
থেকে একটু বেরুল ও, নাকে ধোঁয়ার গন্ধ পেল। এদিকটায়
এখনও আগুন পৌঁছেনি, তবে বাতাসে ভেসে আসছে পোড়া
গন্ধ।

কাউকে দেখা গেল না কালভার্টের কাছাকাছি, সম্ভ্রষ্ট হয়ে
আবার আগের জায়গায় ফিরে এল রানা। ফোনটা তৃতীয়বারের
মত সঙ্কেত দিতেই রিসিভ করল।

‘ম্যাকডোনাল্ডস্!’ আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোড ওয়ার্ড
উচ্চারণ করল ও, ঠিক জবাব পেলে বুঝতে পারবে, ওপাশ
থেকে সোহানা নির্বিঘ্নে কথা বলছে। কেউ ওর পিঠে বন্দুক

ঠেকিয়ে রাখেনি।

‘থ্যাঙ্ক গড!’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোহানা। ‘বন্ধুর কাছ থেকে নম্বর নিয়েছি, ও একটা ডিজিট ভুল করে ফেলেছে। গত পনেরো মিনিট ধরে খালি রং-নাম্বারে ডায়াল করে মরছি। অথচ এই মুহূর্তে কয়েকটা হ্যামবার্গার আমার খুবই দরকার।’

নিশ্চিত হলো রানা—ঠিকঠাক কোডেই জবাব দিয়েছে সোহানা। তাই অভিনয় ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় তুমি?’

‘রোড-জাংশানের কাছে। এক্ষুনি পৌঁছুব তোমার ওখানে।’

হাতঘড়ি দেখল রানা, বারোটা বাজে। ‘দেরি করলে কেন?’

‘আগুন কীভাবে লেগেছে, টের পাচ্ছ না? পুরো এলাকাই ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। একটা রোডব্লকে পড়েছিলাম, পুলিশ এই এলাকায় কোনও গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না, সব ডাইভার্ট করে দিচ্ছে। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ওদের কনভিন্স করতে হয়েছে আমাকে, তাই একটু দেরি হয়ে গেল। সরি।’

‘ঠিক আছে, চলে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।’

কানেকশন কেটে দিয়ে সেলফোনটা পকেটে ভরে ফেলল রানা, শার্টের তলায় গুঁজে রাখল সিগ-সাওয়ার। তারপর কেভলার ভেস্টটা কুড়িয়ে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল। একটু পরই ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল ওর—ভারী গর্জন, ফোর্ড টরাসের হতে পারে না। ধারণাটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো কয়েক সেকেন্ড পর, কালভার্টকে কাঁপিয়ে চলে গেল গাড়িটা, থামল না। সম্ভবত ট্রাক, অনুমান করল রানা, ফায়ার-ফাইটিং ক্রু আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল, তারপর পাওয়া গেল কাক্ষিত আওয়াজটা। কারের হালকা ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঠিক কালভার্টের উপর এসে থেমে গেল ওটা। দু’বার

গোঁ গোঁ শব্দ হলো, যেন ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছে। লাভ হলো না তাতে, নারীকণ্ঠের শাপ-শাপান্ত ভেসে এল উপর থেকে। দরজা খোলা হলো, তারপর পায়ের আওয়াজ... কার থেকে বেরিয়ে বনেট খুলল চালক।

‘কোথায় তুমি?’ কয়েক সেকেণ্ড পর চাপা গলা শোনা গেল।

সাবধানে কালভার্টের কিনারা বরাবর চলে গেল রানা। জিজ্ঞেস করল, ‘রাস্তায় কেউ আছে?’

সামনে-পিছে তাকাল সোহানা, তারপর বলল, ‘না, একটা গাড়িও নেই।’

‘ওড়। উঠে পড়ো গাড়িতে, আসছি। আমি ব্যাক-সিটে ওঠার পর স্টার্ট দিয়ো। স্বাভাবিক গতিতে চালাবে, কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করে।’

‘ঠিক আছে।’

পায়ের শব্দ হলো, তারপর আবার দরজা খোলার আওয়াজ। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল সোহানা। হামাগুড়ি দিয়ে কালভার্টের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা, একছুটে রাস্তার পাশের ঢাল অতিক্রম করল, পৌঁছুল টরাসের পাশে। মাথা নিচু করে ব্যাকডোর খুলল ও, কেভলার ভেস্টটা ছুঁড়ে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল পিছনের সিটে। সোহানাকে দেখতে পেল এবার, লিনেনের একটা জ্যাকেট পরেছে, মাথার চুল খোলা... উইণ্ডশিল্ডের কাঁচে অপূর্ব সুন্দর মুখটার ছায়া পড়ছে। লোকজনের দৃষ্টি এড়াতে শুয়ে পড়ল রানা, তারপর টেনে বন্ধ করল দরজাটা।

‘গো!’ চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল,

গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়াল টরাসকে। পাক্কা প্রফেশনালের আচরণ করছে, তীব্র কৌতূহল সত্ত্বেও পিছনে তাকাল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, ‘কোনদিকে যাব?’

‘মুখ ঘোরাও গাড়ির,’ রানা বলল। ‘গা-ঢাকা দেবার জায়গা দরকার। এখান থেকে অলব্যানি মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ওদিকেই চলো।’

সায় দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল সোহানা; যে-পথে এসেছে, সে-পথেই ফিরে চলল। বেশ কিছুদূর যাবার পর যখন কাজটা নিরাপদ মনে হলো, তখনই কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল ও। রানার হেঁড়া-ফাটা পোশাক, শুকিয়ে আসা রক্ত আর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আঁতকে উঠল ও।

‘ইয়াল্লা! এ কী অবস্থা তোমার?’

‘সামনে তাকাও,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘যতটা দেখাচ্ছে, ততটা খারাপ নয় অবস্থা।’

রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল সোহানা। ‘গুলি খেয়েছ?’

‘হ্যাঁ।’ কারের মেঝেতে রাখা কাগজের ক্রেট থেকে একটা পানির বোতল তুলে নিল রানা, মুখ খুলে ঢক ঢক করে খেতে থাকল।

‘তারপরও বলছ অবস্থা খারাপ নয়?’

‘হুঁ। কাঁধে লেগেছে গুলি, হার্টে বা মাথায় লাগলে নাহয় খারাপ বলতাম!’ হালকা সুরে বলল রানা।

‘কী বলছ!’ চকিতে পিছনে তাকাল একবার সোহানা। ‘কী লাগিয়েছ ওটা... ডাক্ট টেপ?’

‘খুব কাজের জিনিস, তাই না?’

একটু যেন রেগে গেল সোহানা। ‘হ্যাঁ, কাজের তো বটেই! যদি তুমি পানির পাইপ হও, আর কাঁধের ক্ষতটা একটা লিক

হয়ে থাকে!’

‘কী করব... আর কিছু খুঁজে পাইনি।’ রানা কাঁধ ঝাঁকাল।

‘ড. সিদ্দিকী কোথায়? মনসুরেরা?’

‘সব বলব, আগে কিছু খেয়ে নিই। কী এনেছ?’

‘ব্যাকরেস্ট সরালে একটা কুলার পাবে, ওটাতে স্যাণ্ডউইচ আর পটেটো সালাদ আছে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সিটের পিছনটা সরাতে গেল রানা, কিন্তু গুড়িয়ে উঠল ব্যথায়।

‘তোমাকে এখনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে,’ সোহানা বলল। ‘কাঁধের ক্ষতটায় ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। গুয়ে থাকো, ডাক্তারখানা দেখলে আমি থামব।’

‘না!’ বাধা দিল রানা। ‘ডাক্তার-ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে না। গানশট দেখলে ওরা পুলিশকে রিপোর্ট করতে বাধ্য।’

‘আমাদের এজেন্সির বিশ্বস্ত ডাক্তার আছে, ওদের কাউকে খবর দিই? জাকিরকে বললে এক্ষুণি একটা হেলিকপ্টারে করে...’

মাথা নাড়ল রানা। ‘উঁহু, এ-মুহূর্তে কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত হবে না। গা-ঢাকা দিতে হবে।’ কষ্টে-সৃষ্টে ব্যাকরেস্টটা সরাল ও, বের করে আনল কুলারটা।

‘কিন্তু কেন?’ সোহানার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘কাউকে জানতে দেয়া যাবে না যে, আমি বেঁচে আছি। ...অন্তত এ-মুহূর্তে নয়।’

‘তোমাকে মারতে চাইছে কেউ? সেজন্যেই এই অবস্থা?’

‘হ্যাঁ, তবে টার্গেট শুধু আমি একা নই, আমাদের পুরো প্রোটেকশন টিমই ছিল। ড. সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সোহানা। সেফ-সাইটে একদল খুনিকে নিয়ে এসেছিল সে।’

‘কী!!!’ সোহানা চমকে গেল।

‘ঠিক শুনছ। মনসুর আর ওর টিম... কেউ বেঁচে নেই। আমাকেও খুন করবার চেষ্টা করেছে সিদ্দিকী। বনের দাবানল... ও-ই লাগিয়েছে এভিয়েশন ফুয়েল ছিটিয়ে। বাস্কারেও একই কাজ করেছে।’

মুখের কথা আটকে গেছে সোহানার। কী বলবে, বুঝতে পারছে না।

‘সব খুলে বলব তোমাকে... ধীরে-সুস্থে। তবে আগে একটু খাওয়া-দাওয়া আর ড্রিটমেন্ট দরকার। ফাস্ট এইড কিট এনেছ?’

‘হ্যাঁ। ফ্লোরে... কাপড়ের ব্যাগটার তলায় পাবে।’

বস্ত্রটা তুলে নিল রানা, ভিতর থেকে গজ-ব্যাগেজ সরিয়ে এক পাতা পেইনকিলার বের করল। একটা স্যাণ্ডউইচ খেল ও প্রথমে, তারপর পানি দিয়ে গিলে ফেলল দুটো ট্যাবলেট। বলল, ‘ড্রেসিং করা দরকার...’

‘গাড়ি থামাব?’

‘না, অলব্যানির কাছে গিয়ে একটা মোটেল খুঁজে বের করো। সস্তা...’ ক্রেডিট কার্ডের ঝামেলা যেন না থাকে। নগদে পেমেন্ট করব আমরা, কোনও ট্রেইল থাকবে না তাতে। ওখানে গিয়ে তুমি আমার ক্ষতটার ড্রেসিং করে দিতে পারবে।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমি একটু চোখবন্ধ করি, কেমন? শরীর আর চলছে না।’

‘নিশ্চয়ই। তুমি ঘুমাও, রানা।’

সিটে মাথা রেখে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে গেল রানা।

মোটেলের নাম সানসেট হাউজ। অলব্যানির সীমানায়, হাইওয়ে থেকে একশো গজ দূরে এক অর্থে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওটা—অবাক হবার কিছু নেই, হলিডে ইন্ আর বেস্ট ওয়েস্টার্নের মত বিখ্যাত হোটেলগুলোর এলাকায় আর কোনও জরাজীর্ণ মোটেল না-থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে ব্যবসা বেশ রমরমা সানসেট হাউজের; কারণ সবার তো আর নামী-দামি হোটেলে ওঠার সঙ্গতি থাকে না, পয়সা বাঁচানোর জন্য সস্তা লজিং খুঁজতে হয় তাদেরকে... আর এ-এলাকায় এটাই একমাত্র সস্তা মোটেল। ব্যবসার ফন্দি-ফিকির ভালই জানে মালিক, খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকার কারণ বুঝতে পেরে ইচ্ছে করেই করুণ দশা ধরে রেখেছে মোটেলটার, মেরামত করছে না। যা আয় হচ্ছে, তা সে খাটাচ্ছে একটা করে ডাইনার, গ্যাস স্টেশন আর মোটর গ্যারাজের পিছনে—মোটেলের পাশেই ওগুলো।

মোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ড টরাস, রানা বসা ভিতরে। সোহানা গেছে রুম ভাড়া করতে, কিন্তু ও যায়নি—ওর বিধ্বস্ত, অসুস্থ চেহারা ম্যানেজারের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে। ইতোমধ্যে গাড়িতে বসেই পানি দিয়ে মুখ-হাত ধুয়েছে রানা, শরীরে লেগে থাকা জমাট রক্ত পরিষ্কার করেছে; পোড়া, ছেঁড়া-ফাটা পোশাক ফেলে দিয়ে গায়ে চড়িয়েছে সোহানার আনা নতুন প্যাণ্ট আর পুলোভার। মাথায় দিয়েছে চওড়া কার্নিশঅলা একটা বেসবল ক্যাপ—চেহারা ঢেকে রাখবার জন্য। ওষুধ খেয়েছে রানা, তারপরও আচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি দূর হয়নি, জ্বরটা সামান্য কমেছে শুধু। এই অবস্থাতেই সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে ও, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারদিকে; বিপদ দেখলে রিঅ্যাক্ট করবার জন্য টান টান সজাগ

রেখেছে স্নায়ুকে ।

একটু পরেই ফিরল সোহানা—হাতে একটা হলুদ রঙের ট্যাগ লাগানো চাবি ।

‘ক্যাশে ভাড়া মিটিয়েছ?’ নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল রানা ।

‘হ্যাঁ,’ সোহানা মাথা ঝাঁকাল । ‘বলেছি, আমাদের ক্রেডিট কার্ড চুরি হয়ে গেছে ।’

‘বিশ্বাস করেছে?’

‘মনে হয় না । তবে ব্যাটা বলল, আমাদের মত জুটিরা নাকি ক্যাশেই সবসময় পেমেন্ট করে ।’

‘আমাদের মত জুটি?’ রানা ভুরু কঁচকাল ।

সোহানা হাসল । ‘ম্যানেজার ভাবছে, আমরা পরকীয়া করছি ।’

‘তাতে দোষ দেয়া যায় না । রাখটাক দেখলে অমনটা ভাবাই স্বাভাবিক । খালি রিপোর্ট করে না দিলেই হয় ।’

‘করবে বলে মনে হয় না, তাতে ব্যবসার বদনাম হবে না?’

‘হুঁ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা ।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল সোহানা, ফোর্ড টরাসকে নিয়ে গেল ওদের ভাড়া করা রুমটার সামনে । তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে নামল গাড়ি থেকে, রানা ওকে অনুসরণ করল । ট্রান্স খুলে ব্যাগ নিল ওরা, বারান্দায় উঠে রুমের দরজা খুলল, ঢুকে পড়ল ভিতরে ।

কামরাটা মাঝারি আকারের । রং-ওঠা চাদর বিছানো দুটো সিঙ্গেল খাট রয়েছে, মাঝখানের টেবিলটার বার্নিশ উঠে গেছে । মেঝেতে কার্পেট আছে—ছেঁড়ে-ছেঁড়ে অবস্থা । দেয়ালে ব্র্যাকেটে ঝোলানো টিভিটা অন্তত দশ বছরের পুরনো ।

ড্রেসিং-টেবিল আছে একটা, আয়নাটার এক কোণা ফাটল ধরা। সব মিলিয়ে বিতিকিছিরি একটা আবাস।

‘চমৎকার!’ শিস দিয়ে উঠল রানা।

ভুরু কৌঁচকাল সোহানা। ‘আমি কিন্তু মুগ্ধ হতে পারছি না। যা অবস্থা... এখানে থাকব কী করে?’

‘রুমের চেহারা দেখে খুশি হইনি,’ রানা বলল। ‘অবস্থা খারাপ নিঃসন্দেহে, তবে সেটাই তো চাই। এমন একটা জায়গায় আমাদের খোঁজার কথা ভাববে না কেউ।’

‘হুম। তুমি রেস্ট নাও। আমি গাড়ি থেকে বাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসছি। তোমার কিছু লাগবে?’

‘ফাস্ট এইড কিট। ওটা আগে আনো।’

‘আনছি। তুমি বরং গোসল করে ফেলো, ময়লা শরীরে জীবাণু থাকে। ইনফেকশন হয়ে যাবে।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। সোহানা বেরিয়ে যেতেই জামা-কাপড় ছাড়ল, তারপর ঢুকে পড়ল বাথরুমে। ভাগ্য ভাল, ওখানটা রুমের তুলনায় পরিষ্কার—নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় নিঃসন্দেহে।

শাওয়ারে ঢুকে গরম পানি ছাড়ল রানা, শরীর ধুয়ে ফেলতে শুরু করল। কাঁধ থেকে ডাষ্ট টেপটা খোলেনি এখনও, তবে শরীরের এখানে-সেখানে আরও কাটা-ছেঁড়া আছে, উন্মুক্ত ক্ষতে পানি লাগতেই জ্বালাপোড়া শুরু হলো। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সহ্য করতে হলো।

দরজায় শব্দ হলো, সোহানা ঢুকল বাথরুমে। জিজ্ঞেস করল, ‘সাহায্য দরকার?’

‘করলে খুব ভাল হয়। ব্যথায় নড়তে-চড়তে পারছি না।’

‘ঠিক আছে।’

শাওয়ারের পর্দা সরাল সোহানা, থমকে গেল মুহূর্তের জন্য। দৃশ্যটা ভয়াবহ—রানার শরীরের অগণিত আঘাত থেকে ঝরছে রক্ত, স্বচ্ছ পানির রং বদলে গেছে, লাল একটা ধারা গড়াচ্ছে মেঝেতে। উঠে আসা আবেগটাকে কোনোমতে দমাল ও, গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, ‘তোমার অবস্থা খুব খারাপ, রানা। ঠিক করে বলো, সত্যিই ডাক্তার ডাকব না?’

‘নিজেই চিন্তা করে দেখো, ডাকা ঠিক হবে কি না।’

আসবার পথে সোহানাকে পুরো ঘটনা ভেঙেচুরে খুলে বলেছে রানা। মনোযোগী শ্রোতার মত শুনেছে ও, কোনও প্রশ্ন করেনি। কিন্তু এখন আর না-করে পারল না।

‘আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের কেন খুন করতে চাইবে সিদ্ধিকী? ও অভিনয় করেছে বলে মনে হয় না। নিউয়ার্কে ওর উপর সত্যি সত্যি হামলা হয়েছিল... তুমি নিজেই বলেছ আমাকে। ওটা সাজানো ঘটনা ছিল না।’

‘সেফ-সাইট আর নিউয়ার্কের দলদুটো একই ছিল বলে মনে হয় না,’ রানা বলল। ‘এখানে যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের ভাবভঙ্গি স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডোদের মত লেগেছে আমার কাছে। যে-ধরনের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছিল, তা কেবল ইউএস আর্মির কাছেই আছে।’

এক টুকরো কাপড়ে সাবান মাখিয়ে রানার পিঠ ডলতে শুরু করল সোহানা। ‘আর ওয়্যারহাউসের ওরা?’

‘হার্ডওয়্যার ভালই ছিল, তবে ওদের ট্যাকটিকস্ ছিল একেবারেই কনভেনশনাল।’ ঘষাঘষিতে মুখ কুঁচকে কথা বলছে রানা। ‘সেফ-সাইটের দলটার মত শৃঙ্খলা ছিল না ওদের মধ্যে। হামলা শুরুর আগে ঠিকমত চারপাশ কাভার করেনি,

শুরুতেই আমার গাড়িটাও উড়িয়ে দিয়েছে বোকার মত... ওটার কারণে সতর্ক হতে পেরেছি আমি। স্পেশাল ফোর্স হলে এ-কাজ করত না। অ্যাসল্ট শুরু হয়ে যাবার পর গাড়ি-ধ্বংস করত, যাতে রিঅ্যাকশন টাইম না-পায় টার্গেট।’

আর কিছু বলল না সোহানা। ভাল করে রানার শরীর থেকে সমস্ত ময়লা ও রক্ত পরিষ্কার করে ফেলল, তারপর বন্ধ করে দিল শাওয়ারটা। বলল, ‘এবার আসল কাজ।’

‘হ্যাঁ,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘সাবধানে কোরো।’

‘নিশ্চিন্তে থাকো।’

রানার ঘাড়ে লাগানো ডাক্ট টেপটার কোণা ধরল সোহানা, আস্তে আস্তে তুলতে শুরু করল। তাড়াহুড়ো করল না, তাতে ক্ষতটার আকার আরও বড় হয়ে যেতে পারে। ধীর-স্থির ভাবে এগোলেও ব্যথা কম পেল না রানা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রাখতে হলো ওকে।

খুলে গেল টেপটা কিছুক্ষণের মধ্যে, রক্ত বেরুতে শুরু করল অঝোর ধারায়। তাড়াতাড়ি শাওয়ার আবার ছেড়ে দিল সোহানা, পানির ধারার পাশাপাশি ছোট কাপড়টা দিয়ে হালকা ঘষা দিয়ে ক্ষতের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলতে থাকল। খানিক পরে থামল ও, শাওয়ার বন্ধ করে বলল, ‘হয়ে গেছে।’

মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে আছে। তাই জিজ্ঞেস করল, ‘কী অবস্থা দেখছ?’

‘চওড়া একটা গর্ত,’ সোহানা বলল। ‘ভাল খবর হচ্ছে, বুলেট দেখতে পাচ্ছি না; ওটা বেরিয়ে গেছে।’

‘আমারও তা-ই মনে হচ্ছিল। কিন্তু খারাপ খবরটা কী?’

‘গর্তটা দু’ইঞ্চি লম্বা।’

‘হুম। দাঁড়িয়ে থেকো না, কাজ শেষ করো।’

কাপড়টা রানার হাতে দিল সোহানা। ‘চেপে ধরে থাকো। আমি বোতলটা নিয়ে আসছি।’

নির্দেশটা পালন করল রানা, সোহানা বেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে, ফিরল হাতে একটা মাঝারি আকারের বোতল নিয়ে। মোটেলের আসবার পথে একটা ড্রাগস্টোরে থেমে ওটা কিনে এনেছে ও—হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড। জিনিসটা দেখে টোক গিলল রানা, পরের কাজটা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হতে যাচ্ছে।

‘রেডি?’ সোহানা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা, সরিয়ে নিল কাপড়টা। বোতলের মুখ খুলে ভিতরের দ্রবণটা ক্ষতের উপর ঢেলে দিল সোহানা।

তীব্র একটা হিসহিস শব্দ আর ফেনা তুলে উন্মুক্ত মাংসে হামলা চালান হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড, সমস্ত জীবাণু ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষতটাকে জীবাণুমুক্ত করে ফেলছে। কিন্তু ওসব মাথায় নেই রানার। ওর মনে হলো ছুরি চালিয়েছে কেউ, চোখে আঁধার দেখল অসম্ভব ব্যথায়। প্রায় চৈতন্যেই উঠছিল, কোনোমতে দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে থামাল নিজেকে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সোহানা, তারপর ছেড়ে দিল শাওয়ারটা। পানির ধারার সঙ্গে ফেনা-ওঠা তরলটা গড়াতে শুরু করল। পরিষ্কার হয়ে যেতেই শাওয়ারটার গতি কমাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা পার-অক্সাইড ঢালল সোহানা ক্ষতের উপর। এবার আর সহ্য করতে পারল না রানা, গুণ্ডিয়ে উঠল। ওর অবস্থা দেখে সোহানার ভিতরটাও কেমন কেমন করছে, কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নয়। ক্ষতটা ঠিকমত পরিষ্কার না করলে নির্ঘাত ইনফেকশন হয়ে যাবে রানার। নিজেকে সামলাল ও। ভালমত দ্বিতীয়বার ফেনা উঠতে দিল, তারপর বলল, ‘হয়ে
অন্তর্ধান-১

গেছে, এবার ধুয়ে ফেলো।’

শাওয়ারের গতি বাড়িয়ে দিল রানা, ক্ষত থেকে দ্রবণটা বেরিয়ে যেতেই টলে উঠল। পা কাঁপছে ওর, পড়ে যাচ্ছিল... সোহানা ধরে ফেলল এক হাতে। অন্যহাতে হ্যান্ডার থেকে টাওয়েল নিয়ে গা মুছে দিল, তারপর জড়িয়ে দিল কোমরে। বলল, ‘রুমে চলো। হাঁটতে পারবে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে—পারবে না।

‘দরকার নেই, আমার গায়ে ভর দাও,’ সোহানা বলল।

ধরাধরি করে রানাকে রুমে নিয়ে গেল ও, বসাল বিছানায়। ফার্স্ট এইড কিট থেকে গজ, ব্যাণ্ডেজ আর অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম বের করল। ক্ষতটা বাঁধার আগে আলোতে ভাল করে দেখে নিল ও—খটখটে শুকনো ওটা এখন, আকার-আয়তন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

‘কী বুঝছ?’ কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল রানা।

‘দু’পাশের চামড়া লাল হয়ে আছে,’ সোহানা জানাল।

‘টেপটার কারণে হতে পারে।’

‘উঁহু, অন্য রকম। মনে হচ্ছে, অলরেডি ইনফেকশন ধরে ফেলেছে। ওষুধ দরকার তোমার।’

‘ওটা পরে হবে। আগে ব্যাণ্ডেজ করো। আমি আর বসে থাকতে পারছি না।’

মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষতের মধ্যে ক্রিম লাগাল সোহানা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধল যত্ন করে। কাজটায় বেশ দক্ষ ও, বিসিআই-এর বেসিক ট্রেনিং প্রত্যেক এজেন্টকেই ফার্স্ট এইড আর ছোটখাট অপারেশনের কোর্স করতে হয়।

‘হয়েছে?’ ধৈর্যহারী কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। দুলতে শুরু

করেছে ও, শরীরটা যেন আর নিজের নয়, কোনও কথাই শুনতে চাইছে না।

‘হ্যাঁ, শোও।’

সোহানা সাহায্য করল ওকে, শুইয়ে দিল ঠিক করে। গায়ের উপর টেনে দিল একটা কম্বল। কপালে হাত রেখে দেখল, শরীর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা, ডাক্তার ডাকার উপায় নেই। জ্বর কমাতে হবে স্পঞ্জিং করে।

‘চোখ-কান খোলা রেখো...’ দুর্বল স্বরে বলল রানা, ‘অচেনা কাউকে...’

‘ওসব আমি জানি,’ বাধা দিয়ে বলল সোহানা। ‘তুমি ঘুমাও।’

চুপ হয়ে গেল রানা। নিঃসাড় হয়ে গেছে, শুধু দম নেবার তালে তালে ওঠানামা করছে বুকেটা।

এতক্ষণে কঠিন ভাবটা খসে পড়ল সোহানার চেহারা থেকে। চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল ওর।

আঠারো

কাঁধে নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠল রানা। চোখ মেলল ও, জানালার ভারি পর্দা গলে আসা ম্লান আলোয় সোহানাকে অন্তর্দান-১

দেখল—ব্যাণ্ডেজ বদলাচ্ছে। সুন্দর চোখদুটোর উপরে ভুরুদুটো
কুঁচকে রয়েছে ক্ষতের দিকে তাকিয়ে।

‘কেমন দেখছ?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এখনও লাল হয়ে আছে,’ শান্ত গলায় জানাল সোহানা।

শঙ্কা অনুভব করল রানা।

‘তবে তোমার জ্বর নেমে গেছে,’ সাহস জোগানোর সুরে
বলল সোহানা।

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। ‘যাক, অন্তত একটা ভাল
খবর শোনালে।’

‘আরও আছে। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে না আর।’

‘শুনে খুশি হলাম।’

আরেক দফা অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম লাগাল সোহানা,
তারপর নতুন ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিল জায়গাটা।

‘বাজে ক’টা?’ রানা জানতে চাইল।

হাতঘড়ি দেখল সোহানা। ‘সোয়া চারটে।’

‘এই সময়ে এত আলো!’

‘ভোর না, এখন বিকেল।’

‘কী!’

‘হ্যাঁ, জনাব,’ সোহানা হাসল। ‘পুরো চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি
সময় ধরে ঘুমিয়েছ তুমি। কেন, মনে নেই? রাতে আর সকালে
তোমাকে বসিয়ে খাবার আর ওষুধ খাইয়েছি আমি... একবার
বাথরুমেও নিয়ে গেছি।’

শূন্য দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা। ‘কী আশ্চর্য!
আমার কিছুই মনে পড়ছে না।’

‘ও কিছু না, শকের সাইড-এফেক্ট।’

‘এভাবে ঘুমাচ্ছি... মোটেলের লোকজন সন্দেহ করেনি

তো?’

‘নাহ্। সকালে রুম পরিষ্কার করতে একজন মেইড এসেছিল, ওকে বলেছি—বাসি স্যাণ্ডউইচ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি। ডেস্ক-ক্লার্ক সেটা জানতে পেরে কিছু ওষুধও পাঠিয়েছে।’

‘ভাল।’

‘ওঠো, কিছু মুখে দাও। ঘুমের মধ্যে খাইয়েছি... ঠিকমত খাওনি কিছু। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?’

‘নাহ্।’

‘তাও খেতে হবে।’ রানাকে বসতে সাহায্য করল সোহানা।
‘না খেলে সুস্থ হবে কী করে?’

‘কী খাওয়াবে?’ বেডরেস্টে হেলান দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘সরি, সঙ্গে নেই কিছু। পিৎজা আনানো যায়, তবে রুম ডেলিভারি চাইলে সিকিউরিটি হাজার্ড দেখা দেবে। তারচেয়ে তুমি বসো, আমি কিছু কিনে নিয়ে আসি। কী খাবে—ফ্রায়েড চিকেন? মিল্ক শেক? কী খেতে ইচ্ছে করছে, বলো?’

সোহানার আগ্রহ দেখে আর মানা করতে পারল না রানা। বলল, ‘চিকেনটাই লোভনীয় শোনাচ্ছে।’

‘বসো তা হলে।’ সোহানা উঠে দাঁড়াল। ‘আমি এক্ষুনি পাশের ডাইনারটা থেকে নিয়ে আসছি।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও, তাড়াহড়োর কিছু নেই। আগে বাথরুমে নিয়ে চলো আমাকে। ভাল কথা, রেজার-শেভিং ক্রিম... এসব কিনেছিলে?’

‘হ্যাঁ, ব্যাগে আছে। শেভ করতে চাও?’

মুখে গজিয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল রানা, মাথা
অন্তর্ধান-১

ঝাঁকিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ। নাও ওগুলো।’

শেভের সরঞ্জামসহ ওকে বাথরুমে পৌঁছে দিল সোহানা।
জানতে চাইল, থাকবে কি না।

‘দরকার নেই, এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি,’ রানা
বলল। ‘তুমি যাও, খাবার নিয়ে এসো।’

‘একা থাকতে তোমার কোনও সমস্যা হবে না তো?’
সোহানার সন্দেহ দূর হচ্ছে না।

‘কীসের সমস্যা? আমি কি কচি খোকা নাকি? যাও তুমি,
দরজায় দু’ নট ডিস্টার্ব সাইন-টা ঝুলিয়ে দিয়ে যেয়ো। আর
হ্যাঁ, যাবার আগে আমার পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে যাও।
তুমিও তোমারটা সঙ্গে রেখো।’

ভুরু কোঁচকাল সোহানা। ‘বিপদের আশঙ্কা করছ?
আমাদের খবর যদি শত্রুরা জানত, তা হলে এতক্ষণে এসে
পড়ত না?’

‘হতে পারে। তবে সতর্ক থাকলে ক্ষতি আছে?’

‘তোমার যা ইচ্ছা।’ কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা, তারপর বেরিয়ে
গেল বাথরুম থেকে। একটু পরই রুমের দরজা খোলা-বন্ধ
হবার আওয়াজ পেল রানা।

তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও।
দরজাটা ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি না, চেক করল। তারপর
তাকাল ঘড়ির দিকে। সাড়ে চারটে বাজে। কী মনে হতে
রিমোট তুলে নিয়ে টিভি অন করল—একটা ব্যাপারে নিশ্চিত
হওয়া প্রয়োজন।

খবরের খোঁজে একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে চলল
ও। চ্যানেল সিন্ধু-এ পাওয়া গেল, শিরোনাম পড়ছে পাঠক।
ভুরু কুঁচকে গেল ওর। অগ্নিকাণ্ডের কথা বলাই হলো না।

বিস্তারিত সংবাদে মিনিট পাঁচেক পরে একটা প্রতিবেদন দেখানো হলো, তাতে ফায়ার-সার্ভিসের তৎপরতার ভিডিও-র পাশাপাশি জানানো হলো, রাত নাগাদ পুরো আগুনই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছে। এলাকা এখন বিপদমুক্ত।

তাড়াতাড়ি চ্যানেল বদলে আরেকটা খবর দেখল রানা, ওখানেও একই অবস্থা। দাবানলের মত বিশাল একটা দুর্ঘটনা মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের কাভারেজ পেল। সংবাদ-পাঠক দর্শকদের আশ্বস্ত করল, আগুনটা পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

থম মেরে বসে রইল রানা।

বিশ মিনিট পর দরজায় আওয়াজ হলো। পর পর তিনবার নক করল সোহানা, বিরতি নিয়ে আরও একবার—এক ধরনের কোড ওটা, রানাকে আশ্বস্ত করছে নিজের বিষয়ে। সিগ-সাওয়ারটা হাতে নিয়ে ফেলেছিল রানা, নক শুনে আবার ঢুকিয়ে রাখল বালিশের তলায়।

লক খুলে ভিতরে ঢুকল সোহানা, হাতে একটা কাগজের ব্যাগ, তাতে খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে। রানার চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে?’

‘টিভিতে খবর দেখলাম...’

‘কী দেখিয়েছে?’ টেবিলের উপর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল সোহানা, ভিতর থেকে প্লাস্টিকের লাঞ্চবক্স বের করতে শুরু করল।

‘দেখায়নি কিছু... সেটাই অবাক করছে আমাকে।’ ঘড়ির দিকে তাকাল রানা—প্রায় ছ’টা বাজে। বলল, ‘আবার হবে খবর, এদিকে এসে বসো, নিজের চোখেই দেখো।’

‘দাঁড়াও, এক মিনিট। খাবার নিয়ে আসি।’

লাঞ্চবক্স আর পানির বোতল নিয়ে বিছানার কাছে এল

সোহানা, রানার হাতে তুলে দিল, নিজের জন্যও রাখল।
তারপর বসল পাশে।

ঠিক ছ'টায় আট নম্বর নিউজ চ্যানেলে খবর শুরু হলো।
খেতে খেতে দেখল দুজনে। আগের দুটো খবরেরই
পুনরাবৃত্তি—অগ্নিকাণ্ডের কথা বলা হলো বটে, তবে দায়সারা
ভঙ্গিতে... খুব স্বল্প পরিসরে। বোঝা গেল, দর্শকদের শুধু
আশ্বস্ত করবার জন্যই রাখা হয়েছে বিষয়টা, নইলে বাদ দিয়ে
ফেলা হত। কে জানে, রাতের সংবাদে হয়তো আর দেখানোই
হবে না কিছু।

‘দেখলে ব্যাপারটা?’ বলল রানা। ‘এক ফোঁটাও গুরুত্ব
দেয়া হচ্ছে না খবরটাকে। অথচ আগুনের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা
গোপন বাঙ্কার পাবার কথা ওদের... চারটে লাশ পাবার কথা...
লুকানো একটা হেলিপ্যাড, পোড়া একটা হেলিকপ্টার... হইচই
পড়ে যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক ছিল না?’

সোহানারও ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, ‘এভাবে আসলে
চিন্তা করিনি। কাল রাতেও খবর দেখেছি আমি, চ্যানেলগুলোয়
এ-সংক্রান্ত কিছু না উল্লেখ করায় মনে হয়েছিল, তখন পর্যন্ত
কিছু খুঁজে পায়নি ওরা।’

‘না-পাবার কোনও কারণ নেই। আগুনের সোর্স অভ
অরিজিনের খোঁজে স্পটার প্লেন উড়িয়েছে ফায়ার-ফাইটাররা।
আকাশ থেকে আমাদের হেলিপ্যাড আর হেলিকপ্টারটা স্পষ্ট
দেখা যাবার কথা। তা ছাড়া গাছপালা পুড়ে শেষ হয়ে যাবার
পর সেফ-সাইটেই সবার আগে আগুন নিভবে। ওখানে
গ্রাউণ্ড-ট্রু পাঠালে বাঙ্কার আর লাশগুলো খুঁজে পেতে মোটেই
সময় লাগার কথা নয়। তা ছাড়া যেভাবে হামলা চালানো
হয়েছে, তাতে গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ আশপাশের

শহরের মানুষজনের শোনার কথা।’

‘বলতে চাইছ, সবকিছু খুঁজে পেয়েও চুপচাপ রয়েছে ওরা?
নিউজ ব্ল্যাকআউট?’

‘তেমনটাই মনে হচ্ছে না?’

‘হুম,’ একমত হলো সোহানা। এগিয়ে গিয়ে খাবারের ব্যাপ
থেকে একটা খবরের কাগজ বের করল। ‘আজকের পেপার
নিয়ে এসেছি—অলব্যানি টাইমস্ ইউনিয়ন। সকালের এডিশন,
খুব বেশি কিছু না থাকারই কথা, তারপরও এসো পড়ে দেখি।
আমার ধারণা, অন্তত টিভির চেয়ে বেশি ইনফরমেশন পাওয়া
যাবে।’

পেপারটা রানার কাছে নিয়ে এল ও। দুজনে একসঙ্গে
পড়তে শুরু করল।

সামনের পাতাতেই ছাপা হয়েছে দাবানলের খবর—
দু’কলাম জুড়ে। একটা ছবি আছে, তাতে কালি-বুলি মাঝা
কয়েকজন ফায়ার-ফাইটারকে আগুনের একটা পাঁচিলের দিকে
পানি ছুঁড়তে দেখা যাচ্ছে। প্রথম পাতায় শেষ খবরটা, বাকি
অংশের জন্য অষ্টম পৃষ্ঠায় যেতে হলো। পড়তে পড়তে হঠাৎ
একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল সোহানা।

‘এই দেখো,’ একটা প্যারার উপর আঙুল রেখে বলল ও।
‘শহরের একজন’ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছে... বেশ
বড়-সড় বিস্ফোরণ!’

‘নিশ্চয়ই আমাদের এভিয়েশন ফুয়েল ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণ,’
অনুমান করল রানা।

‘লোকটারও তা-ই ধারণা,’ সোহানা বলল। ‘অন্তত একটা
ফুয়েল ডিপো উড়ে না গেলে এমন জোরাল আওয়াজ হতে
পারে না।’

‘কর্তৃপক্ষ বলছেন, আগুনটা পাহাড়ি ঢালে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ায় ওখানকার হলিডে কেবিনগুলোর ফুয়েল রিজার্ভে ওই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে,’ রানা পড়ল।

‘সেফ-সাইটের আশপাশে কোনও কেবিন নেই,’ মনে করিয়ে দিল সোহানা।

‘সেটা সাধারণ লোকজন জানে না। মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে আসল ঘটনা চেপে যাচ্ছে ওরা।’

‘এই যে,’ আরেকটা অংশ দেখাল সোহানা। ‘এখানে লিখেছে, অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে একটা বিশেষ টিম নিয়োগ করা হয়েছে। কে করেছে, তা কিন্তু লেখেনি।’

‘লেখেনি, কারণ ওদের আনা হয়েছে পুরো ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য; তদন্ত করবার জন্য নয়।’

‘সেটা কি সম্ভব?’ সোহানা সন্দেহ প্রকাশ করল। ‘তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে তো সেফ-সাইটের ওই ধ্বংসস্থূপ ফায়ার-ফাইটারদের চোখে পড়বেই। এ-কথা বোলো না যে, ইমার্জেন্সি সার্ভিসের প্রত্যেকটা সদস্যকে হাত করা হয়েছে। সেটা কোনোদিনই সম্ভব নয়।’

‘অতকিছুর দরকার কী?’ রানা বলল। ‘লোকাল অথরিটির উপর চাপ সৃষ্টি করা কঠিন কিছু নয়। ওদেরকে হয়তো ইনভেস্টিগেশন টিমের এলাকা থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের সেফ-সাইটটা খুবই নির্জন এলাকায়, ধারেকাছে কেউ না থাকলে... আর সঙ্গে যদি কয়েকটা হেলিকপ্টার থাকে, তা হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই জায়গা থেকে সব ধরনের এভিডেন্স সরিয়ে ফেলা সম্ভব। ওই স্পেশাল টিমটা খুব সম্ভবত তা-ই করেছে।’

‘কিন্তু লোকাল অথরিটি শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশে কাজ

করে। আর কেউ তো ওদেরকে জায়গাটা থেকে দূরে থাকতে বলতে পারে না!’

‘ঠিক ধরেছ,’ তিষ্ঠ গলায় বলল রানা। ‘একমাত্র আমেরিকান সরকার এর সঙ্গে জড়িত থাকলেই ব্যাপারটা সম্ভব।’

‘হুম,’ সোহানা একমত হলো। ‘ওরা শুরু থেকেই জড়িত। পালানোর আগে ড. সিদ্দিকী তো ডি.ই.এ.-র হয়ে কাজ করছিল, তাই না?’

‘কিন্তু ডি.ই.এ.-তে স্পেশাল অপ্‌স্ টিম নেই,’ রানা বলল। ‘থাকলেও ওরা আমাদের টিমকে কেন খুন করতে চাইবে, সেটা বুঝতে পারছি না। আমেরিকায় অন্তত এই একটা সংস্থার সঙ্গে রানা এজেন্সি বা বিসিআই-এর কোনও শত্রুতা নেই।’

‘ওদের টার্গেট যদি ড. সিদ্দিকী হয়ে থাকে?’

‘সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু সমস্যা হলো, দলটাকে সিদ্দিকী নিজেই খবর দিয়েছিল... আমার তা-ই বিশ্বাস।’

একটু ভাবল সোহানা। তারপর বলল, ‘সেক্ষেত্রে সিদ্দিকীকে প্ল্যান্ট করা হয়েছিল আমাদের রিলোকেশন-টিমকে বাগে পাবার জন্য। পুরো ব্যাপারটার এই একটাই ব্যাখ্যা।’

‘এই ব্যাখ্যাতেও সমস্যা আছে,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘মনসুরের টিমের সমস্ত কেসের ডিটেইলস্ জানা আছে আমার। ওরা অন্তত এমন কোনও শত্রু তৈরি করেনি, যার পক্ষে আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের একটা টিম বা ইকুইপমেন্ট জোগাড় করা সম্ভব।’

‘কিন্তু তোমার তো অমন শত্রু আছে!’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আমি টার্গেট ছিলাম বলেও মনে হয় না।

আমাকে ফাঁদে ফেলবার আরও অনেক উপায় আছে। তা ছাড়া লোকেশনটা ভেবে দেখো, সেফ-সাইটের মত সুরক্ষিত জায়গায় হামলা চালালে আসলে সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু? আমাকে যদি কোণঠাসাই করতে হয়, তা হলে সঙ্গে চারজন ট্রেনিং অপারেটর থাকা অবস্থায় চেষ্টা চালাবে কেন?’

‘তুমি নও, মনসুরের টিমও নয়। তা হলে তো শুধু ড. সিদ্দিকীই বাকি থাকে। কিন্তু ওকে কেন খুন করতে চাইবে আমেরিকানরা? তোমার মুখেই শুনেছি, ওয়্যারহাউসে ওরা তাকে খুন করতে চায়নি, জ্যান্ত ধরতে চেয়েছে।

‘এই ব্যাপারটা আমার কাছেও ঘোলাটে,’ রানা স্বীকার করল। ‘খুন হবার সম্ভাবনাই যদি থাকে, তা হলে সিদ্দিকী ওদেরকে খবর দিল কেন?’

‘একটা কথা আমি ভাবছি...’ ইতস্তত করে বলল সোহানা। ‘শ্রেফ একটা আইডিয়া, তবে...’

‘বলে ফেলো, আমার মাথায় কিছু আসছে না।’

সোজা হয়ে বসল সোহানা। ‘টিমদুটো যদি এক দলের না হয়ে থাকে? তুমিই বলেছ, ওদের ট্যাকটিকস্ দু’রকম ছিল। এমন কি হতে পারে না, দুটো পক্ষ লেগেছে ড. সিদ্দিকীর শিহনে? একদল তাকে জ্যান্ত চায়, অন্যদল চায় খুন করতে? তুমি আর মনসুরের টিম ছিলে শ্রেফ সেকুগারি টার্গেট, সিদ্দিকীকে খতম করবার পথে একমাত্র বাধা।’

‘হতে পারে,’ রানা মাথা ঝাঁকাল। ‘কিন্তু সেক্ষেত্রে সিদ্দিকী আমাদেরকেই খুন করতে শুরু করল কেন? ওকে একমাত্র আমরাই রক্ষা করতে পারতাম। ওর সঙ্গে যদি দ্বিতীয় দলটার যোগসাজশ না থাকে, তা হলে তো ব্যাপারটা একেবারেই খাপ খায় না।’

‘তা বটে,’ সোহানা একমত হলো। ‘আচ্ছা, তুমি তো দ্বিতীয় দলটাকে হেলিকপ্টারে চড়তে দেখেছ, তাই না?’

‘হ্যাঁ, চলে যাবার সময়।’

‘সবাইকে চড়তে দেখেছ?’

‘অবশ্যই। পুরো টিমটা চলে গেছে কি না, শিয়োর হতে হয়েছে আমাকে।’

‘সিদ্ধিকী ছিল ওদের মধ্যে?’

‘না।’

‘তুমি শিয়োর?’

‘হাণ্ডেড পার্সেন্ট।’

‘ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না? ও যদি দ্বিতীয় দলটার লোক হত, তা হলে কি ওকে ফেলে যেত ওরা?’

‘খুঁজে পায়নি হয়তো। আগুনটা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল, তাতে কপ্টারের কাছে ফিরতে পারেনি হয়তো লোকটা, পুড়ে মরেছে।’

‘অনেকগুলো হয়তো তোমার কথায়,’ বড় করে শ্বাস ফেলল সোহানা, তাকাল পেপারের দিকে। ‘আচ্ছা, এত জটিল করে ভাবছি কেন? সহজ হতে পারে না পুরো ব্যাপারটা? দুটো পক্ষ লেগেছে সিদ্ধিকীর পিছনে... একদল তাকে মারতে, অন্যদল তাকে জ্যান্ত ধরতে চাইছে। দুটোকেই ভয় পাচ্ছে লোকটা। আর তোমাদেরকে সে খুন করবার চেষ্টা করেছে যাতে ওর রিলোকেশন সংক্রান্ত ইনফরমেশন ফাঁস না হয়, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য। অবশ্য হ্যাঁ, দ্বিতীয় টিমটাকে কেন খবর দিল, সেটা একটু অস্পষ্টই বটে...’

আচমকা যেন একটা হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল রানার সামনে। পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেল ওর

কাছে। ‘শিট!’ গাল দিয়ে উঠল ও।

‘কী, ভুল কিছু বলেছি?’

‘না, সোহানা। ঠিক বলেছ... একদম ঠিক। কোনোকিছুই অস্পষ্ট নয়...’

‘মানে!’

‘সিদ্ধিকী যে একটা জিনিয়াস, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি,’ উত্তেজিত গলায় বলল রানা। ‘সাধারণ মানুষের কাতারে ফেলা যাবে না তাকে। অ্যাসল্ট টিমকে সে খবর দিয়েছে বটে, তবে সেটা একটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক ছিল। এ-ধরনের রিস্ক একমাত্র ও-ই নেবে, আর কেউ নয়।’

‘আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না!’

‘পুরো ব্যাপারটা সিদ্ধিকীর মাস্টার প্ল্যানের অংশ, সোহানা,’ রানা বলল। ‘তোমার ধারণা ঠিক, সত্যিই বিপদে পড়েছে সে, দুটো দল পিছনে লেগেছে তার। বাঁচার জন্য গা-ঢাকা দিতে হবে তাকে। কিন্তু দেবে কীভাবে? ও একজন বিজ্ঞানী, এ-ধরনের কাজে কোনও অভিজ্ঞতা নেই তার। সেজন্যে ভাড়া করেছে আমাদেরকে। কিন্তু ও জানে, একটা নিখুঁত রিলোকেশন শুধু তখনই হতে পারে, যখন কেউ-ই নতুন পরিচয়টা সম্পর্কে জানবে না। সেটাই ওর প্ল্যান ছিল—রিলোকেশনের সমস্ত কায়দা-কানুন জেনে আমাদেরকে খুন করবে বলে শুরু থেকেই ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পাঁচজন ট্রেনিন্গ এজেন্টকে খুন করা সম্ভব নয় তার একার পক্ষে। সেজন্যে রাতের আঁধারে দ্বিতীয় টিমটাকে মেসেজ পাঠিয়েছে... হয়তো ইনফর্মার সেজে। এই টিমটা ওকে খুন করতে চায়। তারমানে পথে যত বাধা-বিপত্তি আসবে, সবই শেষ করে দেবে। ইনডাইরেস্টলি আসলে আমাদেরকেই

খুন করতে ওদের ডেকে এনেছে সে...’

‘কিন্তু তোমরা নাহয় মারা পড়লে,’ বাধা দিয়ে বলল সোহানা। ‘ও নিজেই ওই টিমটার হাত থেকে বাঁচত কীভাবে?’

‘আগুন... সোহানা। ওটা ছিল ডাইভারশন... পালাবার জন্য। সেই সঙ্গে ওটা আরেকটা কাজ করত—সেফসাইটের সমস্ত লাশ এমনভাবে পুড়িয়ে ফেলত, যাতে আইডেণ্টিফাই করার কোনও উপায় না থাকে। আমি শিয়ার, সে প্রোটেকশন টিমের সদস্য-সংখ্যা একজন কমিয়ে খবর দিয়েছে, যাতে ধ্বংসস্তুপে পাঁচটা লাশ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে খুনিরা, ছ’জনকে না খোঁজে। প্ল্যানটা পারফেক্ট নয়?’

‘তারপরও অনেক অনিশ্চয়তা থেকে যায়,’ সোহানার খটকা লাগছে। ‘আগুনকে... খুনিদের খারমাল সেন্সরকে কীভাবে ফাঁকি দেবে সে?’

‘ঠিক যেভাবে আমি দিয়েছি। লোকটা একজন জিনিয়াস, সোহানা। অত্যন্ত স্মার্ট। খুব দ্রুত সব শিখে নেয়, উপস্থিতবুদ্ধিও চমৎকার। খারমাল সেন্সরের ব্যাপারে আইডিয়া আছে তার। ফাঁকি দিতে মোটেই অসুবিধে হবার কথা নয়।’

‘কিন্তু তুমি আমার সাহায্য পেয়েছ। ও কার সাহায্য নেবে? কাউকেই তো বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া লোকটার ফিজিকাল ফিটনেস তোমার চেয়ে অনেক... অনেক কম। এরিয়া থেকে পায়ে হেঁটে বেরুনো সম্ভব নয় তার পক্ষে।’

‘সাহায্য নেয়নি, তা নিশ্চিত হচ্ছি কেমন করে? হয়তো নিয়েছে, এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে হয়তো তাকে খুনও করে ফেলেছে। এটুকুর জন্য তো বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন নেই, তাই না? ওর মত লোক রাস্তায় উঠে কাউকে জিম্মি করেও পালাতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়।’

‘তারপরও বলব, টাইমিং ঠিক ছিল না ওর,’ সোহানা মাথা নাড়ল। ‘ওর রিলোকেশনের কাজ শেষ করিনি আমরা। আগেই খুনোখুনি শুরু করল কেন?’

থমকে গেল রানা। ঠিকই তো! রিলোকেটেড হবার আগেই ওদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিল কেন লোকটা? ভাবতে শুরু করল ও, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে গেল জবাবটা।

না, টাইমিংও ভুল করেনি সিদ্ধিকী। রিলোকেশন টিমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল তার কাছে, ট্রেনিং শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকি শুধু পেপারওয়ার্ক... সেটার জন্য রানা কিংবা মনসুরের টিমের কোনও দরকার নেই। দরকার শুধু...

আচমকা একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। ড. সিদ্ধিকী কেন ওদের কম্পিউটার ঘেঁটেছে, কেন রিলোকেশন টিম-মেম্বারদের পার্সোনাল ডেটাগুলো দেখেছে, সেটা বুঝতে পারছে। ভয়াবহ সম্ভাবনাটা টের পেয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর। কোনোমতে উদ্বেগ চাপা দিয়ে সোহানাকে বলল, ‘আমার কাপড়-চোপড় দাও।’

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও।

‘করছ কী!’ আঁতকে উঠল সোহানা। ‘নিজের অবস্থা দেখেছ? কাপড় চাইছ কেন?’

‘কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, সিদ্ধিকী এবার কোথায় যাবে,’ সংক্ষেপে বলল রানা। বেডসাইড টেবিলের সামনে গিয়ে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার, ডায়াল করতে শুরু করল।

ওপাশে রিং বাজতে শুরু করল।

‘রানা...’ ডাকল সোহানা।

‘কুইক!’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘কাপড় আনো। আমাদের এখুনি বেরতে হবে!’

আর প্রতিবাদ করল না, ব্যাগ খুলে রানার পোশাক বের করতে শুরু করল সোহানা।

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত এখনও নিরন্তর, রিং বেজেই চলেছে।

‘তোলো ফোনটা... তোলো!’ বিড়বিড় করল রানা।

ওর তাগিদেই যেন খুট কুরে শব্দ হলো, শোনা গেল নারীকণ্ঠ। মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেল রানা—সত্যিকার মানুষ নয়, অ্যান্সারিং মেশিনের টেপ বাজছে। বাড়ির মালিক নেই, মেসেজ রেকর্ড করে রাখবার অনুরোধ জানাচ্ছে।

সরোষে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা।

‘কী হয়েছে, রানা?’ সোহানা জানতে চাইল। ‘কাকে ফোন করলে?’

জবাব না দিয়ে বিছানার উপর থেকে একটা শার্ট তুলে নিল রানা। গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, ‘আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সোহানা। অন্তরার ব্যাপারে সবকিছু জানে ড. সিদ্দিকী, সেফ-সাইটের কম্পিউটার থেকে সব তথ্য জেনে নিয়েছে। ওকেই খুন করতে গেছে বদমাশটা!’

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অন্তর্ধান

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ঠাণ্ডা মাথার, প্রতিভাবান এক ম্যানিয়াককে
প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে মাসুদ রানা।

উধাও হয়ে গেছে লোকটা ওরই দেখানো পথে,
ওকেই ধোঁকা দিয়ে। পিছনে ফেলে গেছে
ওর প্রিয় কয়েকজন বন্ধুর লাশ।

মরতে বসেছে সোহানাও!

এ ছাড়া রয়েছে অচেনা আরও দুই প্রতিপক্ষ দল,

ড. সিদ্দিকীকে হাতে পাবার জন্য

মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। শুরু করে দিয়েছে

খুন, অপহরণ আর ধ্বংসযজ্ঞ। তারপর?

অসুস্থ সোহানা শত্রুর হাতে...

রানার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়...

সিদ্দিকীর হাতে মৃত্যুর নির্যাস!

আর আপনার হাতে? বইটির দ্বিতীয় খণ্ড!

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা!



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী.

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুক্টিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর ‘আলোচনা বিভাগ’ লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ ফয়সাল উদ্দিন

প্র: শেখ সাইদুল হক, ১৩৭ পূ. মাদারবাড়ী, দারোগাহাট রোড, চট্টগ্রাম।

কাজীদা, কেমন আছেন? চৈত্রের এই কাঠফাটা রোদে আমার পক্ষ থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবত গ্রহণ করুন। কী, শরবত খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছেন তো! এই-বার আমাকে ঠাণ্ডা করুন, কেননা মাসুদ রানা আমার মাথা গরম করে দিয়েছে।

মাসুদ রানার স্নাইপার গুল্লের কথা বলছি। এর ২য় খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় ভসকভ রানাকে বলে, ‘আমাকে শিকার করার জন্যেই আপনি কঠোর সাধনা করে স্নাইপিং শিখেছেন।’ কিন্তু কাজীদা ভসকভকে মারার জন্যে যদি মাসুদ রানা এই গুল্লে স্নাইপিং শিখে থাকে তবে আগের গুল্লগুলোতে মাসুদ রানা যে ঝলক দেখাত তা কীভাবে সম্ভব?

সবশেষে সেবা প্রকাশনীর সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

✽ আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিন। ...গুটিং ও স্নাইপিং দুটো ভিন্ন বিদ্যা। দুটোতেই ট্রিগার টিপতে হয়, তবে অস্ত্র আলাদা, ক্যালকুলেশন আলাদা। রানা বরাবরই ভাল গুটার ছিল, সেই ঝলকই দেখেছেন এতদিন। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে বলে স্নাইপিং শিখতে হয়েছে ওকে সেরা ট্রেনারদের কাছে—সেটাও দেখে নিলেন এবার। এ বিষয়ে আরও আছে ১ম খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায়।

মোঃ শোয়েব হাসান, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ,

বাংলা শাখা, পিরোজপুর, বরিশাল। মোবা: ০১৬৭০৬৯৭৮৭৩

কাজীদা, কেমন আছেন? শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন। ইদানীং অলসতা নামক এক প্রেতাত্মা ভর করেছে আমার উপর, সেবার বই পড়তে আগে খুবই কম সময় ব্যয় হত, আর এখন তিন দিনেও একটা বই পড়তে পারি না। সোহানাকে চাচ্ছিলাম এবং পেলাম। অনেকদিন পর সলীলকে পেলাম। রানা এবং জো-লুই-এর পানিতে লড়াইটাও বেশ জমেছে। সাথে তো

শীত ছিলই। সবশেষে মুক্তির আনন্দে দু'চোখে জল। অসাধারণ। রনবীর আহমেদ বিপ্লব-এর প্রচ্ছদও দারুণ।

✽আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুব খুশি হলাম। ধন্যবাদ।

জোবায়ের আহমেদ

৫-৪/সি মণিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ মো: ০১৯১৭৭৯৪৬৫৬

আশাকরি ভালই আছেন, কাজীদা। মাসুদ রানার 'ব্ল্যাকমেইলার' পড়লাম। অনেকদিন পর উত্তেজনার একটা বই পড়ে বেশ ভাল লাগল। তারমানে এই নয় যে আগের বইগুলো উত্তেজনার ছিল না। আসলে এস এস সি পরীক্ষা থাকার কারণে অনেক দিন গল্পের বই পড়তে পারিনি। আশা করি আমি আবার এমআর নাইন-এর সাথে দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করতে পারব। সবাইকে শুভেচ্ছা।

✽ব্ল্যাকমেইলার ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগল। আশাকরি এসএসসি রেয়াল্ট খুব ভাল হবে।

মোঃ মোস্তফা ছিন্দীক, ১১/৩, সাতরং ২ নং গেট, ওয়াপদা রোড

মোস্তফা ভিলা, গ্রাম: গোপালপুর, থানা: টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর।

সত্যি কথা বলতে কী, আমার জীবনের প্রথম চিঠি আপনাকে, অর্থাৎ মাসুদ রানার স্রষ্টাকে লিখছি। তাই একটু ভয়মিশ্রিত আনন্দ লাগছে। মাসুদ রানা সিরিজের এমন কোন বই নাই যেটা আমার সংগ্রহে নাই (ইনশাল্লাহ)। অথচ মাসুদ রানা পড়ছি মাত্র ৬ বছর পেরিয়ে ৭ বছর হতে চলল। অনেক বাধা পেরিয়ে, অনেক কটু উজ্জিক পেছনে ফেলে আজ এখানে। যা হোক। 'ব্ল্যাকমেইল' বইটা পড়লাম। সোহানা এবং সোহানা। ধন্যবাদ দাদা সোহানাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনার জন্য। বইটিতে মাসুদ রানার চেয়ে সোহানার ভূমিকাই ছিল মুখ্য। একসাথে প্রেমিকা, মমতাময়ী, সেবিকা, কঠোর, কোমল—সকল ভূমিকাই ছিল সোহানার মধ্যে।

এবার যে কারণে লিখতে বসছি: 'সহযোদ্ধা' বইটি খুব ভাল লেগেছে। বন্ধুত্ব যে কী জিনিস তা মাসুদ ভাই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে। বইটিতে কিছু লাইন আছে যেগুলো হৃদয়স্পর্শ করে। যেমন:

'সোহেল, তুই বেঁচে আছিস। বাঁচতে হবে তোকে। বাঁচতেই হবে। খবরদার, মরবি না তুই!'

মাসুদ রানার পাঠক হতে পেরে আমি গর্বিত। সহযোদ্ধা নয়, অন্তত সহযাত্রী হতে পেরে আনন্দিত। সবশেষে বলব, 'আই লাভ ইউ, ম্যান।'

✽আপনার ভালবাসা পেয়ে রানা নিজেকে ধন্য মনে করছে।

ফরহাদ

৩২২ পঃ রামপুরা, উলনরোড, ঢাকা-১২১৯।

কাজী দা, সালাম নিবেন। গত একুশে বইমেলায় গিয়ে মনে করেছিলাম আপনার ৭৩তম জন্মদিন আর রানার কোয়ার্টারল সেঞ্চুরি এক সাথে পালন করব। কিন্তু বিধি বাম, সময়ের মারাত্মক রিভার্স সুইং-এর কারণে রানা নিয়মিত পালন করতে না পারায় তা আর সম্ভব হলো না। ভয় লাগছে রানা না আবার ৭৩তম নাইনটিজ-এর শিকার হয়। তাকে একটু সাবধানে ব্যাট করতে বলবেন।

কমপক্ষে আপনার সেধুরী আর রানার ৬৫০ রান হবে, এই আশা করছি।

হ্যাকার-১, ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা: ‘১৯৭৭ সনে ভয়েজার-টুকে লঞ্চ করার চল্লিশ বছর পরও তা কার্যক্ষম’, এখন ২০০৯, তা কীভাবে সম্ভব? ববি মুরল্যাণ্ডকে কি সামনের কোন বইয়ে আনা সম্ভব? গিল্টি মিয়াকে আর আনতে বলব না, মিশ্রি খানের মতন তাকে না আবার শেষে মেরে ফেলেন। বেঁচে তো আছে তাই বা মন্দ কী? কাজীদা, নববর্ষের পাশ্চাত্য ভাত আর ইলিশ ভাজার শুভেচ্ছা, সাথে মরিচ পেঁয়াজও আছে।

✽আপনি অঙ্কে খুব পাকা দেখতে পাচ্ছি, তার উপর হুঁশিয়ার পাঠকও। হ্যাঁ, সনে গোলমাল আছে। ...ফেব্রুয়ারিতে আমার ৭৩তম জন্মদিন, এটা কোথায় পেলেন?

নোবেল, C/o মোঃ আব্দুর রব শিকদার,

গ্রাম+পোস্ট: মৌকরণ জেলা: পটুয়াখালী।

প্রথমেই সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। ‘মাসুদ রানা’ সিরিজের অনেক পুরানো পাঠক আমি। রানার সাথে আমার যাত্রা শুরু ‘আই লাভ ইউ, ম্যান’ দিয়ে। এরপর দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আছি রানার সাথে। অবসরের একমাত্র সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছি রানাকে। তারই ফলস্বরূপ আমাদের বাসার একটা ক্ষুদ্র অংশ বর্তমানে রানা লাইব্রেরি। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রানার সাথে থাকতে পারি। সবশেষে ‘ব্ল্যাকমেইলার’-এর জন্য আমার পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

✽জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন আপনাকে সঙ্গে পাই, এ-ই আমার আন্তরিক কামনা। রানা ভাল লাগছে জেনে খুব ভাল লাগল। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস শুভ, বটতলা মনসুর কোয়ার্টার, বরিশাল

মোবা: 01731399703

কাজীদা, আশা করি ভালই আছেন। আমি মাসুদ রানার একজন বড় ভক্ত। প্রথমে তিন গোয়েন্দা দিয়ে সেবা প্রকাশনীর বই পড়া শুরু করলাম। তারপর মাসুদ রানার অনেক নাম ডাক শুনে শুরু করলাম মাসুদ রানা। প্রথমে ‘ধ্বংসপাহাড়’ দিয়েই শুরু করলাম যেন প্রথম থেকেই বুঝতে পারি। মাসুদ রানার বইয়ের সাথে জেমস বন্ডের গল্পের তুলনা করলে আমার কাছে দুটোই প্রায় এক ধাঁচের গল্প মনে হয়। মোটকথা দুটোই চমৎকার। হলিউডে জেমস বন্ডের ২২টি সিনেমা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে মাসুদ রানার সিনেমা তৈরি হলেও তা অতি অল্প বাজেটের জন্য উঁচু মানের তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কি বেশ ভাল বাজেট দিয়ে মাসুদ রানার সিনেমা তৈরির কোন পরিকল্পনা রয়েছে যা বলতে গেলে জেমস বন্ডের সিনেমার মতই উঁচু মানের হবে? জানালে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। আশীর্বাদ করবেন, যেন আগামী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করে ‘ফিল্ম মেকিং’ কোর্সে ভর্তি হতে পারি।

✽ভাল বাজেট হয়তো অনেকেই সরবরাহ করতে পারবেন, কিন্তু আমাদের আসল সমস্যা তো নো-হাউ। আমরা জানি না কীভাবে ভাল ছবি তৈরি করতে হয়। এখানে ওই মানের ছবি করা সম্ভব মনে করি না।